জাল

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

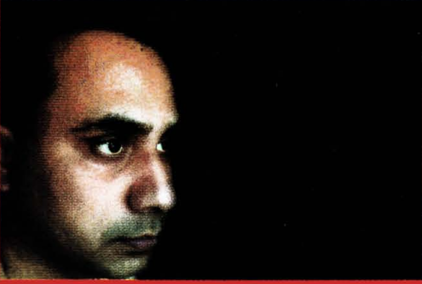
এক প্লেবয় ব্যারিস্টার খুনের অভিযোগে হাতেনাতে গ্রেফতার হলো পুলিশের কাছে কিন্তু তার দাবি খুনটা করেছে মানসিক বিকারগ্রস্ত একজন। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে সাবেক ইনভেস্টিগেটর কেএস খানের দ্বারস্থ হয় সে। অদ্ভুত এই লোক, তারচেয়েও অদ্ভুত এই হত্যাকাণ্ডটি। যার ক্যারিয়ারে কোনো অমীমাংসিত কেস নেই সে কি পারবে রহস্যের জাল ছিন্ন করতে?

নেমেসিস, কন্ট্রাক্ট, নেক্সাস আর কনফেশন-এর পর মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন সম্পূর্ন ভিন্নধর্মী একটি চরিত্র নিয়ে এসেছেন জাল-এ।

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...


ISBN 984872958-5

http://www.facebook.com/pages/batighar-prokashoni



মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন-এর জন্ম ঢাকায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইন্সটিটিউটে এক বছর পড়াশোনা করলেও পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন।

বিশ্বমানের অসংখ্য জনপ্রিয় থৃলার অনুবাদ করার পর অবশেষে তার পর পর চারটি মৌলিক থৃলার নেমেসিস, কন্ট্রাক্ট, নেক্সাস এবং কনফেশন প্রকাশিত হলে বিপুল পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। সেই অনুপ্রেরণা থেকে বর্তমানে তিনি বেশ কয়েকটি মৌলিক থৃলার লেখার কাজ করে যাচ্ছেন।

তার পরবর্তী থৃলার উপন্যাস পহেলা বৈশাখ এবং ম্যাজিশিয়ান প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

পরবর্তী ফ্ল্যাপে দেখুন...

সাড়া জাগানো উপন্যাস দ্য দা ভিঞ্চি কোড, লস্ট সিম্বল, গডফাদার, বর্ন আইডেন্টিটি, বর্ন আলটিমেটাম, দ্য ডে অব দি জ্যাকেল, দ্য সাইলেন্স অব দি ল্যাম্বস্, রেড ড্রাগন, ডিসেপশন পয়েন্ট, আইকন, মোনালিসা, পেলিকান বৃফ, এ্যাবসলিউট পাওয়ার, ওডেসা ফাইল, ডগস অব ওয়ার, অ্যাভেঞ্জার, দান্তে ক্লাব, দ্য কনফেসর, স্লামডগ মিলিয়নেয়ার, দ্য গার্ল উইথ দি ড্রাগন টাট্টু, ফায়ারফক্স এবং দ্য এইট, নো ইজি ডে'সহ বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন তিনি।

e-mail:
naazims2006@yahoo.com
Facebook:
http://www.facebook.com/mohammad.n.uddin



জাল

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন



বাতিঘর প্রকাশনী

জাল

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

Jaal

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১৩

প্রচ্ছদ : ডিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ : একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; কম্পোজ : লেখক

মূল্য : দুইশত বিশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ :

আনিকা তাবাসসুম অন্তরা'কে

ক'দিন পরই সে তার জীবনের নতুন একটি অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছে

...তার জন্য আমার শুভেচ্ছা রইলো

মুখবন্ধ

হাসপাতালের করিডোরটা খুব বেশি দীর্ঘ নয়। ছয়তলার একটি ভবনে এই প্রাইভেট হাসপাতালটি গুলশান এভিনুতে অবস্থিত। এই ফ্লোরটায় শুধু কেবিন রয়েছে। এই হাসপাতালের তরুণ সার্জন মামুন বেশ ধীরপায়ে হলওয়ে দিয়ে এগিয়ে চলছে ৫০৭ নাম্বার কেবিনের দিকে। ক্লিনশেভ, পরিপাটি করে চুল আচড়ানো আর সাদা অ্যাপ্রোনে তাকে একদম ডাক্তারদের মতোই লাগছে! তার থেকে একটু দূরে, পেছন পেছন চুপচাপ তাকে অনুসরণ করছে অল্পবয়সী এক নার্স। ৫০৭-এ ঢোকার আগে হাতঘড়িতে সময় দেখে নিলো ডাক্তার। তারপর বুকভরে নিঃশ্বাস নিয়ে ঢুকে পড়লো ভেতরে।

বিছানায় শুয়ে থাকা রোগী ঘুমাচ্ছে। প্রচণ্ড ব্যথায় এতোক্ষণ কাতর ছিলো বেচারা। একটু আগে পেইনকিলার দেয়াতে ঘুমিয়ে পড়েছে। অনেকদিন পর সে নিজ হাতে এই রোগীকে ইনজেকশন দিলে নার্স মেয়েটি অবাকই হয়েছিলো। মনে মনে হাসলো ডাক্তার মামুন। এতে অবাক হবার কী আছে?

রোগীর নাড়িস্পন্দন দেখলো। একদম ঠিক আছে। বেডের পাশে রাখা রিপোর্টটা (এটাকে মেডিকেল টার্মে কি বলে জেনে নিতে হবে) হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ দেখে গেলো। সবই ঠিকঠাকমতো চলছে। রোগীকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে নার্সকে নিয়ে চুপচাপ কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলো ডাক্তার।

কেবিনের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নার্সকে কিছু ইন্সট্রাকশন দিয়ে দিলো এবার। একটু পরই এই রোগীর অপারেশন হবে। প্রয়োজনীয় সব কিছু যেনো করে রাখা হয়। সব শুনে নার্স মেয়েটি চুপচাপ চলে গেলো। ডাক্তার মামুন দাঁড়িয়ে থাকলো কেবিনের দরজার সামনে। হাতঘড়িতে সময় দেখলো আবার। তার কপালে চিন্তার ভাঁজ। যদিও এরকম অপারেশনের আগে তার মধ্যে সামান্যতম উদ্বেগও দেখা যায় না কখনও। তবে এটাও

ঠিক, আজকের অপারেশনটা অন্যরকম। এরকম কাজ সে কখনও করেই নি। সেজন্যে ভেতরে ভেতরে অন্যরকম এক উদ্বিগ্নতা জেঁকে বসেছে। গভীর করে দম নিয়ে উদ্বিগ্নতা দূর করার চেষ্টা করলো।

নার্স মেয়েটিকে দৃষ্টিসীমা থেকে উধাও হয়ে যেতে দেখে আবারো কেবিনের ভেতর ঢুকে পড়লো সে। বেডের দিকে তাকালো। তার রোগী শুয়ে আছে। কিন্তু ডাক্তার মামুন জানে সে মোটেও ঘুমিয়ে নেই। ঘুমের ভান করে আছে কেবল। এই রোগীর মানসিকভারসাম্যহীনতার রেকর্ড খুব একটা ভালো নয়। তবে বর্তমান অবস্থা বেশ ভালোই বলা যায়, অন্তত লোকজন তাকে দেখলে মানসিকরোগী ভাববে না। কিন্তু সে জানে, এই রোগী মানসিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ নয়। ডাক্তার এটা নিয়ে কিছুটা চিন্তিত। পাগলদের সাথে কাজ করার বিপদ আছে। কখন কি ক'রে বসে ঠিক নেই। অবশ্য তার মনে হচ্ছে এই রোগি মানসিকভাবে কিছুটা ডিস্টার্ব হলেও কোনো সমস্যা পাকাবে না। চলনে বলনে একেবারেই স্বাভাবিক মনে হয় তাকে।

সিদ্ধান্তহীনতায় কেবিনের দরজার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো ডাক্তার। রোগীর সাথে কথা বলবে কী বলবে না বুঝতে পারলো না। অবশেষে ঘুরে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো।

ডাক্তার ঘর থেকে চলে যেতেই বেডে শোয়া রোগীর চোখ দুটো খুলে গেলো হুট করে। তারপরই দেখা গেলো ঠোঁটে বাঁকা হাসি। সেই হাসিতে লেগে আছে ক্রুড়তা; দুর্বোধ্য এক রহস্যময়তা!

অধ্যায় ১

অপেক্ষা করতে কখনই তার ভালো লাগে না। সেই ছোটোবেলা থেকে এটা তার স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট। কিন্তু পেশাগত জীবনে এসে অনেক অপ্রিয় জিনিস আত্মস্থ করতে হয়েছে, অপেক্ষা করাটা তার মধ্যে অন্যতম। একজন প্রতিশ্রুতিশীল ব্যারিস্টার হিসেবে তার যেরকম নামডাক সেটা বিবেচনায় নিলে ক্লায়েন্টের জন্য ক্যাফে গা-গা'র মতো কোনো জায়গায় বসে অপেক্ষা করাটা তার জন্য একটু বেমানানই।

এই ক্যাফেটা টিনএজারদের ভীড়ে গিজগিজ করে সারাক্ষণ। এটা হলো অভিজাত পাড়ার টিনএজারদের গেদারিং প্লেস। ক্যাফের ভেতরে তার মতো সুট-টাই পরা কোনো লোক দেখা যাচ্ছে না। এমনকি তার বয়সী একজন কাস্টমারও নেই। আশেপাশে কিছু টিনএজার নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করার ফাঁকে ফাঁকে বার বার তার দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে, যেনো তাদের নিজস্ব ডেরায় অনাহুত একজন ঢুকে পড়েছে ভুল করে।

একটা বাঁকা হাসি হাসলো আনমনে। তার এমন কি বয়স হয়েছে! সাইত্রিশ কি খুব বেশি বয়স? তার সুগঠিত শরীর বেশ হালকাপাতলা। নিয়মিত জিমে যায়। শারীরিকভাবে সে এইসব সিগারেট ফুঁকা টিনএজারদের চেয়ে অনেক বেশি ফিট। আর দেখতে শুনতে তার মতো সুপুরুষ খুব কি বেশি পাওয়া যাবে এ শহরে?

আবারো এক চিলতে হাসি তার ঠোঁটে ফুটে উঠলো, তবে এটা বাঁকা হাসি নয়, নিজের কাছেই কথাটা একটু উন্নাসিক শোনালো ব'লে। সে জানে তার আধা কাচা-পাকা চাপদাড়ির কারণে হয়তো এরা তাকে অনেক বেশি বয়স্ক ভাবছে। অথচ উপরমহলে এই আধা কাচাপাকা চাপদাড়িটাই তার ফ্যাশন সচেতনতার বর্হিপ্রকাশ হিসেবে পরিচিত।

বাম হাতের শার্টের হাতা একটু তুলে রোলেক্স ঘড়িটা আবারো

দেখলো। *বিশ মিনিট লেট!* মনে মনে অদেখা ক্লায়েন্টকে আরেকবার গালি দিলো সে। তার অভিধানে এই একটা গালিই আছে।

স্টুপিড!

এই ক্লায়েন্টের সাথে এভাবে দেখা করতে রাজি হওয়াটাই উচিত হয় নি। আরে বাবা, তার নিজের একটা চেম্বার আছে, অন্য যেকোনো ব্যারিস্টারের চেয়ে সেই চেম্বারটা সবদিক থেকেই আধুনিক আর জমকালো। সেখানকার প্রাইভেটরুমে বসে কফি খেতে খেতে কতো আরামেই না কথা বলা যেতো, কিন্তু তার এই ক্লায়েন্ট কোনোভাবেই রাজি হয় নি। সালেহীন চৌধুরি নামের ভদ্রলোকের কণ্ঠে এমন কিছু ছিলো, এমন একটা আকুতি ছিলো যে সেটা অগ্রাহ্য করতে পারে নি সে। এই তো, একটু আগে চেম্বার থেকে যখন বের হবে ভাবছিলো ঠিক তখনই লোকটা ফোন করে। বিরাট কোনো সমস্যায় পড়েছে এটা নিশ্চিত। কিন্তু এটাও তো ঠিক, বড়সড় সমস্যায় না পড়লে কেউ কি নামকরা ব্যারিস্টারের দ্বারস্থ হয়?

সালেহীন সাহেব যদিও বলেন নি তার সমস্যাটা কি তারপরও আন্দাজ করতে পারছে–মার্ডার কেস। সে একেবারে নিশ্চিত, ভদ্রলোক কোনো মার্ডার কেসে ফেঁসে গেছে। ভদ্রলোককে সে বার বার তার নিজের চেম্বারে আসতে বললেও রাজি হন নি। এটার কারণও ধরতে পেরেছে। মার্ডার কেসের অভিযোগে পালিয়ে বেড়াচ্ছে লোকটা। এখন কোনোভাবেই পুলিশের হাতে ধরা পড়তে চাচ্ছে না। হয়তো ভাবছে তার মতো ব্যারিস্টারের শরণাপন্ন হলে হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন নিয়ে নিতে পারবে, জেলের মতো জঘন্য জায়গায় আর থাকতে হবে না।

তাহলে কোথায় দেখা করবেন–তার এমন প্রশ্নের জবাবে সালেহীন সাহেব এই ক্যাফেটার নাম বলে। প্রথমে সে একটু অবাক হয়েছিলো। ভালো করেই জানে ক্যাফে গা-গা টিনএজারদের আখড়া। এটা তার অফিস থেকে একেবারে কাছে, মাত্র দুই ব্লক দূরে। প্রতিদিনই নিজের চেম্বারে যাওয়া আসার সময় এর সামনে দিয়ে তাকে চলাচল করতে হয়। তবে আজকের আগে কখনও আসা হয় নি। খুব কাছে বলেই এখানে দেখা করতে রাজি হয়ে যায়। ক্লাবে যাওয়ার পথে না হয় একজন ক্লায়েন্টের সাথে দশ-পনেরো মিনিটের জন্য দেখা করেই গেলো।

ওয়েটার ছেলেটা এসে অরেঞ্জ জুস দিয়ে গেছে একটু আগে, বসে

থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে এই অর্ডারটা দিয়েছিলো। যদিও জুসটা এখন পর্যন্ত ছুঁয়েও দেখে নি। সন্ধ্যার পর পর নিজের চেম্বার থেকে বের হবার আগে দু'পেগ *গ্লেনফিডিখ* হুইস্কি পান করেছে। বিশ বছরের পুরনো এই হুইস্কিটা তার এক হোমরাচোমরা ক্লায়েন্ট গত সপ্তাহে গিফট করেছিলো। দারুণ একটা জিনিস। দু' পেগেই বেশ ধরেছে।

দীর্ঘ দশ বছর লন্ডনে থাকার কারণে তিনটি জিনিসের প্রতি আসক্তি জন্মে গেছে তার–নিয়মিত জিমে যাওয়া; নিত্যনতুন বান্ধবী জোগার করা আর দামি হুইস্কির আস্বাদ নেয়া। প্রথমটি নিয়ে এ দেশে কোনো ঝামেলা হয় না। তার বাড়ির কাছেই বেশ আধুনিক মানের একটি জিম আছে। দ্বিতীয় শখটি নিয়ে শুরুর দিকে বিপাকে পড়লেও এখন সেটাও কাটিয়ে উঠেছে কিছু হোমরাচোমরা বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে নেবার পর। ঐসব বন্ধুদের ইনার-সার্কেলে সমাজের উঁচুতলার প্রচুর নারীর আনাগোনা। ফলে সুর্দশন রুহিনের জন্য নিত্যনতুন বান্ধবী জোগার করা কোনো ব্যাপারই না। আর শেষটি নিয়ে এ দেশের আমজনতা ঝামেলায় পড়লেও তার কোনো সমস্যা হয় না। তার রয়েছে বৃটিশ পাসপোর্ট। ওয়্যারহাউজে গিয়ে পাসপোর্ট দেখালেই মিলে যায় যেকোনো ভালো ব্র্যান্ডের হুইস্কি-ওয়াইন-বিয়ার। তবে এখন তার কিছু হোমরাচোমরা ক্লায়েন্ট জেনে গেছে তরুণ ব্যারিস্টারের হুইস্কিপ্রীতির কথা। তারা সানন্দে দামি দামি হুইস্কি উপহার দিয়ে থাকে।

অরেঞ্জ জুসটার দিকে নজর গেলো তার, ভাবলো একটু চুমুক দিয়ে দেখবে কিনা। এভাবে বসে থাকতে কেমন জানি বোকা বোকা লাগছে। জুসের গ্লাসটা হাতে তুলে নিতেই আইফোনটা বেজে উঠলো।

সালেহীন সাহেব?

পকেট থেকে ফোনটা বের করে দেখলো তার ধারণাই ঠিক। কলটা রিসিভ করে বেশ ঝাঁঝালো সুরে কথা বললো তরুণ ব্যারিস্টার।

"বিশ মিনিট ধরে বসে আছি...আপনার কোনো খবর নেই! ঘটনা কী বলুন তো?"

ওপাশ থেকে ভয়ার্ত একটা কণ্ঠ শোনা গেলো। কণ্ঠটা রীতিমতো কাঁপছে। "সরি স্যার। আই অ্যাম এক্সট্রিমলি সরি!"

"আপনি এখন কোথায়? আমি কিন্তু আর ওয়েট করতে পারবো না! পাঁচ মিনিটের মধ্যে যদি না আসেন আপনার সাথে আমার আর দেখা হচ্ছে

না...ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ?" সালেহীন সাহেবকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ক্ষুব্ধস্বরে বললো সে।

"স্যার, আমি ক্যাফের পেছনে যে গলিটা আছে সেখানে আছি..." একেবারে ফিসফিসিয়ে বললো ভদ্রলোক।

"ক্যাফের পেছনে গলিতে! স্ট্রেইঞ্জ! আপনি এখানে না থেকে ঐ গলিতে কী করছেন?"

"স্যার, আস্তে বলুন। ওরা শুনে ফেলতে পারে!" একেবারে সতর্ক কণ্ঠে বললো ফোনের ওপাশ থেকে।

"কী!" যারপরনাই অবাক হলো সে, তবে গলাটা নীচে নামিয়ে আনলো। "ওরা মানে? কাদের কথা বলছেন?"

"স্যার, আমি আপনার আসার অনেক আগেই ক্যাফেতে ছিলাম, আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম কিন্তু ওদেরকে ঢুকতে দেখে কোনোরকমে বের হয়ে এখানে চলে এসেছি। আমার ধারণা এখনও ওরা ক্যাফেতেই আছে।"

ক্যাফের চারপাশে তাকালো সে। একদঙ্গল টিনএজার ছেলেমেয়ে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলো না। দুই যুবকের সাথে তার চোখাচোখি হয়ে গেলো। ছেলেগুলোর চাহ্নি স্বাভাবিক নয়। কেমন জানি চোরাচোখে তার দিকে তাকাচ্ছে। চোখে চোখ পড়তেই অন্যদিকে মুখ সরিয়ে ফেললো তারা।

"আপনি কাদের কথা বলছেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!"

"আপনাকে সব খুলে বললে বুঝতে পারবেন আমার অবস্থা...আমি ভীষণ বিপদের মধ্যে আছি। একমাত্র আপনিই আমার জীবনটা বাঁচাতে পারেন–"

এবার সে শতভাগ নিশ্চিত, সালেহীন সাহেব কোনো মার্ডার কেসের আসামী। এরা আইনজীবিদের কাছে এসে এমনভাবেই নিজের জীবন বাঁচানোর আকুলতা জানায়। আরো বুঝতে পারলো ভদ্রলোকের পেছনে পুলিশ অথবা গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন লেগেছে।

"আপনার পেছনে কি পুলিশ কিংবা ডিবির লোকজন লেগেছে? আই মিন, আর দে ফলোয়িং ইউ?"

ওপাশ থেকে কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা নেমে এলো। তারপর অনেকটা

অসহায় ভঙ্গিতে চাপাকণ্ঠে বললো সালেহীন সাহেব, "জি-জি স্যার। ও-ওরাই..."

"আচ্ছা," আবারো চারপাশটা তাকিয়ে দেখলো সে। তার থেকে একটু দূরের টেবিলে বসা দুটো অল্পবয়সী ছেলেকে ভালো করে দেখে নিলো। বার বার আড়চোখে তার দিকে তাকাচ্ছে আর নীচুস্বরে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। কিন্তু এদের বয়স ঠিক গোয়েন্দাদের মতো নয়। তবে কে জানে, নতুন রিক্রুট করাদের বয়স হয়তো এমনই হয়। তাদেরকেই হয়তো ফলো করার মতো বিরক্তিকর কাজগুলো দিয়ে থাকে সিনিয়ররা। "আপনার কেসটা কি মার্ডারের?" ঐ দুই যুবকদের দিকে চোখ রেখেই বেশ চাপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো সে।

"তারচেয়েও খারাপ কিছু, স্যার।"

"মানে?"

"আমি সব খুলে বলবো...সব। শুধু আমাকে একটু সময় দিন।" কণ্ঠে প্রবল আকুতি।

একটু চুপ করে থাকলো ব্যারিস্টার। "আমি কি ক্যাফের পেছনে গলিতে আসবো?"

"কষ্ট করে যদি এখানে আসেন তাহলে খুবই কৃতজ্ঞ থাকবো, স্যার," একটু থেমে আবার বললো, "তবে একটু সতর্ক থাকবেন...লক্ষ্য রাখবেন কেউ আপনাকে ফলো করছে কি না।"

"হুম।"

"গাড়িতে করে আসার দরকার নেই, হেটে আসলেই হবে। আমি ক্যাফের ঠিক পেছনের গলিতেই আছি।"

ব্যারিস্টার অবাক হলো। "আমি গাড়িতে করে এখানে এসেছি আপনি জানলেন কিভাবে?" সাক্ষীদের ক্রশ-এক্সামিন করার ভঙ্গিতে বললো, "আপনি তো ক্যাফের পেছনে আছেন...আপনি নিশ্চয় আমাকে এখানে ঢুকতে দেখেন নি?"

"স্যার...কী যে বলেন। আপনার মতো লোক কি গাড়ি ছাড়া কোথাও যায়।"

ভদ্রলোক ঠিকই বলেছে। গাড়ি ছাড়া কোথাও বের হয় না সে। আর সব সময় নিজের গাড়ি নিজেই ড্রাইভ করে। "ঠিক আছে। আপনি থাকুন,

আমি এক্ষুণি আসছি।”

“একটু খেয়াল রাখবেন কেউ আপনাকে–”

কথাটা শেষ করতে দিলো না। “হ্যা হ্যা, বুঝেছি।”

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সে। ফোনটা পকেটে রেখে কাউন্টারে গিয়ে বিল মেটানোর সময় পেছন ফিরে দেখলো কেউ তার দিকে লক্ষ্য রাখছে কিনা। না। যে দুটো ছেলে চোরাচোখে তাকাচ্ছিলো তারা এখন নিজেদের মোবাইলফোনে কী যেনো দেখছে আগ্রহ নিয়ে।

ক্যাফে থেকে বের হয়ে একটু থামলো। হাতঘড়িতে সময় দেখলো সে। রাত ৮টা বাজতে দুই-তিন মিনিট বাকি। ক্যাফের ভেতরটা যতোই কোলাহলমুখর থাকুক না কেন বাইরের অবস্থা একেবারেই বিপরীত। রাস্তাটা একদম ফাঁকা। বনানীর এ জায়গাটা ঢাকা শহরের সেইসব অল্প জায়গাগুলোর একটি যা প্রায় সময়ই নিরিবিলি থাকে। পকেট থেকে মোবাইলফোনটা বের করে কানের কাছে চেপে ধরলো। সতর্ক দৃষ্টিতে সামনে পেছনে চেয়ে দেখলো কেউ তাকে ফলো করছে কিনা। না। ক্যাফে থেকে আর কেউ বের হয় নি। নিশ্চিত হয়ে ফোনটা পকেটে রেখে খুবই স্বাভাবিক গতিতে হাটতে লাগলো। আবারো একটু থেমে পেছন ফিরে তাকালো। কেউ নেই। একটু সামনে এগিয়ে যেতেই পেছনের গলিতে যাবার পথটা দেখতে পেলো।

ক্যাফের ঠিক পেছনে যে রাস্তাটা দেখতে পেলো সেটা মোটেও কোনো গলি নয়। এ জায়গায় আগে কখনও আসে নি। তবে বুঝতে পারলো সালেহীন সাহেব কেন এটা বেছে নিয়েছেন। রাস্তার এক পাশে একটি পরিত্যক্ত পার্ক। ময়লা আর্বজনা আর অযত্নে পড়ে থাকতে থাকতে রাস্তাটা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে উঠেছে।

চারপাশে তাকালো। হাতেগোনা দু'তিনটি সোডিয়াম লাইটের বিভ্রান্তিকর আলোয় কিছুই দেখতে পেলো না। জায়গাটা বেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। আরেকটু এগিয়ে গেলো সামনের দিকে। হঠাৎ তার ফোনটা বেজে উঠলো আবার।

“আপনি কোথায়?” অধৈর্যের সুরে বললো ব্যারিস্টার। “আমি তো গলিতে।”

“স্যার, আমি পার্কের ভেতরে...একটা ভাঙা গেট দেখতে পাচ্ছেন?

ওটা দিয়ে ঢুকে পড়ুন," কণ্ঠটা এখনও ফিসফিস করে কথা বলছে।

পার্কের একমাত্র ভাঙা গেটটা চোখে পড়লো তার। গেট দিয়ে ঢুকতে ঢুকতেই বললো সে, "আমি বুঝতে পারছি না আপনি এতোটা ভয় পাচ্ছেন কেন...আশ্চর্য! আমাকে কেউ ফলো করে নি। আমার মনে হয় না ক্যাফে'তে ওরকম কেউ ছিলো। আপনি একটু স্বাভাবিক আচরণ করুন, মিঃ সালেহীন, ওকে?"

বিরক্ত হয়ে ফোনটা পকেটে রাখতে যাবে অমনি পেছন থেকে কেউ তার সুটের কলার ধরে ফেললো। খুবই শক্তিশালী একটা হাত। সে ঘুরে পেছন ফিরে তাকানোর চেষ্টা করতেই পরিচিত একটি কণ্ঠ তার কানের কাছে মুখ এনে ধমকের সুরে বললো, "একদম নড়বি না!"

তরুণ ব্যারিস্টার দ্রুত বুঝতে পারলো তার কানের ঠিক নীচে কি ধরে রেখেছে অজ্ঞাত লোকটি–পিস্তল! সে নিজেও লাইসেন্স করা পিস্তল ব্যবহার করে। এখনও সেটা তার সুটের নীচে শোল্ডারহোলস্টারে রাখা আছে।

"আপনি–"

কথাটা আর বলতে পারলো না। সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের নলটা চেপে ধরা হলো তার গলার কাছে। "একদম চুপ!" ফ্যাসফেসে কণ্ঠটা উন্মাদগ্রস্তের মতো শোনালো।

দু'চোখ বন্ধ করে ফেললো ব্যারিস্টার। সে ভালো করেই জানে এই কণ্ঠটা সালেহীন সাহেবের। কিন্তু এটা জানে না ভদ্রলোক তাকে এখানে ডেকে এনে পিস্তলের মুখে জিম্মি করছে কেন। নিজেকে ধাতস্থ করার চেষ্টা করলো। একটা ফাঁদে পড়ে গেছে সে!

"আপনি আমার কাছ থেকে কী চান?" খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো তরুণ ব্যারিস্টার।

"চুপ!" আবারো কানের কাছে সালেহীন সাহেবের কণ্ঠটা দাঁতে দাঁত পিষে গর্জে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে ধাক্কা মেরে সামনের একটা দেয়ালের সাথে চেপে ধরলো তাকে। এমন মারমুখী আচরণে ব্যারিস্টার ভড়কে গেলো।

"আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!" একটু অনুনয়ের সুরে বললো সে। "আপনি আমার সাথে এমন করছেন কেন?"

"চুপ! শূয়োরেরবাচ্চা!" সালেহীন সাহেবের কণ্ঠ দিয়ে যেনো সমস্ত

ক্রোধ একসাথে বের হয়ে আসছে।

ব্যারিস্টার টের পেলো তার সুটের ভেতরে একটা হাত উদভ্রান্তের মতো কিছু খুঁজছে। শোল্ডারহোলস্টার থেকে পিস্তলটা দ্রুত নিয়ে নিলো অস্ত্রধারী।

ছিনতাইকারী!

"এটা লাইসেন্স করা," আস্তে করে বললো ব্যারিস্টার। "আপনি আমার রোলেক্স ঘড়িটা নিন...আইফোনটা নিন...মানিব্যাগে কিছু টাকা আছে, ওগুলো নিন কিন্তু এটা নিয়েন না। প্লিজ!"

একটা অস্বাভাবিক আর উন্মাদগ্রস্ত চাপাহাসি শুনতে পেলো। সালেহীন চৌধুরি নামের লোকটি যেনো খুব মজা পেয়েছে এ কথা শুনে।

"বানচোদ, তোর পচা মুখটা বন্ধ রাখবি নাকি আমি গুলি করবো?!" কথাটা বলেই পেছন থেকে তার কিডনি লক্ষ্য করে একটা আঘাত করা হলো।

ব্যথায় ককিয়ে উঠলো সে। কিন্তু দেয়ালের সাথে চেপে রাখার কারণে কিছু করতে পারলো না। সালেহীন নামের আক্রমণকারী নিজের সমস্ত শরীর দিয়ে ঠেসে ধরে রেখেছে তাকে।

"লাখ টাকার ব্যারিস্টার! ইচ্ছে করলে তোকে আমি এখনই খুন করতে পারি কিন্তু আমি সেটা করবো না!" আবারো কানের কাছে মুখ এনে জঘন্য হাসিটা হাসলো। "কেন করবো না, জানিস?"

এই প্রশ্নের জবাব দেবার কোনো ইচ্ছে ছিলো না কিন্তু পেছন থেকে তার কেড়ে নেয়া পিস্তল দিয়ে গুঁতো মারলে সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠলো, "ক্-ক্-কেন?"

"কারণ আমি একটা খেলা খেলতে চাই!"

ব্যারিস্টার তার ডান কানে লোকটার উত্তপ্ত নিঃশ্বাস টের পেলো। পেছন ফিরে আক্রমণকারীকে দেখার ইচ্ছে করলেও সেটা সম্ভব হলো না। তার বাম গালটা দেয়ালের সাথে সেঁটে আছে। চোখের কোণ দিয়ে পেছনে থাকা সালেহীন নামের লোকটির চেহারা দেখার চেষ্টা করলো, কিন্তু পিস্তলের নল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলো না।

"কি-কিসের খেলা!"

কথাটা শেষ হতেই পিস্তলের বাট দিয়ে তার মাথার পেছনে প্রচণ্ড

জোরে আঘাত করা হলো।

একটা নয়, পর পর দুটো।

ব্যারিস্টারের মনে হলো হাতুড়ি দিয়ে কেউ বুঝি তার মাথাটা গুড়িয়ে দিয়েছে। সমস্ত শরীর মুহূর্তে অসাড় হয়ে গেলো। এতোক্ষণে পেছনে থাকা লোকটাও সরে গেছে, ফলে ধপাস করে মাটিতে বসে পড়লো সে। এক হাত দিয়ে মাথার পেছনটা ধরে ঘুরে তাকালো। জ্ঞান হারানোর আগে এক ঝলক দেখতে পেলো নিজের আক্রমণকারীকে। তারপরই দৃশ্যটা ঘোলা হতে হতে অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেলো।

শেষ যে কথাটা সে বলতে পেরেছিলো সেটা শুনে তার আক্রমণকারী ঐ আধো-আলো-অন্ধকারেই তৃপ্তির হাসি হাসলো। কারণ এটাই সে চেয়েছিলো।

"আপনি?!" বিস্মিত কণ্ঠে শুধু এটাই বলতে পারলো ব্যারিস্টার। তার আক্রমণকারী আসলে সালেহীন সাহেব নয়!

কিছুক্ষণ পরই ফাঁকা গলিটা প্রকম্পিত করে পর পর তিনটি গুলির শব্দ হলো। একটা নেড়িকুত্তা কাউ-কাউ শব্দ করে ক্যাফের পেছনের গলি থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এলো সঙ্গে সঙ্গে।

তারপরই সব কিছু আবার আগের মতো নীরব। সুনশান।

অধ্যায় ২

পুলিশের গাড়িটা যখন গলিতে ঢুকলো তখনও গলিটা জনশূণ্যই। লোকজন জটলা করার আগেই বনানী থানার এই টহলগাড়িটা চলে এসেছে এখানে। পর পর দুটি গুলির শব্দ যখন হয় তখন এই গাড়িটা খুব কাছে, চার রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়েছিলো। গুলির শব্দ শুনে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছে। গাড়িতে থাকা এসআই শরীফ ধরেই নিয়েছে অভিজাত এলাকায় আরেকটি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে গেছে। গত সপ্তাহে এরকম দুটি ছিনতাইয়ের ঘটনা তাদেরকে বেশ চাপের মুখে ফেলে দিয়েছিলো। কারণটা খুব স্পষ্ট : দুটি ছিনতাইয়ের একটির শিকার হয়েছিলো স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এক ভাতিজা! স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পোষা কুকুরটাও যদি কোনো বিপদে পড়তো তাহলেও তাদের খবর হয়ে যেতো, আর এতো ভাতিজা। জ্বলজ্যান্ত মানুষ!

ক্যাফে গা-গা'র সামনে কিছু টিনএজার কৌতুহল নিয়ে জড়ো হয়ে ছিলো। তারা হয় ক্যাফে থেকে বের হচ্ছিলো নয়তো ঢুকতে যাচ্ছিলো–এমন সময় গুলির শব্দ শুনে থমকে দাঁড়ায়। কেউ কেউ ভয় পেয়ে ক্যাফের ভেতর ঢুকে পড়লেও বাকিরা আগ্রহভরে এদিক ওদিক তাকাতে থাকে। গুলির উৎসটা কোথায় সেটা ধরতে পারে তাদের মধ্যে কেউ কেউ। পুলিশের গাড়ি তাদের কাছে আসতেই লম্বামতো এক টিনএজার আঙুল তুলে ক্যাফের পেছন দিকের গলিটা দেখিয়ে দেয়। গাড়িটা আর না থেমে সোজা চলে যায় গলির দিকে।

পরিত্যাক্ত পার্কের কাছে এসে টহলগাড়িটা থেমে যেতেই তিন-চারজন কনস্টেবল আর এসআই শরীফ দ্রুত নেমে পড়লো। এদিক ওদিক তাকালো কিছু দেখার আশায়। ক্যাফের পেছনে এই গলিটা একেবারেই ফাঁকা। পার্কের ভাঙাচোরা গেটটার দিকে চোখ পড়তেই এসআই শরীফ সতর্ক হয়ে উঠলো। একটা দামি চকচকে কালো জুতো পড়ে আছে। কনস্টেবলদের ইশারা করলো এসআই। শটগান উঁচিয়ে লম্বামতো এক

জাল

কনস্টেবল প্রথমে ঢুকে পড়লো পার্কের ভেতরে। তার পেছন পেছন আরো দু'জন। এরপরই এসআই শরীফ। তারা সবাই নিজেদের অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে। হালকাপাতলা গড়নের এক কনস্টেবল গাড়ির ভেতর থেকে বড়সড় একটা ফ্ল্যাশলাইট হাতে নিয়ে যোগ দিলো তাদের সাথে।

পার্কের ভেতরটা অন্ধকারাচ্ছন্ন। স্বল্প আলোতে ভালো করে দেখার জন্য ফ্লাশলাইট ব্যবহার করা হলো। এদিক ওদিক আলো ফেলে খুঁজতে শুরু করলো তারা। খুব বেশি সময় লাগলো না লাশটা খুঁজে পেতে। সুট-টাই পরা এক মাঝবয়সী লোক মুখ থুবরে পড়ে আছে। তিনটি গুলিই করা হয়েছে বুকে। পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেছে সেগুলো। এসআই শরীফ অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারলো খুব কাছ থেকে গুলিগুলো করা হয়েছে। রক্তে ভিজে আছে মৃতদেহের শরীর। ভিক্টিমের নাড়ি টিপে শরীফ নিশ্চিত হলো এরইমধ্যে ভদ্রলোক মারা গেছেন।

লাশটা ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকলো পুলিশের লোকগুলো। এসআই শরীফ তার ওয়াকিটকিটা হাতে তুলে নিয়ে বনানী থানার ওসিকে সংক্ষেপে জানিয়ে দিলো কি ঘটেছে। তারপর মন দিয়ে শুনে গেলো উর্ধতন কর্মকর্তার প্রয়োজনীয় নির্দেশ। ওয়াকিটকিটা রেখে কনস্টেবলদের উদ্দেশে কিছু বলতে যাবে এমন সময় পার্কের অন্ধকার এককোণ থেকে ঘোৎ করে একটা শব্দ হলো। নড়েচড়ে উঠলো পুলিশের লোকগুলো। এসআই শরীফ টের পেলো তার গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেছে। বাকি কনস্টেবলদের কী অবস্থা সেটা বুঝতে পারলো না। যার হাতে ফ্ল্যাশলাইটটা আছে তার দিকে তাকালো। হালকাপাতলা গড়নের কনস্টেবল ঢোক গিলে পার্কের ওই দিকটায় আলো ফেললো, শব্দটা ওখান থেকেই এসেছে।

একদল পুলিশ ভীতি আর অবিশ্বাসের সাথে দেখতে পেলো অন্ধকার থেকে কিছু একটা উঠে দাঁড়াচ্ছে।

ফ্ল্যাশলাইট হাতে থাকা কনস্টেবল সেদিকে আলো ফেলতে গিয়ে কাঁপতে শুরু করলো।

"কে?" লম্বামতো যে কনস্টেবল প্রথমে পার্কে ঢুকেছিলো সে হাঁক দিলো বেশ দৃঢ়ভাবে। তাদের দলে এর সাহসই সবথেকে বেশি।

এসআই শরীফ নিজের অফিসার সত্তাকে উর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য পিস্তল উঁচিয়ে বেশ জোরে বললো, "আর একটু আগালেই গুলি করুম!"

হালকাপাতলা কনস্টেবল এবার ঠিকমতো আলো ফেলতে পারলো।

যে দৃশ্যটা তারা দেখতে পেলো সেটা একেবারেই অচিন্তনীয়।

এসআই শরীফ আরেকটুর জন্যে গুলি করতে যাচ্ছিলো। পিস্তলের ট্রিগারে আঙুল চলে গেলেও শেষ মুহূর্তে আর গুলি করলো না। কারণ, সম্ভাব্য খুনি মাতালের মতো টলছে!

"হ্যান্ডস আপ!" গর্জে উঠলো এসআই শরীফ।

অধ্যায় ৩

ক্যাফে গা-গা'র পেছনে যে গলিটা আছে সেটা আর নিরিবিলি নেই। ফাঁকা পরিত্যক্ত পার্ক আর তার সামনের নির্জন রাস্তাটি এখন মানুষের কোলাহলে পরিপূর্ণ। পুলিশের তিন-চারটি জিপ-ভ্যান জড়ো হয়েছে পার্কের ভাঙা গেটের সামনে। আশেপাশের কিছু কৌতুহলী মানুষ দূর থেকে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে তারা সবাই জেনে গেছে এখানে কী ঘটেছে। একটু আগে বনানী থানার ওসি এসে পৌঁছেছে সদলবলে। তার গাড়ির টুইন-টোন সাইরেনটা বন্ধ থাকলেও ঘুর্ণায়মান লালবাতির আলোয় পুরো পরিবেশটা কেমন জানি ভীতিকর হয়ে উঠেছে।

পার্কের ভেতরটা এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন। ওসি পার্কের ভেতরে ঢুকেই বুঝতে পারলো খুনি কেন এই এ জায়গাটা বেছে নিয়েছে তার শিকারের জন্য—ময়লা আবর্জনা আর বাড়িঘরের ইট-পলেস্তারার একটি আখড়া। আশেপাশে যতো বাড়ি ভাঙা হয় তার সব জঞ্জাল এখানে ডাম্পিং করা হয়। পার্কে এখনও বেশ কয়েকটি গাছ এখনও দাঁড়িয়ে আছে। আর জঞ্জালের পাশাপাশি আগাছায় ছেয়ে আছে পুরো এলাকাটি। একদম পরিত্যক্ত একটি জায়গা। মানুষেরর মল-মূত্রের উৎকট গন্ধ নাকে আসে। ভাসমান লোকজন যে এরকম পরিত্যক্ত জায়গাকে পাবলিক টয়লেট হিসেবে ব্যবহার করবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

পার্কের ভেতরে পড়ে থাকা ডেডবডিটা ঘিরে আছে তিন-চারজন পুলিশ। ওসি সাহেব পার্কে ঢুকে লাশের সামনে একটু থামলো। তাকে দেখে পুলিশের দলটি সশব্দে স্যালুট দিলেও সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই তার। স্বল্প আলোতেই দেখতে পেলো নিহত ব্যক্তি উপুড় হয়ে পড়ে আছে। রক্তে একাকার হয়ে গেছে লাশের চারপাশ।

একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে গেলো ওসি। পুলিশের কাছে লাশের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো খুনি। আর সেই খুনিকে

হাতেনাতে গ্রেফতার করেছে তারই থানার পুলিশ। সাফল্য আর গর্ব তার চোখেমুখে।

ডেডবডি থেকে দশ-পনেরো গজ দূরেই পুলিশের আরেকটি জটলা। ওসিকে আসতে দেখে পুলিশের দলটি সরে দাঁড়ালো।

এসআই শরীফ উপুড় হয়ে একজনের সাথে কথা বলছিলো, ওসিকে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এগিয়ে আসলো তার দিকে। নিঃশব্দে স্যালুট ঠুকলো সে। ওসি সাহেব মাথা নেড়ে স্যালুটের জবাব দিয়ে অধস্তনের পিঠ চাপড়ে দিলো। তারপরই তাকালো খুনির দিকে। লোকটা মাটিতে বসে আছে। একেবারে বিপর্যস্ত। মাথার চুল এলোমেলো। মাথার পেছনে একহাত চেপে রেখে মাথাটা নীচু করে রেখেছে।

খুনির হাতে কোনো হ্যান্ডকাফ নেই দেখে তার মেজাজ একটু বিগড়ে গেলো। "তুমি এখনও ওরে হ্যান্ডকাফ লাগাও নাই!"

এসআই শরীফ একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেলো। এটা তার মাথায়ই আসে নি। এতোগুলো পুলিশের মাঝখান থেকে এই আসামী যে পালাবে না সেটা সে ভালো করেই জানে। তারচেয়েও বড় কথা লোকটা যা বলছে সেটা আরেকটি গল্প। "না মানে, স্যার...দরকার মনে করি নি," একটু ইতস্তত করে বললো সে।

"এটা করার কোনো দরকারও নেই, মোয়াজ্জেম সাহেব," মাথার পেছনটা ডলতে ডলতে বললো আসামী।

ওসি চোখ বড় বড় করে তাকালো বসে থাকা লোকটার দিকে। তার নাম জানে দেখছি?! লোকটার চেহারা দেখে তার মনে হলো খুব চেনাজানা কেউ।

"খুনটা আমি করি নি," একটু থেমে আবার বললো সে। "তবে কে করেছে সেটা আমি জানি।"

এগিয়ে গেলো ওসি। "আপনি করেন নি!" কথাটা বলেই বাঁকা হাসি হাসলো। কোনো খুনি কখনও প্যাদানি না খেয়ে খুনের কথা স্বীকার করে? করে না। "তবে আপনি জানেন কে খুনটা করেছে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো লোকটি।

"এইসব ফাজলামির প্যাচাল আমার সাথে মারবেন না," ধমকের সুরে বললো ওসি সাহেব। "জায়গামতো প্যাদানি খেলে সব বের হয়ে যাবে!"

জ্বাল

"স্যার," এসআই শরীফ বললো তার উর্ধতন কর্মকর্তাকে। "এই লোক বলছে সে নাকি রুহিন মালিক।"

ওসি কিছু বুঝতে পারলো না। রুহিন মালিক নামটা কি কোনো ফিল্মস্টারের–নাকি পলিটিশিয়ানের? মনে করতে পারলো না। "তো কি হয়েছে?"

"ব্যারিস্টার রুহিন মালিক, স্যার।"

কয়েক সেকেন্ড লাগলো ব্যাপারটা বুঝতে। রুহিন মালিক! সুপ্রিমকোর্টের জাঁদরেল ব্যারিস্টার! *বলে কি?*

বসে থাকা লোকটার দিকে আবারো তাকালো ওসি। ভালো করে লক্ষ্য করলো। সত্যি তো! গালে সুন্দর করে ছাটা চাপদাড়ি। দেখতে দারুণ সুপুরুষ। চেহারাটা এবার চিনতে পারলো। টিভি'র টকশো'তে আজকাল প্রায়ই দেখা যায় এই সেলিব্রেটি ব্যারিস্টারকে। বেশ ভালো বলতে পারে এই লোক। টিভি'তে বিভিন্ন আইনী বিষয়ে নানা রকম ব্যাখ্যা আর বিশ্লেষণ দিয়ে থাকে। কয়েক মাস আগে পুলিশের এক অনুষ্ঠানে ভদ্রলোকের সাথে পরিচয়ও হয়েছিলো তার। বনানীতে এই লোকের চেম্বারেও দু'একবার যাওয়ার সুযোগ হয়েছে এর আগে।

পরক্ষণেই বুঝতে পারলো এক হোমরাচোমরা ব্যারিস্টারের সামনে চুপ্‌সে গেলে হবে না। নিজেকে ধাতস্থ করে নিলো দ্রুত।

"আচ্ছা," বললো ওসি সাহেব। "মিঃ রুহিন মালিক..." আর কোনো কথা খুঁজে পেলো না।

তরুণ ব্যারিস্টারের মুখে শুধু বাঁকা হাসি ফুঁটে উঠলো।

"স্যার, উনি বলছেন খুনি নাকি উনার ক্লায়েন্ট সেজে উনার সাথে এখানে–"

"এখানে না...ক্যাফে গা-গা'তে," এসআই শরীফের কথা শেষ করার আগেই ব্যারিস্টার রুহিন কথার মাঝখানে বলে উঠলো।

"ক্যাফে কি?" বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলো ওসি।

"ঐযে স্যার...মেইনরোডের উপর যে ক্যাফেটা আছে...গত সপ্তাহে আমরা ওখানকার শিশা পার্লারে রেইড দিলাম না? ওটা।"

"আচ্ছা," মাথা দোলালো ওসি। "তাহলে আপনে এখানে এলেন কিভাবে?"

ব্যারিস্টার রুহিন প্রশ্নটা শুনে বিরক্ত হলো। "এ নিয়ে এ কথাটা তিন-চারবার বললাম।"

"স্যার, আমি বলছি উনি কি বলছেন।" একটু আগে ব্যারিস্টার রুহিনের কাছ থেকে শোনা কথাগুলো এসআই শরীফ সংক্ষেপে জানিয়ে দিলো তার উর্ধতন কর্মকর্তাকে।

"আচ্ছা," সব শুনে বললো ওসি সাহেব। ফিরে তাকালো ব্যারিস্টার রুহিনের দিকে। ইতিমধ্যে সে উঠে দাঁড়িয়েছে। "আপনি বলতে চাচ্ছেন খুনি একজন ক্লায়েন্ট সেজে আপনাকে ঐ ক্যাফে'তে আসতে বলেছিলো?" প্রশ্নটা এমনভাবে করলো যেনো কোনো প্রশ্ন নয়।

মাথা নেড়ে সায় দিলো ব্যারিস্টার। এখনও মাথার পেছনটা হাত দিয়ে ম্যাসাজ করে যাচ্ছে।

"কিন্তু আপনি তো আপনার চেম্বারেই ক্লায়েন্টের সাথে দেখা করেন...এখান থেকে হাটা দূরত্বে সেটা," যুক্তি দিয়ে বললো ওসি মোয়াজ্জেম। "তারপরও এখানে এলেন দেখা করতে?"

"ভদ্রলোক কী একটা সমস্যার কারণে চেম্বারে আসতে চাচ্ছিলো না," বললো তরুণ আইনজীবি।

"ভদ্রলোক মানে, খুনির কথা বলছেন?"

ওসির কথায় মাথা নেড়ে আবারো সায় দিলো সে। কিছুক্ষণ চুপ মেরে রইলো মোয়াজ্জেম সাহেব। ব্যারিস্টারের মুখ থেকে অ্যালকোহলের গন্ধ পাচ্ছে। নির্ঘাত বিদেশী কোনো হুইস্কি হবে। এরা কি আর বাঙলা মদ গিলবে।

"আপনি কি ড্রিঙ্ক করেছেন?"

ওসির কথায় একটু ভিরমি খেলো ব্যারিস্টার। "ইয়ে মানে," ইতস্তত করলো সে। "হ্যা। চেম্বার থেকে বের হবার আগে অল্প একটু খেয়েছিলাম। তেমন কিছু না।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ওসি। রুহিন মালিকদের মতো উঁচুতলার লোকজন একটু আধটু ড্রিঙ্ক করতেই পারে। এটা তাদের কাছে চা পান করার মতোই ঘটনা। মোয়াজ্জেম সাহেব অবশ্য অন্য একটা ব্যাপার নিয়ে ভেবে যাচ্ছে। হাইপ্রোফাইলের লোকজন কোনো কেসে জড়িত থাকলে একটু হিসেব করে এগোতে হয়, একটু ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

নইলে কখন কোন বিপদ নেমে আসে কে জানে। অনেক কষ্টে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে লাখ লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে ঢাকার বনানী থানায় পোস্টিং নিয়েছে। এখান থেকে ডামুইড্যা কিংবা শীতলবাহার থানার মতো কোনো নাস্তানাবুদ জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছে তার নেই।

"আপনার পিস্তল দিয়ে নাকি দুটো ফায়ার করা হয়েছে," কথাটা বলে এসআই শরীফের দিকে তাকালো ওসি। আসার পথে ওয়াকিটকিতে এটা জানতে পেরেছিলো সে। শরীফ একটা এভিডেন্স ব্যাগ তুলে ধরলো। সেটার ভেতরে একটা পিস্তল।

"আপনার লোক তো তাই বলছে," নির্বিকারভাবে বললো ব্যারিস্টার। তার মধ্যে ঘাবড়ানোর কোনো চিহ্ন নেই।

"হুম," একটু ভেবে নিলো আবার। "ডেডবডিটা আপনি দেখেছেন?"

"না। আপনি আসার একটু আগে জানলাম এখানে একজন খুন হয়েছে।"

শরীফের দিকে তাকালো ওসি, তারপর ব্যারিস্টারের দিকে। তাকে ইশারা করলো সঙ্গে আসার জন্য। হাটতে শুরু করলো তারা তিনজন। "খুব বেশি লেগেছে?"

মাথার পেছনটা ডলতে ডলতেই বললো রুহিন, "হুম। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। রক্ত বের হয় নি...বাট মারাত্মক আঘাত ছিলো। পর পর দুটো। মনে হয় সিটি স্ক্যান করাতে হবে। ইন্টারনাল ড্যামেজ হলো কিনা বুঝতে পারছি না।"

লাশকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা তিন-চারজন কনস্টেবল সরে গেলো ওসিসহ তাদেরকে কাছে আসতে কাছে দেখে।

"স্পট ডেড," বললো এসআই শরীফ। "দুটো গুলি করা হয়েছে খুব কাছ থেকে।"

ব্যারিস্টার রুহিন লাশটা দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "ডেডবডির আইডেন্টিফিকেশন করতে পেরেছেন?"

"কী যে বলেন," ব্যারিস্টারের দিকে ফিরলো ওসি। "কিছুক্ষণ আগের ঘটনা...এতো দ্রুত কি আইডেন্টিফিকেশন করা সম্ভব," একটু থেমে আবার বললো, "অবশ্য ভিক্টিম আপনার মতো পরিচিত মুখ হয়ে থাকলে আলাদা কথা।"

ব্যারিস্টার কিছু বললো না। মুখ থুবরে পড়ে থাকা লোকটির দিকে চেয়ে রইলো।

ওসি ইশারা করলো দু'জন কনস্টেবলকে। তারা লাশটা ধরে চিৎ করে দিতেই ব্যারিস্টারের ভ্রু কুচকে গেলো। স্বল্প আলোতেও মুখটা কেমন জানি চেনা চেনা লাগছে তার। ব্যাপারটা ওসি আর এসআই শরীফও টের পেলো। তরুণ এসআই একজন কনস্টেবলের কাছ থেকে একটা ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে লাশের মুখে আলো ফেললো।

"ওহ্," একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এলো ব্যারিস্টার রুহিন মালিকের ভেতর থেকে। "মাই গড!"

বিস্মিত ওসি আর এসআই একসঙ্গে তাকালো তার দিকে।

"আপনি একে চেনেন?"

ওসির এ কথায় শুধু মাথা নেড়ে সায় দিলো রুহিন। আক্ষেপে চোখ বন্ধ ক'রে ফেললো কিছুক্ষণের জন্য। দাঁতে দাঁত পিষে বললো সে, "মিঃ মাহবুব!"

"এই লোকের নাম মাহবুব?" ওসি জানতে চাইলো।

"না," নীচের ঠোঁট কামড়ে বললো রুহিন মালিক। "যে খুন করেছে তার কথা বলছি।"

"তাহলে এই লোক কে?"

কপালের বাম পাশটা হাত দিয়ে ঘষতে ঘষতে বললো ব্যারিস্টার, "আমার বন্ধু," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। "রফিক!"

অধ্যায় ৪

"আপনার বন্ধু রফিক আপনারই পিস্তলের গুলিতে খুন হলো, আর ঘটনাস্থলে আপনি ছাড়া কেউ নেই," ওসি মোয়াজ্জেম সাহেব একটু থামলো, অধস্তন কর্মকর্তা শরীফের দিকে তাকালো ইঙ্গিতপূর্ণভাবে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রুহিন মালিকের দিকে ফিরলো আবার। "আপনি বলছেন আপনাদের দু'জনের পুরনো শত্রু মাহবুব নামের এক লোক এই কাজ করেছে...ব্যাপারটা কেমন জানি হয়ে গেলো না?"

"হুম, আমি বুঝতে পারছি আপনাদের অবস্থা," বললো তরুণ ব্যারিস্টার। "তবে পুরো ঘটনাটা শুনলে সব বুঝতে পারবেন..."

"তাহলে বলেন," আবারো অধস্তনের দিকে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে তাকালো ওসি সাহেব। "আমরা শুনি। আমাদের হাতে অনেক সময় আছে।"

"সব বলবো কিন্তু তার আগে ওকে গ্রেফতার করুন। দেরি করলে ওকে ধরা সম্ভব হবে না। অন্য কোথাও পালিয়ে যাবার আগে ওকে ধরে ফেলুন। খুনটা সে-ই করেছে। যদিও খুব অল্প সময়ের জন্যে দেখেছি তারপরও আমি শিওর। হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর।"

এসআই শরীফের সাথে চোখাচোখি হলো ওসির। বুঝতে পারছে না কী করবে। সন্দেহভাজন খুনিকে রেখে তারই বলা কাল্পনিক আরেকজনের পেছনে ছোটাটা কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন পুলিশের কাজ হতে পারে না। কিন্তু ব্যারিস্টার রুহিন মালিকের মতো স্বনামখ্যাত একজন ব্যক্তি পালিয়ে যাবে সে কথাও বিশ্বাস হচ্ছে না। ওসি পড়ে গেলো ছোটোখাটো একটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে।

চারপাশে তাকালো সে। আধো-আলো-অন্ধকার একটি জায়গা। ড্রিঙ্ক করা এক লোক। সে কতোটা নিশ্চিত তাতেও সন্দেহ আছে।

"কিছু মনে করবেন না," ওসি বললো। "আপনি তো ড্রিঙ্ক করা ছিলেন, জায়গাটাও বেশ অন্ধকার। কয়েক ঝলক দেখেই চিনতে পারলেন

লোকটাকে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো রুহিন মালিক। "বললাম তো, আমি একদম শিওর।"

একটু চুপ মেরে থাকলো মোয়াজ্জেম সাহেব। "হুম," অবশেষে বললো সে। "তাহলে ঐ লোকটার নাম ঠিকানা আমাকে দিন, আমি নিজে যাবো তাকে ধরতে। কিন্তু..."

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো ব্যারিস্টার।

"আমি ঐ লোককে অ্যারেস্ট করার আগ পর্যন্ত আপনি কোথাও যেতে পারবেন না।"

"কোথাও যেতে পারবো না মানে?" অবাক হলো ব্যারিস্টার রুহিন। "আমাকে হাসপাতালে যেতে হবে। ইমিডিয়েটলি সিটিস্ক্যান করা দরকার। ইন্টারনাল ব্লিডিং হচ্ছে কিনা দেখতে হবে না?"

"হাসপাতালে যাবেন?" কথাটা বলে আবারো অধস্তনের দিকে তাকালো। "উমমম...তাহলে যান। আপনার সঙ্গে শরীফও যাবে।"

এসআই শরীফ একটু অবাক হলেও মুখে কিছু বললো না।

"আপনি কি আমাকে সন্দেহ করছেন?" বিস্ময়ে বললো রুহিন মালিক। "আপনার ধারণা আমি পালিয়ে যাবো?" তিক্ত হাসি হেসে দু'পাশে মাথা দোলালো সে।

"ইয়ে মানে, তা বলছি না," কথা খুঁজে পেলো না ওসি। "আপনি খামোখাই ভুল বুঝছেন–"

"তাহলে আমার সাথে পুলিশ দিতে চাচ্ছেন কেন?" ওসির কথা পুরোপুরি শেষ করার আগেই বলে উঠলো ব্যারিস্টার।

"আপনার নিরাপত্তার জন্যই বলছি," একটা যুতসই জবাব খুঁজে পেয়ে কিছুটা খুশিই হলো বনানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

"আমার নিরাপত্তা?"

"আপনিই তো বলেছেন, মাহবুব নামের এক লোক আপনাকে ফাঁদে ফেলে এখানে নিয়ে এসে আপনারই পিস্তল দিয়ে আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হত্যা করেছে। ওরকম ভয়ঙ্কর লোক আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারে না?"

রুহিন মালিক চুপ মেরে গেলো। সে বুঝতে পারছে ওসি আসলে তাকে

একা ছাড়তে চাইছে না। এসব নিরাপত্তার কথা অজুহাত ছাড়া আর কিছুই না। ভদ্রলোক তাকেও সন্দেহের চোখে দেখছে। ঠিক আছে। সঙ্গে পুলিশ থাকলে তার কী এমন অসুবিধা। এ নিয়ে বেশি চাপাচাপি করলে হয়তো পুলিশের সন্দেহ আরো বাড়বে।

"ওকে, ফাইন," বললো রুহিন মালিক।

"বেশ, তাহলে মাহবুব সাহেবের পুরো নাম আর ঠিকানাটা আমাকে দিন, আমি এক্ষুণি ব্যাপারটা খতিয়ে দেখছি।"

পকেট থেকে মোবাইলফোন বের করলো ব্যারিস্টার। "ওর ঠিকানাটা আমার কাছে নেই, তবে আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে জেনে আপনাকে দিচ্ছি," বলেই একটা নাম্বারে ডায়াল করলো সে।

ব্যারিস্টার যখন ফোনে কথা বলতে শুরু করলো তখন ওসি মোয়াজ্জেম তার অধস্তন কর্মকর্তা শরীফকে ইশারায় ডেকে নিলো এক পাশে।

"একদম চোখে চোখে রাখবে," ফিসফিসিয়ে বললো সে। "হাতছাড়া করবে না, বুঝলে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো এসআই।

"আমার কাছে এই লোকের কাজকারবার ভালো ঠেকছে না। হাসপাতাল থেকে সোজা বাসায় যেতে বলবে। তুমি থাকবে বাসার বাইরে। দরকার পড়লে দু'জন কনস্টেবল সঙ্গে রেখো। আর উনাকে বলবে, আমি না আসা পর্যন্ত বাসা থেকে যেনো বের না হয়। ঠিক আছে?"

"জি, স্যার।"

মোয়াজ্জেম সাহেব ব্যারিস্টারের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো, "হুম, নাম্বার আর ঠিকানাটা দিন।"

অধ্যায় ৫

কাশতে কাশতে অস্থির হয়ে উঠলো সে। আজ সকাল থেকে এই কাশি। সেইসাথে গা ম্যাজ ম্যাজ করা। বরাবরের মতো একগাদা ওষুধ খেয়েছে, যথারীতি কোনো লাভ হচ্ছে না। বুঝতে পারছে আজ ঘুমের চৌদ্দটা বাজবে। অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না। এটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। মানুষ অভ্যাসের দাস। বার বার কোনো কিছু তার সাথে ঘটলে সেটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। এই অসুস্থতা, নিদ্রাহীনতা তার অভ্যাস বনে গেছে কবে থেকে সে নিজেও জানে না। যতোটুকু মনে পড়ে স্কুলে ভর্তি হবার পরই এটা তার পিছু নিয়েছিলো। তখন বইপত্র আর খাতা-কলমের সঙ্গি হিসেবে থাকতো একগাদা ওষুধ। ঢাকার বড় বড় সব ডাক্তারের চেম্বার তার চেনা হয়ে গেছে শৈশবেই। তখন থেকেই মেডিকেল টেস্টের ব্যাপারগুলো তার কাছে দৈনন্দিন জীবনের রুটিন হয়ে যায়।

আহ্, কতো দিন রাতে ভালো ঘুম হয় না। একটা আক্ষেপ ভেতর থেকে দলা পাকিয়ে বের হয়ে এলো। শেষ কবে ভালোমতো ঘুমাতে পেরেছিলো মনে করতে পারলো না। বিছানা থেকে উঠে রিডিং টেবিলের উপর রাখা একগাদা ওষুধের দিকে হাত বাড়িয়েও থেমে গেলো। ওষুধের প্রতি এই আসক্তিটা বাতিকের পর্যায়ে এসে গেছে। ডাক্তার যেসব ওষুধ প্রেসক্রাইব করে সে কেনে তার চেয়ে অনেক বেশি। তবে কখনওই ডাক্তারের উপর মাতব্বরি করে না! একটা ওষুধ বিভিন্ন কোম্পানির হয়ে থাকে। কমপক্ষে দু-তিনটি কোম্পানির ওষুধ সে কিনবেই। এটা হয়তো ওষুধ ম্যানুফ্যাকচারারদের উপর তার আস্থাহীনতার কারণ, কিংবা ডাক্তাররা যে বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির কমিশনভোগি হয়ে থাকে সেটা নস্যাৎ করার মনোবাসনাও হতে পারে।

ঠিক করলো আজ আর কোনো ওষুধ খাবে না। কী লাভ ওগুলো খেয়ে। কোনো কাজই তো হয় না। শুধু মনের শান্তি।

জাল

বিছানায় এসে আবার বইটা তুলে নিলো হাতে। সকাল থেকে এই বইটা পড়ছে। ৪৮০ পৃষ্ঠার মোটা একটি বই : *দ্য গড পার্টিকেল : ইফ ইউনিভার্স ইজ দি আনসার, হোয়াট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন?* লেখক যে সে ব্যক্তি নন, নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী লিওন লেডারম্যান। ভদ্রলোক বিজ্ঞানের সবচাইতে জটিল বিষয়–সৃষ্টির রহস্য–নিয়ে বই লিখে রীতিমতো বেস্টসেলার লেখক বনে গেছেন। গতকাল আমেরিকা প্রবাসী এক বন্ধুর কাছ থেকে ডিএইচএল কুরিয়ারের মাধ্যমে এটা হাতে পেয়েছে সে। গত সপ্তাহে চ্যাটিংয়ের সময় এই বইটার কথা বলেছিলো। অবশ্য বইয়ের সাথে যথারীতি একগাদা দামি ওষুধও পাঠিয়েছে তার প্রবাসি বন্ধুটি। তার পরিচিত মহলের কেউ যদি তাকে উপহার দেয় তাহলে সেই তালিকায় ওষুধ থাকবেই!

সকাল থেকে বইটা হাতে পাবার পর সেই যে পড়তে বসেছে আর ছাড়ছে না। ইংরেজি ভাষায় পদার্থ বিজ্ঞানের জটিল বিষয়ের এরকম একটি বই হুটহাট করে পড়া যায় না। এক পৃষ্ঠা পড়তে কমপক্ষে আধঘণ্টা লাগছে! এক প্যারা পড়ছে তো চোখ বন্ধ করে বোঝার চেষ্টা করছে বিজ্ঞানী ভদ্রলোক কী বোঝাতে চাইছেন।

পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে পড়ে যাচ্ছে। কেউ তাকে বিরক্ত করছে না। বিরক্ত করার মতো কেউ তার আশেপাশে থাকেও না এখন।

অখণ্ড অবসরে সারাদিন ডুবে থাকে বই পড়ায় আর কিছু ডকুমেন্টারি চ্যানেলের অনুষ্ঠান দেখে। মাঝে মাঝে গুগলে ঢুকে নানান বিষয়ে লেখা প্রবন্ধ-গবেষণাপত্র পড়ে। তবে কম্পিউটার মনিটরে বেশিক্ষণ পড়তে পারে না। চোখ দিয়ে পানি পড়ে–তার আরেকটা শারিরীক অসুস্থতা! লেখাগুলো প্রিন্ট করে বইয়ের আকারে তৈরি করে নেয়, তারপর বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়ে। তার একটা রিডিং টেবিল আছে কিন্তু সেখানে বসে কখনও পড়ে না। তার পড়ার জায়গা একটিই–শোবার বিছানা।

ঘড়ির দিকে তাকালো। দশটা বেজে পাঁচ কি ছয়। রাতের খাবার খেয়ে নেবে কিনা ভাবলো। কিন্তু ক্ষিদে নেই। কাশির দমকে ক্ষিদে পালিয়েছে, নয়তো ঘাপটি মেরে আছে। ক্ষিদে নিজে যদি ক্ষুধার্ত না হয় তাহলে আর মাথাচাড়া দেবে না আজ!

এ মুহূর্তে জটিল একটি অধ্যায়ে আছে। একেবারেই সাম্প্রতিক একটি

মতবাদ : স্ট্রিং থিওরি। বিষয়টা পুরোপুরি ধরতে পারছে না। আরো গভীর মনোযোগ দরকার। বইটা বুকের উপর রেখে সিলিংয়ের দিকে তাকালো। সেখান থেকে তার চোখ গিয়ে পড়লো সামনের দেয়ালে। হেসে ফেললো সে। জিভ বের করে তাকে ভেংচি কাটছে এক ক্ষ্যাপাটে ভদ্রলোক! যেনো বলতে চাচ্ছে, এসব জটিল বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানোর কী দরকার, বাবা? বইটা রেখে চার্লি চ্যাপলিনের কোনো মুভি দ্যাখো। অনেক মজা পাবে!

হেসে ফেললো সে।

তার ঘরে অদ্ভুত এই ছবিটা ছাড়া আর কোনো ছবি নেই। সঙ্গে সঙ্গে শুধরে নিলো মনে মনে। না। পাশের ঘরে আরেকজনের ছবি আছে। তবে সেই ছবিটা এমন অদ্ভুত ভঙ্গির নয়।

কিছু একটা টের পেয়ে হঠাৎ পাশে তাকালো সে। বেডসাইড টেবিলের উপর মোবাইলফোনটার ডিসপ্লের আলো জ্বলছে। কিন্তু ফোনটা একদম বোবা। এরকম সময় ফোন এলে বিরক্ত হবার কথা কিন্তু তার মুখে এক চিলতে হাসি দেখা গেলো। সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা তুলে নিলো হাতে। বুঝতে পারলো এর আগেও নিশ্চয় কয়েকবার ফোন করা হয়েছে, সে হয়তো খেয়াল করে নি, পড়ায় ডুবে ছিলো।

"হ্যালো?"

"কি ব্যাপার, ঘটনা কি...আমি তিন-চারবার ফোন দিয়ে যাচ্ছি ধরার নাম নেই," অভিযোগের সুরে বললো একটা নারীকণ্ঠ।

"সাইলেন্স মোডে আছিলো, খেয়াল করি নাই," জবাবদিহি করার সুরে বললো সে। এই একজনের কাছেই এখনও জবাবদিহি করে। আর এটা করতে পেরে তার খুব ভালোও লাগে।

"ও," একটু থেমে আবার বললো। "শরীরের কি অবস্থা? কাশি কমেছে?"

"না। রাইতের বেলায় আরো বাইড়া গেছে," কথাটা শেষ করার পর পরই খুক খুক করে কেশে উঠলো। ফোনের অপরপ্রান্তে যে আছে তার কাছ থেকে আরেকটু সহানুভূতি পাবার আশায় শিশুতোষ ভণিতা।

"ওষুধ খেয়েছো?"

"হুম, খাইছি।"

একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেলো ফোনের ওপাশ থেকে। "ওষুধ তো

তোমার বেলায় খুব একটা কাজ করে না। খামোখা কেন যে ওসব খাও বুঝি না! ”

“হু, ঠিক কইছো,” বললো সে। “তোমার খবর কি?”

“এই তো আছি,” কথাটা অনুযোগের মতো শোনালো। “জুবায়েরকে ডিনার করিয়ে ঘুম পাড়ালাম। এখন ডিনার করে ঘুমাবো। তুমি করেছো?”

“হু,” একটা অপ্রয়োজনীয় মিথ্যে বললো। কিন্তু কেন বললো সে জানে না।

“ঠিক আছে, রাখি। ঘুমিয়ে পড়ো। বেশি রাত জেগে বই পড়ার দরকার নেই।”

ওপাশ থেকে লাইনটা কেটে দেবার পরও কানে ফোন চেপে রাখলো সে। এখনও এই মেয়েটা নিয়মিত তার খোঁজ খবর নেয়। কেন যে নেয় সে জানে না। তার জীবনের রুটিন এর মুখস্ত। পর মুহূর্তেই আবার হেসে ফেললো। *মেয়ে!* ভদ্রমহিলা বলাই সঙ্গত। কতো হলো ওদের দু'জনের বয়স?

বয়সের হিসেবে না গিয়ে ফোনটা রেখে দিলো সে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো বুকের ভেতর থেকে, সেটাকে অনুসরণ করলো তিন তিনটি শুকনো খুসখুসে কাশি। তবে এই দীর্ঘশ্বাসটায় কোনো হতাশা কিংবা দুঃখ মেশানো ছিলো না। মিষ্টি একটা ব্যাপার আছে এতে। এই মিষ্টতা শুধু সে-ই উপভোগ করে।

মুচকি হেসে আবার বইটা তুলে নিলো।

অধ্যায় ৬

ফ্রিজ থেকে একটা বিয়ারের ক্যান বের করে নিলো রুহিন। তার লাক্সারি অ্যাপার্টমেন্টের বেলকনিতে এসে দাঁড়ালো। অন্যসব অ্যালোটিদের মতো নিরাপত্তাহীনতার আতঙ্কে ভুগে বেলকনিতে কোনো গ্রিল দেয় নি সে। নিজেকে ওভাবে খাঁচাবন্দি করতে ভীষণ অনীহা তার। রাতের মুক্ত বাতাসে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো। ক্যানটা খুলে কয়েক চুমুক পান করতেই ভালো লাগার অনুভূতিটা ফিরে এলো তার মধ্যে।

মাথার পেছনটা এখনও দপদপ করছে। ডাক্তার বলেছে চিন্তার কিছু নেই। সিটিস্ক্যানে বড়সড় কোনো ইনজুরি পাওয়া যায় নি। সব কিছু ঠিকঠাকমতোই আছে। তারপরও মাথাটা বেশ ভারি হয়ে আছে জ্ঞান ফিরে পাবার পর থেকে।

নীচের রাস্তায় চোখ যেতেই নড়েচড়ে উঠলো সে। শরীফ নামের এসআই ছেলেটা পায়চারি করছে আর সিগারেট ফুঁকছে। তার সাথে রয়েছে আরো দু'জন কনস্টেবল। এসআই'র ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে পারছে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অধৈর্যের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেছে সে। বিয়ারে আবারো চুমুক দিলো। এবার খুব তেতো লাগলো এর স্বাদ। মুখটা বিকৃত হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে।

স্টুপিডের দল!

পুলিশ সন্দেহ করছে খুনটা সে-ই করেছে। তাকে নজরদারির মধ্যে রেখেছে সেজন্যে। এটা সে আগেই ধরতে পেরেছিলো। বনানী থানার ওসি মোয়াজ্জেম সাহেব মোটেও তার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন নয়। ভদ্রলোক আসলে তাকে হাতছাড়া করতে চাইছে না।

মেজাজটা খারাপ হয়ে গেলো। মাহবুবকে গ্রেফতার করলেই সব পরিস্কার হয়ে যাবে। এখন শুধু অপেক্ষা করার পালা। ভালোয় ভালোয় ঐ ব্যাটাকে গ্রেফতার করলেই হয়। বেশি দেরি করলে আসামী গা ঢাকা দেবে। খুন করে কেউ তো আর নিজের বাড়িতে বসে বিয়ার খাবে না!

ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লো। জোরে জোরে কয়েকবার নিঃশ্বাস নিয়ে ভেতরে গুমোট বাধা ক্রোধ প্রশমিত করার চেষ্টা করলো সে। এক ঢোকে বাকি বিয়ারটুকু শেষ করে চোখ বন্ধ করে ফেললো।

মাহবুবের মতো মস্তিষ্কবিকৃত এক লোক কী কাণ্ডটাই না ঘটিয়েছে! ভাবাই যায় না। তাকে ফাঁদে ফেলে রফিককে খুন করেছে। বোঝাই যাচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে পরিকল্পনা করেছে। এমনভাবে কাজটা করেছে যে সেই খুনের দায় এসে বর্তেছে তার উপর।

"স্যার," একটা ভীতকণ্ঠ বলে উঠলো দরজার সামনে থেকে।

মুখ তুলে তাকালো রুহিন মালিক। কাজের ছেলে রানা দাঁড়িয়ে আছে। "কি?"

"পুলিশ আসছে," আরো ভীতকণ্ঠে বললো সে।

একটু ভেবে জবাব দিলো রুহিন, "এখানে পাঠিয়ে দাও।"

কিছুক্ষণ পর মোয়াজ্জেম সাহেবকে ঢুকতে দেখে অবাক হলো ব্যারিস্টার। সে ভেবেছিলো ঐ এসআই ছেলেটা বোধহয় তার সাথে দেখা করতে এসেছে।

"কি ব্যাপার ওসি সাহেব?" ক্যানটা সামনের টেবিলের উপর রেখে দিলো। "আসামী ধরতে পেরেছেন?"

বিয়ারের ক্যানটার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ওসি। মাথার টুপিটা খুলে মাথা দোলালো। তার চোখেমুখে বিষন্নতা।

"আমি জানতাম পালাবে," বললো ব্যারিস্টার। "বুলশিট!"

এমন সময় এসআই শরীফসহ আরো দু'জন কনস্টেবল ঘরে ঢুকলো। তবে তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো ওসির পেছনে।

"উনি পালান নাই," আস্তে করে বললো বনানী থানার ওসি।

"পালায় নি?!" অবাক হলো রুহিন। "তাহলে?"

ওসি একটু কাছে এগিয়ে এলো। "আসলে পালানোর মতো অবস্থায় উনি নাই।"

"বুঝলাম না?"

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো পুলিশের লোকটার ভেতর থেকে। "মিঃ মালিক, আপনি যে মাহবুব সাহেবের কথা বলছেন তিনি এখন হাসপাতালে।"

"হোয়াট!" ব্যারিস্টার দাঁড়িয়ে গেলো। "হাসপাতালে মানে?"

"আজ সন্ধ্যার দিকে উনার একটা অপারেশন হয়েছে। এখন পোস্ট অপারেটিভে আছেন।"

"অপারেশন!"

"হুম," একটু থেমে আবার বললো, "আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানেন...পার্কে যখন খুনটা হয় উনি তখন অপারেশন টেবিলেই ছিলেন।"

"মাই গড!" রুহিন মালিক নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলো না।

"আজ বিকেল থেকেই উনি হাসপাতালে অ্যাডমিট। নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারছিলেন না। জরুরি ভিত্তিতে অপারেশন করা না হলে ভদ্রলোক মারাই যেতেন।"

"আপনি এসব কী বলছেন?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ওসি। "আমি পুরো ব্যাপারটা খতিয়ে দেখেছি। হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, কর্মচারি, সবার সাথে কথা বলেছি। রেকর্ডপত্র ঘেটে দেখেছি।"

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো ব্যারিস্টার।

"প্রথমে উনার বাসায় যাই, সেখান থেকে জানতে পারি হাসপাতালে ভর্তি আছেন।"

আনমনে মাথার পেছনটায় হাত দিয়ে ঘষতে লাগলো রুহিন মালিক। যেনো ব্যথাটা আবার ফিরে এসেছে আগের চেয়েও বেশি তীব্রতা নিয়ে। "মাই গড...এটা কিভাবে সম্ভব!"

ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো ওসি। এখানে আসার আগে উপরমহলের সাথে যোগাযোগ করেছে। পরবর্তী পদক্ষেপ নেবার ব্যাপারে গ্রিন সিগন্যাল পেয়েছে সে। "আমাদের এখন কিছু করার নেই..."

মুখ তুলে তাকালো ব্যারিস্টার।

"আপনাকে অ্যারেস্ট করতেই হচ্ছে," কথাটা বলে একটু থামলো ওসি। "সবকিছুই এখন আপনার বিরুদ্ধে। আপনাকে অ্যারেস্ট না করে আর কোনো উপায় নেই। আইনের ব্যাপার-স্যাপার আপনার চেয়ে ভালো আর কে জানে। আপনাকে নিশ্চয় এসব ব্যাখ্যা করতে হবে না।"

স্থিরচোখে চেয়ে রইলো ব্যারিস্টার রুহিন মালিক। বুঝতে পারছে কঠিন একটা ফাঁদে পড়ে গেছে সে।

অধ্যায় ৭

ক্লাস শুরু হবার কথা সকাল দশটায়, এখন বাজে সাড়ে দশটা। অস্থির হয়ে সবাই ক্লাসরুমের বাইরে এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে আড্ডা মারছে। তারা সব মিলিয়ে বিশজন। বয়সে তরুণ, প্রাণশক্তিতে ভরপুর। এর আগে মাত্র কয়েকটা ক্লাস করেছে। তাতেই সবাই এমন মজা পেয়েছে যে পরবর্তী ক্লাসের জন্য মুখিয়ে আছে সবাই। তাদের মধ্যে অনেকে সকাল সাড়ে ন'টা বাজেই হাজির হয়ে গেছে আজ।

এই দলের মধ্যে আমিনুল নামের একজন গেছে বড়কর্তার সাথে দেখা করতে। ক্লাসটা আদৌ হবে কিনা সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাইছে তারা। আধঘণ্টা হয়ে গেলো, এভাবে আর অপেক্ষা করতে ভালো লাগছে না কারোর। সিঁড়ি দিয়ে আমিনুলকে নামতে দেখে জটলা থেকে কয়েকজন এগিয়ে গেলো তার দিকে।

"এগারোটা পর্যন্ত ওয়েট করতে বলেছে," কাউকে কিছু বলতে না দিয়ে আগেভাগে বলে উঠলো সে। "সম্ভবত উনার শরীর খারাপ করেছে আবার।"

"একটা ফোন করে দিলেই তো হতো," অধৈর্যের সুরে বললো মোটামতো দেখতে কালাম খন্দকার। "তাহলে আর খামোখা ওয়েট করা লাগতো না।"

"হুম, আমিও সেটা বললাম স্যারকে। উনি কিছু বললেন না। শুধু বললেন এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে।"

"শুনেছি উনি একটু আত্মভোলা," বললো সবচেয়ে লম্বা একজন। "হয়তো ভুলেই গেছেন আজ ক্লাস আছে।"

"উনার নাকি বারো মাসই শরীর খারাপ থাকে," অন্য আরেকজন জটলার মধ্য থেকে বললো।

"আমিও সেরকম শুনেছি," আমিনুল সিঁড়ি থেকে নেমে একটু এগোতে

এগোতে বললো। "ওষুধ আর রোগ তার নিত্য সঙ্গি।"

ঠিক তখনই একটা রব উঠলো : "স্যার আসছে! স্যার আসছে!"

তারা দেখতে পেলো মাথা চুলকাতে চুলকাতে উদাসীন ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে তাদের টিচার কেএস খান। ডিপার্টমেন্টের সবাই যাকে কেএসকে নামেই ডাকে। ভদ্রলোক তাদের দিকে মুখ তুলে তাকাতেই মলিন একটা হাসি দিলো। আর সব দিনের মতোই একেবারে সাদামাটা জামাকাপড় পরে আছে। সাদা রঙের একটা সাধারণ শার্ট আর খাকি রঙের ফুলপ্যান্ট। পায়ে চামড়ার স্যান্ডেল।

"সবাই ক্লাসে ঢুকেন, অনেক দেরি হইয়া গেছে," তাড়া দেবার ভঙ্গিতে বলে উঠলো কেএস খান। যেনো একপাল গরুর রাখাল সে। তার অনুপস্থিতিতে গরুগুলো এদিকওদিক ছড়িয়ে পড়েছিলো! সব সময় এরকম চলভাষায় কথা বলে এই সাবেক ইনভেস্টিগেটর। এটাই তার বৈশিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভদ্রলোকের শরীর যে খারাপ সেটা বলে দেবার দরকার নেই। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। বাম হাতে একটা রুমাল। সেটা দিয়ে নাক মুছে আবারো তাড়া দিলো, "জলদি করেন।"

তাদের বিশজনের দলটি ক্লাসরুমে ঢুকে পড়ার পর মাঝবয়সী কেএস খান তিন-চারটা হাঁচি দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো।

"স্যার, আপনার শরীর কি খারাপ?" আমিনুল দাঁড়িয়ে থেকেই বললো, সে হলো এই ক্লাসের অলিখিত ক্যাপ্টেন।

"হুম," সংক্ষেপে বললো ক্রিমিনোলজির গেস্ট টিচার।

"তাহলে একটা ফোন করে দিলেই হতো, আসার দরকার ছিলো না।"

এবার শিশুর মতো হেসে ফেললো কেএসকে। "ঘুম থেইকা উইঠ্যা দেখি মোবাইলফোনটা নাই। কেমনে ফোন করুম, কও?"

ক্লাসের কেউ বুঝতে পারলো না। *নাই মানে কি?*

"দরজা জানালা বন্ধ, তার মইধ্যে ফোনটা চুরি হইয়া গেছে," এমনভাবে বললো যেনো মজার কিছু ঘটেছে। "মিস্টেরিয়াস ব্যাপার।"

"আপনি শিওর ওটা চুরি হয়েছে?" আমিনুল জানতে চাইলো।

"হ," জোর দিয়ে বললো কেএসকে। "জানালা দিয়া মনে হয় চুরি করছে। কিন্তু জানালাটা অনেক দূরে, অ্যাতো দূর থেইকা কেমনে ফোনটা নিতে পারলো সেইটাই ভাবতাছিলাম। বুঝবার চেষ্টা করতাছিলাম, কাজটা

হইলো কেমনে। এইজন্যেই দেরি হইয়া গেছে।" একদমে কথাগুলো বলে থামলো সে। "শরীরটাও ভালা না। ভাবতাছিলাম ফোন কইরা কমু আইজ আর আসতে পারুম না, তখনই মনে হইলো, ধুর, রিক্সায় কইরা চইলা আসলেই হয়..."

ক্লাসের সবাই কথাগুলো শুনে গেলো চুপচাপ।

"কিছু বের করতে পারলেন, স্যার?" পেছন থেকে আস্তে ক'রে একজন বললো।

মুখ তুলে তাকালো কেএসকে। কথাটা কে বলেছে দেখার চেষ্টা করলো। ক্লাসের লম্বুটা। "না। এতো তাড়াতাড়ি ইনভেস্টিগেশনের রেজাল্ট পাওয়া যায় নাকি! টাইম লাগবো।"

সামনের বেঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকা আমিনুল বসে পড়লো এবার।

এ হলো বিখ্যাত কেএসকে। ডিবি'র এক সময়কার জাঁদরেল ইনভেস্টিগেটর। ভগ্ন স্বাস্থ্য, বিরামহীন অসুস্থতা আর চলভাষায় কথা বলা এই ভদ্রলোককে মনে করা হয় এ দেশের সবচাইতে মেধাবী ইনভেস্টিগেটর। তবে দুভার্গ্যের ব্যাপার, তার শারীরিক অসুস্থতা তাকে বাধ্য করেছে ডিবি থেকে অকালে রিটায়ার্ড করতে। এখন নবীন ইনভেস্টিগেটরদের ক্রিমিনোলজি আর অ্যাডভান্স ইনভেস্টিগেশন প্রসিডিউডিংয়ের উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। কাজটা সে মনের আনন্দেই করে। শোনা যায়, তার অকালে রিটায়ার করার পর বড় কর্তাদের একজন নাকি অনুরোধ করেছিলেন গেস্ট টিচার হিসেবে নতুন রিক্রুটদের প্রশিক্ষণের কাজটা যেনো সে করে। তার সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা আর জ্ঞান যেনো নতুনদের কাজে আসে। কেএসকে খুশিমনেই রাজি হয়েছিলো। শরীর খারাপ থাকলেও সব সময় চেষ্টা করে ক্লাস যেনো মিস না হয়। তবে মাঝেমধ্যে যখন একদমই পারে না তখন ফোন করে জানিয়ে দেয় অপারগতার কথা। ডিপার্টমেন্টও ব্যাপারটা মেনে নেয় হাসিমুখে। তারা জানে কেএসকে একজন দায়িত্ববান অফিসার ছিলো। নিজের কাজের ব্যাপারে তাকে কেউ তাড়া দেয় নি কখনও। মিস করা ক্লাসগুলো ঠিকই পুষিয়ে দেবে সে। এরকমই হয়ে আসছে। আজ যে ক্লাসটা নিতে পারলো না সেটা পরে কোনো এক ছুটির দিনে নিয়ে নেবে।

"এর আগের ক্লাসে আপনাদের পড়াইছিলাম বেসিক অব

ক্রিমিনোলজির দুইটা চ্যাপ্টার...আজ পড়ামু আরো দুইটা চ্যাপ্টার। আশা করি বাকি দুইটা ক্লাসে বেসিক অব ক্রিমিনোলজি শ্যাষ করতে পারুম," ক্লাসের আগ্রহী মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে বলে গেলো সে। পর পর দুটো শুকনো কাশি দিয়ে নাকটা মুছে নিলো রুমালে। "সরি।" মুখে বিব্রত হবার হাসি। "আগের ক্লাসে আপনাগো মোটামুটি ধারণা দিবার পারছি হোয়াট ইজ ক্রিমিনোলজি...এইবার আলোচনা করুম *কজ অব ক্রাইম্স* আর *ক্রিমিনাল মোটিভেশন* নিয়া।"

কোনো রকম বইপত্র আর নোট ছাড়াই কেএসকে পড়াতে পারে। তার স্মৃতিশক্তি নিয়ে ডিপার্টমেন্টে অনেক কিসসা প্রচলিত আছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা বলে যেতে পারে সে। ক্রিমিনোলজির উপর তার অগাধ পাণ্ডিত্য নিয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই।

"কিন্তু অপরাধীর মনস্তত্ত্ব বুঝতে হইলে আমাদেরকে একোনমিক্স, পলিটিক্যাল সায়েন্স আর সোশোলজিওটাও বুঝতে হইবো," বললো সে। "জানতে হইবো তার একোনমিক্যাল আর সোশ্যাল কন্ডিশনটা কি।"

ক্লাসের বিশজন মৃদু মাথা নেড়ে সায় দিলো। এই ব্যাপারটা কেএসকের খুব ভালো লাগে। এ হলো মনোযোগী হবার লক্ষণ। সামনে একগাদা মনোযোগী ছাত্র পাওয়ার চেয়ে শিক্ষকের আর কোনো আনন্দ থাকতে পারে?

"আচ্ছা, এর আগের ক্লাসে কি কি সাবজেক্ট নিয়া আলোচনা করছি সেইটা কি কেউ কইতে পারবেন?"

যথারীতি সামনের বেঞ্চের আমিনুলই হাত তুললো।

"বলো।"

"ফান্ডামেন্টাল অব ক্রিমিনোলজি আর থিওরিটিক্যাল পারসপেক্টিভস অন ক্রাইম অ্যান্ড ক্রিমিনাল বিহেভিয়ার, স্যার।"

"যা বলছিলাম তা তো মনে আছে, নাকি?" একটু যাচাই করে নিতে চাইলো সে। আবারো বিশটির মতো মাথা সায় দিলো এক সঙ্গে। "গুড। আপনেগো আমি আগেও কইছি, এই ক্রিমিনোলজি সাবজেক্টটা অনেক বড়। ইউরোপ-আমেরিকায় এর উপরে অনার্স-মাস্টার্সের কোর্স হয় কিন্তু আপনাগো অতো ডিটেইল পড়ানো যাইবো না। আপনাগোর জন্য আমি একটা শর্ট কোর্সের ব্যবস্থা করছি। একটু মনোযোগী হইলে, নিজ উদ্যোগে

বই-পত্র জোগার কইরা পইড়া নিলে অনেক কিছু জানতে পারবেন।"

সবগুলো চোখ তার দিকে স্থির। দৃশ্যটা খুব ভালো লাগলো। মুখে হাত দিয়ে চেপে একটু কেশে নিলো কেএসকে। তার মনোযোগ বার বার বিঘ্নিত হচ্ছে, তবে সেটা শারীরিক অসুস্থতার কারণে নয়। এরকম অবস্থার সাথে অনেক আগে থেকেই সে মানিয়ে নিয়েছে নিজেকে।

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন দেখতে পেলো বেডসাইড টেবিলের উপর মোবাইলফোনটা নেই তখন যারপরনাই অবাক হয়েছিলো। তার ঘরের দরজা বন্ধ। একটা মাত্র জানালা খোলা ছিলো। সেই জানালা দিয়ে কারো পক্ষে মোবাইলফোনটা নেয়া সম্ভব নয়। জানালা থেকে ড্রেসিং টেবিলটার দূরত্ব কম করে হলেও পনেরো ফুট। তাহলে কিভাবে ফোনটা হাওয়া হয়ে গেলো? সকাল থেকে এই প্রশ্নটাই তার মাথায় ঘুরছে। কতো বড় বড় কেস সমাধান করেছে, আর নিজের ঘর থেকে সামান্য একটা মোবাইলফোন চুরির রহস্যটা বের করতে পারবে না? এ হতে পারে না। ব্যাপারটার সমাধান না করে তার ঘুম আসবে না। এ নিয়ে ভাবতে ভাবতে কখন যে সময় গড়িয়ে যায় টের পায় নি। পরে যখন হুঁশ হয় দেখে অনেক দেরি হয়ে গেছে। প্রথমে ভেবেছিলো বাইরে গিয়ে ফোন করে বলে দেবে আজ আসতে পারছে না। শরীরটা ভীষণ খারাপ। কিন্তু বাইরে বেরোতেই চিন্তা পাল্টে ফেলে। একটা রিক্সা নিয়ে সোজা চলে আসে এখানে।

এখন ক্রিমিনোলজি পড়াতে গিয়ে বার বার ঐ একটা ভাবনাই তাকে পেয়ে বসেছে–কিভাবে মোবাইলফোনটা হাওয়া হয়ে গেলো?

এরইমধ্যে অনেকগুলো হাইপোথিসিস বাতিল করে দিয়েছে। হাতে কোনো ক্লুও নেই যে একটা ভালো হাইপোথিসিস দাঁড় করাবে। কিন্তু এমনটা তো হতে পারে না। ফোনটা চুরি হয়েছে, কাজটা করেছে দক্ষ একজন। সম্ভবত পেশাদার কোনো চোর। সে অবশ্যই বাস্তবসম্মত কোনো পন্থাই ব্যবহার করেছে। চোরের পরিচয় জানার চেয়েও চুরির পদ্ধতিটা জানার জন্য বেশি অস্থির হয়ে উঠেছে সে।

আপন মনেই মাথা দুলিয়ে আরেকটা উদ্ভট আর বেখাপ্পা হাইপোথিসিস বাতিল করে দিলো। পরক্ষণেই বুঝতে পারলো ক্লাসের সবাই তার দিকে উৎসুক হয়ে চেয়ে আছে। সবাই বুঝতে পারছে তাদের স্যার অন্য কোথাও হারিয়ে গেছে।

"সরি," বিব্রত হয়ে বললো সে। "আমরা এখন আলোচনা করুম কজ *অব ক্রাইম্স অ্যান্ড ক্রিমিনাল মোটিভেশন* নিয়া..." একটু থেমে মাথা থেকে মোবাইলফোন লাপাত্তা হবার ভাবনাটা তাড়িয়ে দিলো। "এখন বলেন তো দেখি, মানুষ কেন ক্রাইম করে?"

বিশজনের দলটি চিন্তায় পড়ে গেলো। প্রশ্নটা সহজ শোনালেও এর জবাব তাদের জানা নেই।

"রাগের মাথায়, স্যার..." আন্দাজে ঢিল ছুড়লো দ্বিতীয় সারিতে বসে থাকা একজন।

কেএসকে মুচকি হাসলো। "আর?"

"পরিকল্পনা করেও অপরাধ করে, স্যার," আমিনুল বললো একটু ভেবেচিন্তে।

"হুম," মাথা নেড়ে সায় দিলো কেএসকে। "আর কেউ কিছু কইবেন?"

"স্যা-র," রিনিঝিনি কণ্ঠে টেনে টেনে এক মেয়ে বলে উঠলো। "অ্যাকসিডেন্টলিও অপরাধ সংঘটিত হতে পারে।"

আবারো মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। এই মেয়েটা খুব ব্রাইট। প্রথম ক্লাসেও বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন আর জবাব দিয়েছে। এর নামটা যেনো কি? মনে করতে পারলো না। "কিভাবে অপরাধ সংঘটিত হয় সেইটা কিন্তু জিগাই নাই," একটু থেমে কেশে নিলো। "তাৎক্ষণিকভাবে রাগের মাথায় কোনো ক্রাইম ঘটতে পারে, আবার প্রিপ্ল্যান কইরাও এইটা করা হয়। অ্যাকসিডেন্টলি তো হইতেই পারে। সবই ঠিক আছে।"

রুমালটা পকেটে রেখে দিলো এবার। সর্দিটা কমে এসেছে।

"এগুলা হইলো একটা দিক। মাইনে ক্রাইমের ধরণ। কিন্তু আমি জানতে চাইতাছি মানুষ কেন ক্রাইম করে।"

"বুঝতে পেরেছি, স্যার," ঐ মেয়েটাই বললো। "মানুষ কোনো সুবিধা পাবার আশায় ক্রাইম করে, তাৎক্ষণিকভাবে রাগের মাথায়ও এটা ঘটতে পারে, তাছাড়া প্রতিশোধ নেবার জন্যও সে ক্রাইম করে।"

"আর কিছু নাই?"

মেয়েটা একটু ভাবলো। "উমম..." কিন্তু কিছু বলতে পারলো না।

"জেনেটিক কারণেও করতে পারে। আধুনিক সায়েন্স কিন্তু ওইরকম কথাই কয়।"

"জি, স্যার," মেয়েটা সায় দিয়ে বললো।

"তাছাড়া ক্রিমিনালি ইনসেইন বইলা একটা কথা আছে...মাইনে, মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াও অনেকে ক্রাইম করে। যেমন সিরিয়াল-কিলাররা।"

"স্যার, তাহলে কি ক্লেপটোম্যানিয়াও একধরণের ক্রাইম?" লম্বুটা বললো স্কুলবয়দের মতো হাত তুলে।

"এইটা নিয়া ডিবেইট আছে," বিষয়টার মধ্যে ঢুকে পড়েছে কেএসকে। এখন তার মনোযোগ শুধুই ক্রিমিনোলজি। "অনেক মনোবিজ্ঞানী ক্লেপটোম্যানিয়ারে ক্রিমিনাল অ্যাক্টের মইধ্যে ধরে না। আবার অনেকে মনে করে এইটাও একটা ক্রাইম।"

বুকের ভেতর থেকে দমক দিয়ে কাশি চলে এলে বহু কষ্টে সেটা দমিয়ে রাখলো কেএসকে। এটা করতে গিয়ে চোখমুখ লাল হয়ে গেলো। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো বিশজন উদীয়মান ইনভেস্টিগেটর নিষ্পলক চেয়ে আছে তার দিকে।

"আপনেরা হয়তো ভাবতাছেন এইসব জানার সাথে ইনভেস্টিগেশনের কি সম্পর্ক?" হেসে বললো সে। "ক্রাইমের ধরণ বাইর করাটা জরুরি। ইনভেস্টিগেশনের কাজে এইটা খুব উপকারে আসে। যেমন, হুট কইরা যে ক্রাইম করা হয় সেইটার রেজাল্ট আর পরিকল্পিত কোনো ক্রাইমের রেজাল্ট এক রকম হইবো না।" তরুণ কর্মকর্তাদের দিকে ভালো করে তাকালো সে। "ধরেন, একজন একটা খুন করলো, সেইটা করা হইছে তাৎক্ষণিকভাবে, রাগের মাথায়...সেই খুনটার সাথে পরিকল্পিত কোনো খুনের কিন্তু অনেক পার্থক্য থাকবো।" এবার সে লক্ষ্য করলো তার সামনে বসে থাকা মাথাগুলো আনমনেই সায় দিচ্ছে। *ভালো*, মনে মনে বললো সে। "আবার খুনি হয়তো দাবি করতে পারে সে এইটা হুট কইরা করছে, কিন্তু ঘটনা আসলে অন্যরকম। আপনেরা তখন প্রমাণ করতে পারবেন খুনটা পরিকল্পিতভাবে করা হইছে। বোঝা গেলো তো?"

মাথাগুলো সায় দিলো আবার। সবই বোঝা গেছে।

তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠলো সাবেক ইনভেস্টিগেটর কেএস খানের ঠোঁটে।

অধ্যায় ৮

পুরনো ঢাকার গলিতে গাড়ি নিয়ে ঢোকা যাবে না বলে রিক্সা নিয়ে চলে এসেছে ব্যারিস্টার রুহিন মালিক, কিন্তু নির্দিষ্ট ঠিকানায় এসে বুঝতে পারে তার ধারণা ভুল। এখানে গাড়ি পার্ক করা সম্ভব। এই লক্ষ্মীবাজার এলাকাটির রাস্তা বেশ প্রশস্ত, তার চাইতে বড় কথা বাড়িটা রাস্তার পাশেই। অনায়াসেই বাড়ির সামনে গাড়ি পার্ক করা যেতো। প্রিয় গাড়িটা না এনে ভুলই করেছে।

এখন বাড়ির সামনে পায়চারি করছে সে। যে ভদ্রলোকের কাছে এসেছে সে বাসায় নেই। বাড়ির কাজের ছেলেটা সেরকম কথাই বলেছে। তবে এও বলেছে এখনই তার চলে আসার সময় হয়ে গেছে। প্রায় পনেরো মিনিট হয়ে গেছে ভদ্রলোকের আসার নাম নেই।

গতকাল জামিনে ছাড়া পেয়েছে সে। তারপর থেকে অনেক ভেবে দেখেছে। যেভাবে খুনের মামলায় ফেঁসে গেছে তাতে করে নিজেকে বাঁচানোর একটাই উপায় আছে : তাকে এখন প্রমাণ করতে হবে খুনটা সে করে নি, করেছে হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকা মাহবুব নামের এক ক্ষ্যাপাটে লোক। কিন্তু একজন ব্যারিস্টারের পক্ষে এটা প্রমাণ করা চাট্টিখানি কথা নয়। এরজন্য চাই জাঁদরেল কোনো ইনভেস্টিগেটরের সাহায্য। এক পরিচিত পুলিশবন্ধু এই লোকের কথা বলেছে। তার মতো ভালো ইনভেস্টিগেটর নাকি এ দেশে আর দ্বিতীয়টি নেই। অকালে রিটায়ার করা এই লোক মাঝেমধ্যেই পুলিশকে বিভিন্ন জটিল কেসে সাহায্য করে থাকে।

বন্ধুর কাছ থেকে নাম্বারটা নিয়ে ভদ্রলোককে ফোন করে পায় নি রুহিন। এরপর পুলিশ বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করলে সে জানায় ভদ্রলোক অনেক সময় তার ফোন বন্ধ রাখে। বাসায় গেলেই তাকে পাবে। অগত্যা

সোজা চলে আসে এখানে।

ভদ্রলোক কি একটা ফোনই ব্যবহার করে? এই জমানায় এরকম কেউ আছে নাকি! যে রিক্সায় করে এখানে এসেছে সেই রিক্সাওয়ালারও একটা মোবাইলফোন ছিলো। প্যাডেল মারতে মারতে দুটো কল রিসিভ করেছে সে। দেশের বিরাট উন্নতি হয়েছে, বুঝতে পারছে রুহিন। অবশ্য লন্ডন থেকে বেশ ক'বছর পর দেশে এসেই এই উন্নতিটা তার চোখে পড়েছিলো।

দুপুরের এসময়টাতে বেশ রোদ পড়েছে। চকচক করছে চারপাশ। রোদের প্রকোপে রুহিন মালিকের উজ্জ্বল ফর্সা রঙ লালচে হয়ে উঠেছে। কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে রীতিমতো। গাড়ি-বাড়ি সবখানেই এসির মধ্যে থাকে। এরকম রোদ তার সহ্য হয় না। পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছে নিলো। রুমালটা রেখে ঘড়ির দিকে তাকালো আবার। একবার ভাবলো চলে যাবে কিনা। সেটা বাতিল করে দিলো মুহূর্তেই। লোকটার অন্য কোনো ফোন নাম্বার তার কাছে নেই। সুতরাং সে নিরুপায়।

"উনি তো আসছেন," পেছন থেকে কাজের ছেলেটা বলে উঠলো। "আপনে দেহেন নাই?"

রুহিন মালিক ঘুরে দেখতে পেলো ছেলেটাকে। "তাই নাকি।"

"হ," ছেলেটার হাতে একটা ফ্লাস্ক। "একটু আগেই আইছে। আইসাই কইলো, যা, এক কাপ চা নিয়া আয়।"

রুহিন মালিক অবশ্য ভদ্রলোককে বাড়িতে ঢুকতে দেখে নি। ফুটপাতে পায়চারি করার সময় কোন ফাঁকে বাড়িতে ঢুকে পড়েছে সে খেয়ালই করে নি। "আমি তাহলে উপরে যাবো?"

"যান, কুনো সমস্যা নাই। স্যারে এহন চা খাইবো। মন মেজাজ ভালা আছে," তেরো-চৌদ্দ বছরের কাজের ছেলেটা বলেই চলে গেলো ফ্লাস্ক হাতে।

ব্যারিস্টার রুহিন মালিক বাড়ির ভেতরে ঢুকে আবারও চারতলার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করলো। চারতলার উপরে এসে দেখলো দরজাটা একটু ভিজিয়ে রাখা। ফাঁক দিয়ে ভেতরে উঁকি দিলো সে। দেখতে পেলো মাঝবয়সী একজন কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ড্রইংরুমের মাঝখানে। লোকটা ঘুরে থাকার কারণে তাকে দেখতে পেলো না। কোমরে হাত দিয়ে

মাথা দোলাচ্ছে আল্‌তো করে। গভীর কোনো ভাবনায় ডুবে আছে যেনো। এরকম দৃশ্য দেখা যায় ডাগআউটে দাঁড়িয়ে থাকা ফুটবল দলের কোচদের।

রুহিন মালিক আস্তে করে দরজায় টোকা মারলো। পর পর তিনটি।

"আয়," পেছন না ফিরেই বললো লোকটা। "দরজা তো খোলাই আছে।"

একটু কাশি দিয়ে বললো রুহিন, "হ্যালো?"

কিছুটা চমকে ঘুরে তাকালো কেএসকে। ব্যারিস্টারকে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেয়ে চেয়ে রইলো সে। "কারে চান?"

"ইয়ে মানে, আমি মিঃ খো–" কথাটা বলেই থেমে গেলো রুহিন মালিক। তার যে বন্ধু এই লোকের কথা বলেছিলো তার একটা সাবধানবাণী মনে পড়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিলো সে। এই লোককে তার আসল নামে ডাকা যাবে না। এটা রীতিমতো নিষিদ্ধ বিষয়!

এরইমধ্যে কেএসকের চোখেমুখে অসন্তুষ্টি ফুটে উঠেছে।

"মানে, আমি মিঃ কেএস খানের কাছে এসেছিলাম," বললো ব্যারিস্টার।

"আমার কাছে আইছেন?" একটু অবাকই হলো সে। "আসেন, ভেতরে আসেন।"

রুহিন মালিক ড্রইংরুমে ঢুকে পড়লো খোলা দরজা দিয়ে।

"বসেন," একটা পুরনো দিনের বেতের সোফা দেখিয়ে বললো সে। তারপর নিজেও বসে পড়লো রুহিন মালিকের বিপরীতে।

পকেট থেকে বিজনেস কার্ডটা বের করতে করতে বললো অতিথি, "আমি ব্যারিস্টার রুহিন মালিক..." কার্ডটা এগিয়ে দিলো উৎসুক চোখে চেয়ে থাকা অবসরপ্রাপ্ত ইনভেস্টিগেটরের দিকে।

কার্ড হাতে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখলো কেএসকে। রুহিন কিছু বলতে যাবে অমনি ঘরে ঢুকলো সেই কাজের ছেলেটা। কেএসকে মুখ তুলে তাকালেও কিছু বললো না। ছেলেটাও চুপচাপ চলে গেলো ভেতরের একটা ঘরে।

"আমার বন্ধু মনির হোসেন, পুলিশ সুপার..." বললো রুহিন।

"ও।" শুধু এটুকুই বললো সে।

জাল

"আমি একটা জরুরি প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছি," ব্যারিস্টার বললো।

"খাড়ান, আমি একটু হাত-মুখ ধুইয়া আসি। একটু আগে বাইর থেইকা আসছি," কথাটা বলেই ভেতরের ঘরে চলে গেলো।

রুহিন মালিক ঘরের চারপাশটা ভালো করে দেখলো এবার। একেবারে ছিমছাম। আসবাব বলতে বিশাল বড় সাইজের তিনটি বুকশেল্ফ। সবগুলোই বইপত্রে ঠাসা। দেশি-বিদেশি বই আর জার্নাল। বুকশেল্ফের একপাশে একটি রিডিং টেবিল, আর তার পাশেই একটা সিঙ্গেল খাট। পুব দিকের দেয়ালে, জানালার পাশে একটা বাঁধানো ছবি। অবাক করা ব্যাপার, এটা আইনস্টাইনের জিভ বের করা সাদাকালো কৌতুকপ্রদ একটি পোর্ট্রেইট।

দু' কাপ চা একটা ট্রে'তে করে নিয়ে হাজির হলো ছেলেটা। সোফার সামনে রাখা টেবিলের উপর ট্রে'টা রাখতেই ঘরে ঢুকলো কেএসকে। বোঝা গেলো হাত-মুখ ধুয়ে এসেছে।

"গুড," ছেলেটার পিঠ চাপড়ে দিয়ে সোফায় এসে বসলো।

"আমি বুদ্ধি কইরা ডাবল নিয়া আসছি, স্যার," হেসে বললো ছেলেটি।

"এইজন্যই তো তরে আমি আইনস্টাইন কইয়া ডাকি," কেএসকে পাল্টা হেসে বললো। "বুদ্ধির দিক থেইকা তুই আইনস্টাইনেরও এক হাত উপরে।"

ছেলেটার এমন নাম শুনে রুহিন একটু অবাকই হলো।

"আর পাম দেওন লাগবো না," ছেলেটা হাসিমুখেই বললো। "আরাম কইরা চা খান।" শূণ্য ট্রে নিয়ে ঘর থেকে চলে গেলো সে।

নিজের কাপটা তুলে নিয়ে অতিথিকে ইশারা করলো কেএসকে। তারপর ছোটো একটা চুমুক দিলো। "বলেন, কি জন্য আসছেন?"

রুহিন মালিক চায়ে চুমুক না দিয়েই বললো, "আপনি হয়তো পত্রিকায় দেখেছেন আমি একটি খুনের মামলায় ফেঁসে গেছি..."

"না, দেখি নাই তো," আরেকটা চুমুক দিয়ে বললো সাবেক ইনভেস্টিগেটর। "সকাল থেইকা একটা বিষয় নিয়া টেনশনে ছিলাম, পত্রিকা পড়নের টাইম পাই নাই।"

“ও,” ব্যারিস্টার বললো। “ব্যাপারটা হলো, আমাকে এক মানসিক ভারসাম্যহীন লোক খুনের ঘটনায় ফাঁসিয়ে দিয়েছে। নিহত ব্যক্তি আবার আমার পুরনো বন্ধু।”

“ও,” আস্তে ক'রে বললো কেএসকে। খুনখারাবির কথা শুনে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখানো কিংবা বিস্মিত হওয়ার সময় অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছে সে। “কিন্তু আপনে আমার কাছে কেন আসছেন?”

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ব্যারিস্টার। “আমাকে এখন প্রমাণ করতে হবে ঐ মানসিক ভারসাম্যহীন লোকটাই খুন করেছে। কিন্তু আমি একজন ব্যারিস্টার। আপনার মতো কোনো ডিটেক্টিভ নই।”

কিছু বললো না কেএসকে। গম্ভীর হয়ে গেলো যেনো।

তরুণ ব্যারিস্টার কিছু বুঝতে পারলো না। সে আবার বলতে শুরু করলো, “আমার পক্ষে এটা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তবে আপনি পারবেন। আমি জানি, আপনার চেয়ে মেধাবী ইনভেস্টিগেটর এ দেশে খুব বেশি নেই।”

প্রশংসা শুনেও কেএসকের মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখা গেলো না। একদম নির্বিকার। আসলে অসুখের মতো এই প্রশংসার ব্যাপারটিতেও সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

“ব্যারিস্টার সাহেব, আমি তো কোনো প্রাইভেট ডিটেক্টিভ না। ছিলাম ডিবির ইনভেস্টিগেটর, শরীর ভালা থাকে না বইলা অকালে রিটায়ার করছি। আমি কেমনে আপনেরে হেল্প করুম?”

“কিন্তু আপনি তো এখনও অনেক কেসে পুলিশকে হেল্প করেন...পত্রিকায় আপনার নামও আসে। এই তো ক'দিন আগে মডেল আশ্রিতার মার্ডার কেসটা নিয়ে পুলিশ যখন কোনো কূলকিণারা করতে পারছিলো না তখন আপনি সল্‌ভ করে দিলেন...”

মাথা দোলালো কেএসকে। মডেল আশ্রিতার কেসটা খুব বেশিদিন আগের নয়। ভিক্টিম সেলিব্রেটি হওয়ার দরুণ প্রিন্ট আর ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় বেশ আলোচিত ছিলো। কেএসকের এক জুনিয়র কলিগ তদন্ত করতে গিয়ে যখন পেরে উঠতে পারছিলো না তখনই তার দ্বারস্থ হয় সে। বলাবাহুল্য মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই হত্যাকারীকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়।

"শুনেন, ওইটা আলাদা ব্যাপার। আমার সাবেক কলিগ আর ছাত্ররা কোনো কেসে সুবিধা করতে না পারলে আমার কাছে আসে, আমি ওগোরে একটু গাইড করি, কেসটা সল্ভ করতে সাহায্য করি, এই যা। কইতে পারেন, আমি ওগো কনসালটেন্ট হিসাবে কাজ করি।" একটু থেমে আবারও কেশে নিলো। "কিন্তু আপনের কেসটা তো সেইরকম না। আপনে একটা কেসে ফাঁইসা গেছেন, এখন চাইতাছেন ইনভেস্টিগেশন কইরা ব্যাপারটা প্রমাণ করতে...আপনার দরকার একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর।"

"হুম, কিন্তু আমাদের দেশে কি কোনো প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর আছে?"

এর জবাব কেএসকে'র ভালোই জানা। চুপ করে থাকলো সে।

"নেই," দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো রুহিন মালিক। "সেজন্য আপনার কাছে এসেছি।"

"আমার তো প্রইভেট ইনভেস্টিগেশনের কোনো লাইসেন্স নাই," নিজের অবস্থা তুলে ধরলো কেএসকে।

ব্যারিস্টার রুহিন হেসে ফেললো। "আপনার মতো কোনো লোকের কি লাইসেন্স লাগে?" মাথা দুলিয়ে আবার বললো সে, "লাগে না। পুলিশ কিংবা ডিবির যেসব কর্মকর্তা এইসব কেস ইনভেস্টিগেশন করে তারা সবাই আপনার সাবোর্ডিনেট ছিলো।"

"তা ঠিক, কিন্তু আমি কেমনে অন্য একটা কেসের ব্যাপারে নাক গলাই, কন? এইটা তো এথিক্সের বাইরের একটা কাজ। আমি এমুন কাজ করি না।"

"আমি কিন্তু বলছি না আপনি কোনো প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের মতো আমার হয়ে কাজ করবেন..."

"আপনি বললেও আমি সেইটা করতে পারতাম না। মনে রাখবেন, আমি একজন রিটায়ার করা লোক। যদি চাকরিতেও থাকতাম তারপরও এইটা করতে পারতাম না। আমরা কোনো ক্লায়েন্টের হইয়া কাজ করি না।"

"তা আমি জানি। আসলে আমি শুধু আপনার কাছ থেকে একটু সাহায্য চাইছি, আর কিছু না।"

"সেইটা কি আমার পক্ষে করা সম্ভব?"

"সম্ভব," বেশ জোর দিয়ে বললো ব্যারিস্টার।

"কেমনে?"

"এই কেসটার তদন্ত করবো আমি নিজে, আপনি শুধু আমাকে গাইড করবেন। বিনিময়ে আমি আপনাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবো।"

মুচকি হাসলো কেএসকে। "আপনে একজন ব্যারিস্টার মানুষ। লোকজন আপনার কাছে আসে, টাকার বিনিময়ে আপনে ওগোর পক্ষ হইয়া মামলা লড়েন। চেষ্টা করেন নিজের ক্লায়েন্টরে বাঁচানোর। তারা দোষি না নির্দোষি এইটা নিয়া খুব একটা ভাবেন না। কিন্তু আমরা কি করি?" জবাবের জন্য অপেক্ষা না করেই বলতে লাগলো সে, "আমাগো তো কোনো ক্লায়েন্ট থাকে না। আমরা আসল ঘটনাটা কি, কে ঘটাইছে, কে বা কারা এর জন্য দায়ি এইসব তদন্ত কইরা বাইর করি। এর বিনিময়ে আপনাগো মতোন মোটা অঙ্কের কোনো পারিশ্রমিকও পাই না।"

শেষের কথাটা একটু খোঁচার মতো শোনালো। ব্যারিস্টার রুহিন মালিক কিছু বললো না।

"আর উপযুক্ত পারিশ্রমিকের কথা কইলেন তো? আমি টাকার বিনিময়ে কোনো কাজ করি না।"

"একটু আগে না বললেন আপনার সাবেক সহকর্মী আর ছাত্রদের অনেক কেসে কনসালটেন্টের কাজ করেন?"

মাথা দোলালো কেএসকে। "তা করি। কিন্তু বিনিময়ে তো কোনো পারিশ্রমিক নেই না।"

অবাক হলো ব্যারিস্টার। এই লোকটাকে বুঝতে পারছে না। এর কথাবার্তা থেকে শুরু করে সব কিছুর মধ্যেই একটা বেখাপ্পা জাতীয় কিছু আছে। দেখেও তুখোড় কোনো গোয়েন্দা বলে মনে হয় না। ভগ্নস্বাস্থ্য, মাঝারি গড়ন, চেহারার মধ্যে উদাসীন একটা ভাব রয়েছে। এ লোককে দেখে মনে হতে পারে সাহিত্যিক কিংবা গবেষক। যে নিজের পুরো জীবনটা উৎসর্গ করে দিয়েছে অর্থহীন কোনো কাজকর্মে!

এখন বলছে বিনা পয়সার কনসালটেন্ট! আজব। দাতা হাতেমতাইয়ের যুগ কি এখনও আছে নাকি?

জাল

"আপনি তাহলে বিনে পয়সায় ওদের কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করেন?"

শুধু মাথা নেড়ে সায় দিলো কেএসকে।

কথাটা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হলো ব্যারিস্টারের। "ওরা আপনার পুর্ব পরিচিত, সহকর্মী ছিলো, শুধু এরজন্য বিনে পয়সায় ওদের হেল্প করেন?"

হাসি দিয়ে আবারো মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

"আপনার কি মনে হচ্ছে না আমার মতো একজন নির্দোষ মানুষকে মিথ্যে মামলা থেকে বাঁচানো উচিত? অ্যাট লিস্ট হেল্প করা উচিত, যাতে আমি এই চক্রান্তের জাল থেকে বের হতে পারি?"

"আপনে যে নির্দোষ সেইটা আমি শিওর হমু কেমনে?" নির্বিকারভাবে বললো কেএসকে। "আপনেরে তো পাঁচ মিনিট আগেও চিনতাম না। এখনও ভালো কইরা চিনি না।"

ব্যারিস্টার কিছু বলতে পারলো না। বলার মতো কিছু নেইও। কথাটা একদম সত্যি।

"আমি যদি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর হইতাম, আপনার মতো প্রফেশনাল লোক হইতাম তাইলে হয়তো নিজের ক্লায়েন্টের সব কথা বিশ্বাস করতাম।"

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো রুহিন মালিকের ভেতর থেকে। "আপনি কেসটা হাতে নিলেই বুঝতে পারবেন আমি দোষি না নির্দোষ..."

"সরি," সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো অবসরপ্রাপ্ত ইনভেস্টিগেটর। "আমি এইভাবে কাজ করি না। এইটা আপনেরে বুঝতে হইবো।"

ব্যারিস্টার বুঝতে পারলো না 'এইভাবে কাজ করি না' বলতে কী বোঝাচ্ছে তার সামনে বসে থাকা ভদ্রলোক।

উঠে দাঁড়ালো কেএসকে। যার অর্থ এই মিটিংটা শেষ হয়ে গেছে। ব্যারিস্টার যেনো চলে যায়।

রুহিন মালিকও উঠে দাঁড়ালো। ভগ্ন স্বাস্থ্যের লোকটার চোখেমুখে যে দৃঢ়তা সেটা একেবারেই মজবুত। রুহিন মালিকের পক্ষে সেই দৃঢ়তা টলানো সম্ভব নয়। তাছাড়া কাউকে অনুনয় করা, বার বার অনুরোধ করা তার স্বভাবে নেই।

“ঠিক আছে,” বলে হাত বাড়িয়ে দিলো ব্যারিস্টার। “আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করলাম বলে দুঃখিত।”

হাতটা ধরে বললো কেএসকে, “না, ঠিক আছে। আপনেরে কোনো সাহায্য করতে পারলাম না বইলা আমিই দুঃখিত।”

চুপচাপ ঘর থেকে বের হয়ে গেলো তরুণ ব্যারিস্টার। কয়েক মুহূর্ত পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো কেএসকে। তার মাথায় সেই একটা চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছে।

মোবাইলফোনটা কিভাবে ঘর থেকে চুরি হলো?

অধ্যায় ৯

হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকতে তার ভালো লাগছে না, ইচ্ছে করছে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতে। সবার আগে কক্সবাজার যাবে তারপর রাঙামাটি। বিয়ের পর তারা দেশের বাইরে না গিয়ে এ দু' জায়গায় হানিমুন করেছিলো। এ দুটো জায়গা শায়লার খুব প্রিয়। বিয়ের পরও তারা আরো দু'বার গেছে। সেসব দিনগুলোর মধুর স্মৃতি তাকে এখনও কাতর করে তোলে।

মনে মনে ঠিক করলো সুস্থ হবার পরই ওখানে যাবে। শায়লার স্মৃতিগুলো আরো বেশি করে উপলব্ধি করবে। তারা যেখানে যেখানে ঘুরেছিলো, যেখানে থেকেছিলো, যেসব রেস্তোরাঁয় খেয়েছিলো, সব জায়গায় যাবে। সে জানে শায়লা তার পাশেই থাকবে তখন। তাকে ছায়া সঙ্গির মতো অনুসরণ করবে।

এ ভাবনাটা তাকে অস্থির করে তুললো যদিও এখন কিছু করার নেই। কমপক্ষে আরো চার-পাঁচ দিন তাকে এখানে থাকতে হবে। তবে হাসপাতাল থেকে বের হলেই যে সব ঝামেলা শেষ হয়ে যাবে তা নয়। পুলিশের হাঙ্গামা পোহাতে হবে আরো কয়েকটা দিন। একজন অপারেশনের রোগি যে খুনখারাবির মতো কাজ করতে পারে না এটা ঐসব গাধার বাচ্চাদের বোঝাতে আরো কয়েকটা দিন লেগে যাবে।

তার সামনে একটা চৌদ্দ ইঞ্চির টিভি আছে। তাতে ডিসকভারি চ্যানেল চলছিলো, তবে মিউট করা। রিমোটটা নিয়ে চ্যানেল সুইচ করে দেশীয় একটা চ্যানেলে গেলো। খবর হচ্ছে। উৎসুক হয়ে উঠলো সে। গতকাল থেকে টিভি নিউজে ঐ খবরটা বার বার প্রচার হচ্ছিলো : প্রখ্যাত ব্যারিস্টার রুহিন মালিক খুনের মামলায় গ্রেফতার!

তার যে কী ভালো লাগছিলো খবরটা দেখে। বদমাশটা শেষ পর্যন্ত জেলে গেছে। সবকিছু ঠিকঠাকমতো এগোলে ফাঁসি কিংবা যাবজ্জীবন হবে

নির্ঘাত।

হঠাৎ টিভির পর্দায় ঐ ব্যারিস্টারের ছবি দেখে সাউন্ড বাড়িয়ে দিলো।

সংবাদ পাঠিকা বলছে : ব্যবসায়ি রফিক হাওলাদার হত্যা অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া ব্যারিস্টার রুহিন মালিক আজ জামিনে ছাড়া পেয়েছেন...

টিভিটা বন্ধ করে দিলো সে। মেজাজ বিগড়ে গেছে। এরকম একটা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় হাতেনাতে গ্রেফতার হওয়ার একদিন পরই জামিন দিয়ে দিলো?

শূয়োরেরবাচ্চা! চোখমুখ বিকৃত হয়ে গেলো তার। *এতো সহজে জামিন পেয়ে গেলি!*

কিন্তু সে জানে, ঐ নীতিহীন ব্যারিস্টার জামিন পেলেও খুনের মামলা থেকে রেহাই পাবে না। তার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করলো : ভাইসব, খুনটা ঐ বানচোতই করেছে! বিশ্বাস করেন! সে একটা খুনি!

নিজের ঘরে বসে আছে কেএসকে। সারাদিন একটা চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছে তার মাথায়–মোবাইলফোনটা কিভাবে চুরি হলো?

সে একদম নিশ্চিত, ঘরের দরজা বন্ধ ছিলো। সুতরাং আইনস্টাইন সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ। আপন মনে হেসে উঠলো কেএস খান। ইনভেস্টিগেটর হিসেবে কাজ করতে করতে তার মধ্যে সন্দেহবাতিকতা এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে, আপনজন হলেও রেহাই নেই। যদিও তার মনের যুক্তবাদী অংশটাও বলছে, আইনস্টাইন এটা করবে না। তার কারণ এ কাজ করার কোনো দরকারই নেই তার। কেএসকে নিজে যেরকম মডেলের মোবাইলফোন ব্যবহার করে ঠিক সেই মডেলের একটা ফোন আছে ছেলেটার। তারচয়েও বড় কথা, হাতটানের অভ্যাস নেই ওর। যে ছেলে বাজারের টাকা থেকে টু-পাইস মেরে দেয় না তার পক্ষে এমন কাজ করা সম্ভব নয়।

তাহলে?

এটাই হলো চিন্তার বিষয়। কারণ ঐদিন তার ঘরের দরজা বন্ধ ছিলো, শুধুমাত্র উত্তর দিকের একটা জানালা খোলা থাকলেও সেটা বেডসাইড টেবিল থেকে কমপক্ষে দশ-বারো ফিট দূরে।

জাল

চোর যদি জানালা দিয়েও চুরি করে থাকে তাহলে সে কিভাবে এটা করতে পারলো?

আইনস্টাইনের দিকে তাকালো। ছেলেটা তার সামনেই বসে আছে। উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মনিবের দিকে।

"কিছু বুঝবার পাইলেন?" কৌতুহল নিয়ে জানতে চাইলো সে।

"হুম," উদাস হয়ে বললো কেএসকে।

"ধইরা ফালাইছেন?" খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো আইনস্টাইনের চোখ দুটো।

"আ?" সম্বিত ফিরে পেলো যেনো। "না, না। এখনও ধরবার পারি নাই।"

আশাহত হলো আইনস্টাইন। "আমি তো ভাবলাম ধইরা ফালাইছেন।"

মুচকি হাসলো কেএসকে। তার কাছ থেকে সবাই এরকমই প্রত্যাশা করে, সেটাই স্বাভাবিক। কতো জটিল আর বড় বড় কেস দ্রুত সল্‌ভ করে ফেলেছে। আর এটা তো সামান্য একটা মোবাইলফোন চুরির ঘটনা, তাও আবার নিজের ঘর থেকে খোয়া গেছে!

"অনেক সময় ছোটোখাটো কেস খুব ভোগায়, বুঝলি?"

আইনস্টাইনের চোখমুখ দেখে অবশ্য বোঝা গেলো না সে বুঝতে পেরেছে। তবুও মাথা নেড়ে সায় দিলো ছেলেটা।

"প্রথম কথা, মোবাইলটা চুরি হইছে, এইটা কিন্তু শিওর," বললো কেএসকে।

"হ, পুরা শিওর," সহমত পোষণ করলো আইনস্টাইন।

"তার মাইনে ঐ জানালাটা দিয়া চুরি করছে। ঘরের দরজা আর অন্য জানালাগুলা কিন্তু ঐদিন বন্ধ ছিলো।"

"হ, সব বন্ধ আছিলো।"

"আর মোবাইলটা ছিলো এইখানে," বেডসাইড টেবিলটা দেখিয়ে বললো সে। "তাইলে জানালা দিয়া কেমনে জিনিসটা নিতে পারলো?"

"খাড়ান, একটু চিন্তা কইরা দেহি," আইনস্টাইন ভাবতে লাগলো। তাকে খুব সিরিয়াস দেখাচ্ছে এখন।

"চিন্তা করার সময় জটিল চিন্তা করবি না, বুঝলি?"

আইনস্টাইন একটু মাথা নেড়ে সায় দিলেও চিন্তার মধ্যেই ডুবে রইলো।

"সহজ চিন্তা করবি। সবচাইতে সহজ চিন্তাটাই হইলো সবচাইতে দামি চিন্তা।" কেএসকে একটু থেমে ঘরের চারপাশটায় চোখ বুলালো। "মানুষের হাত দশ-বারো ফিট লম্বা হইতে পারে না। তাইলে চোরে কেমনে চুরি করলো?"

আইনস্টাইন চকিতে একবার তার দিকে তাকালেও গভীর চিন্তায় ফিরে গেলো সঙ্গে সঙ্গে।

"তুই নিজে কাজটা করলে কেমনে করতি? এইভাবে চিন্তা কর।"

রোগাপটকা আইনস্টাইনের ঠোঁটে হাসি দেখা গেলো, যেনো কিছু একটা পেয়ে গেছে।

"কি? কিছু পাইলি?"

"আমি হইলে কেমনে করতাম?"

"হ।"

"লগ্গি দিয়া করতাম!"

কেএসকে বুঝতে পারলো না। "কি দিয়া করতি?"

"বুঝলেন না?" বিরক্ত হলো যেনো। "লগ্গি দিয়া। আরে, গোডাউনের আমগাছ থেইকা যেমনে আম পাড়ি..."

এবার বুঝতে পারলো সাবেক ইনভেস্টিগেটর। তার বাড়ির পাশে একটি সরকারী গোডাউন রয়েছে। সেখাকার আমগাছে আম এলে আইনস্টাইন চিকন বাঁশের লগ্গির এক মাথায় তার দিয়ে ছোট্ট একটা বৃত্ত আর কাপড়ের ঝুরি বানিয়ে অনায়াসে আম পেড়ে থাকে।

"হ, আইডিয়াটা খারাপ না," কেএসকে স্বীকার করে নিলো। বেডসাইড টেবিল আর জানালাটার দিকে তাকালো আবার। "কিন্তু সেইটা ফিজিবল কিনা দেখতো হইবো।"

আইনস্টাইন ফিজিবল কথাটার মানে না বুঝলেও ধরতে পারলো। "আমি কি ওইরহম একটা লগ্গি নিয়া জানালা দিয়া টেরাই কইরা দেখুম?"

হেসে ফেললো কেএসকে। "অতো রিস্কে যাওনের কাম নাই। তুই জানালার ভেতর থেকাই ট্রাই করিস।"

উৎসাহী হয়ে উঠলো ছেলেটা। "ঠিক আছে।"

"কিন্তু আমার মনে হইতাছে ওইভাবে মোবাইলটা নেওয়া সম্ভব না।"

"ক্যান?" আইনস্টাইনের চটজলদি প্রশ্ন।

সাইড টেবিলটা দেখালো সে। ওটার পাশে একটা বুকসেলফ আছে। "মোবাইলটা আমি রাখি এইখানে," সাইড টেবিলের একটা জায়গা দেখালো। বুকসেল্‌ফের কারণে জানালা দিয়ে ওই জায়গা থেকে লগ্নি ব্যবহার করে জিনিসটার নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়।

আইনস্টাইন বুঝতে পারলো। "হ, ঠিকই কইছেন। কিন্তু টেরাই কইরা দেহি না কি হয়?"

ইনভেস্টিগেটর খান বুঝতে পারলো ছেলেটার আগ্রহে ভাটা পড়ে নি।

"পরে করিস। এখন না। এখন আমারে এক কাপ চা খাওয়া। কড়া লিকারের চা আনবি।"

"তাইলে নসুর চা নিয়া আহি?"

"যা, নিয়া আয়।"

আইনস্টাইন দরজার কাছে গিয়ে আবার ফিরে তাকালো। "লগ্নি দিয়া না কইরা পেলাস্টিকের পাইপ দিয়াও কামটা করবার পারে।"

"তুই চা নিয়া আয়। এইসব পরে চিন্তা করুম নে।"

কেএসকে বিছানার পাশে রাখা দুদিনের পত্রিকাগুলো হাতে তুলে নিলো। এগুলো এখনও পড়া হয় নি।

আর ভাবতে ভাবতে চলে গেলো আইনস্টাইন।

অধ্যায় ১০

ব্যবসায়ি রফিক হাওলাদারের খুনের ঘটনা নিয়ে দেশের পত্রপত্রিকা আর টিভি চ্যানেলগুলো ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এরকম একজন ব্যবসায়ি খুন হলে সেটা নিয়ে এতো হৈচৈয়ের কিছু ছিলো না কিন্তু রুহিন মালিকের মতো একজন জড়িত ব'লে ব্যাপারটা সেনসেশনে পরিণত হয়েছে এখন।

কোর্ট থেকে জামিন নিতে তার কোনো সমস্যাই হয় নি। তার আইনজীবি বন্ধুরাই এটার ব্যবস্থা করেছে। সেও জানতো তাকে বেশিদিন আটকে রাখা যাবে না। তবে জামিনে বের হয়ে আসার পর নিজের সার্কেলের বাইরে খুব একটা যায় নি। সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়েছে মোবাইলফোন আর ফেসবুক নিয়ে। সোশ্যাল নেটওয়ার্কটা নাহয় কয়েকদিনের জন্য বন্ধ রাখা গেলো, মোবাইলফোন তো আর অফ করে রাখার উপায় নেই।

নিজের বাড়িতে ফিরে আসার পর থেকে তার সেলফোনটা এক মিনিটের জন্যেও বিশ্রাম নিতে পারে নি। শত শত ফোনকল আসছে। তার পরিচিত, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবেরা অস্থির হয়ে জানতে চাচ্ছে ঘটনা কি।

আরে বাবা, সেটা কি আমি জনে জনে ব্রডকাস্ট করবো এখন? আজব! ঘটনাটা তো আর এক কথায় বলাও সম্ভব নয়।

আপাতত ক্লাবে যাওয়া বন্ধ রেখেছে কিন্তু নিজের চেম্বারে যাওয়া উচিত। গত দু'দিন ধরে চেম্বারে যাওয়া হয় নি। প্রতিদিন সকালে উঠে ব্রেকফাস্ট করেই চেম্বারে চলে যায় সে-এটাই তার রুটিন হয়ে গেছে। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে চেম্বারে যাবে। গোসল করে রেডি হয়ে গাড়িটা নিয়ে বের হতে যাবে অমনি ফোনটা বেজে উঠলো। বিরক্ত হয়ে তাকালো ডিসপ্লের দিকে। আরেকজন শুভাকাঙ্খি! তারচেয়েও বেশি উদ্বিগ্ন। 'ফস্কা পড়ে নি মলম লাগাতে এসেছে' টাইপের একজন।

জাল

বুলশিট!

বিছানা বাদে মেয়েমানুষের ন্যাকামি তার অসহ্য লাগে। রিংটা একবার বেজে শেষ হতেই ফোনটা অফ করে রাখলো। সে জানে, কলার আবারো ডায়াল করবে। তাকে না পেলে পর পর তিনবার, চারবার এমনকি পাঁচ-ছ'বারও ডায়াল করতে পারে। অস্থিরমতি একজন। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে তার জন্যে।

হেসে ফেললো রুহিন। এরকম উদ্বিগ্ন-পার্টির সংখ্যা কম নয়। নীচে নেমে পার্কিংলট থেকে গাড়িটা নিয়ে বের হয়ে গেলো সে। তার বাসা থেকে চেম্বারের দূরত্ব হাস্যকরকমের দূরত্বে, তবুও গাড়ি ছাড়া বের হয় না কখনও।

একটু পরই চলে এলো সেখানে। চেম্বারে ঢুকে ব্যারিস্টার রুহিন মালিক যারপরনাই অবাক। ওয়েটিংরুমে বসে আছে কেএসকে!

পায়ের উপর পা তুলে চা খাচ্ছে আর পত্রিকা পড়ছে মন দিয়ে। তার গলায় নেকগার্ড লাগানো। দেখে অসুস্থ বলেই মনে হচ্ছে তবে ভাবভঙ্গিতে সেটার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।

"আপনি? কখন এলেন? ঘাড়ে কি হয়েছে?"

চোখের সামনে থেকে পত্রিকা নামিয়ে শিশুসুলভ হাসি দিলো সাবেক ইনভেস্টিগেটর। "এই তো একটু আগে আসছি।" পত্রিকাটা রেখে দিলো সে। ঘাড় নাড়াতে বেগ পাচ্ছে। "কাইল সারা রাত বিছানায় শুইয়া শুইয়া বই পড়তে গিয়া এই অবস্থা। ঘাড়ের রগ চমকাইছে। তেমন কিছু না।"

"ভেতরে আসুন, প্লিজ," বলেই নিজের চেম্বারের দিকে এগোলো সে।

ডেস্কের সামনে একটা চেয়ারে বসে পড়লো কেএসকে। রুহিন মালিক যে তাকে চেম্বারে দেখে খুব অবাক হয়েছে সেটা প্রকাশ করলো না।

"আপনের কেসটা নিয়া পত্রিকাগুলা তো ভালোই খবর ছাপছে," রুহিন কিছু বলার আগেই বললো মিঃ খান। "তয় বেশিরভাগই আন্দাজের উপর লেখা।"

"হুম। আমার রেপুটেশনের বারোটা বাজানোর পায়তারা করছে আর কি," আক্ষেপে বললো সে। "আমার মতো একজন ব্যারিস্টার তারই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর খুনের মামলায় প্রধান আসামী হয়েছে, এটা তো ওদের জন্য বিরাট

একটি নিউজ আইটেম।"

"ওগোরে তো দোষ দিয়া লাভ নাই। কেসটা আসলেই অন্যরকম। আপনে চইলা যাইবার পর আমি পত্রিকা পইড়া কেসটা সম্পর্কে কিছু জানলাম। আমার কাছে তো খুবই ইন্টারেস্টিং মনে হইতাছে।"

ব্যারিস্টার একটু খুশি হয়ে উঠলো। ভদ্রলোক তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে হয়তো। এটা একটা ভালো সংবাদ।

"আচ্ছা," বললো ব্যারিস্টার। "কিছু বুঝতে পারলেন?"

"তেমন কিছু না। পত্রিকা পইড়া এইরকম একটা কেস সম্পর্কে কিছু বোঝা সম্ভব না। তয়, কেসটা অন্যরকম।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ব্যারিস্টার।

"আপনার স্টেটমেন্টটা সত্যি ধইরা নিলে পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেছে কিন্তু একটার কোনো জবাব নাই।"

রুহিন মালিক কিছুই বুঝতে পারলো না। "জি, বুঝলাম না? পাঁচটা প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেছে মানে?"

"ওহ্, সরি," হেসে ফেললো কেএসকে। "এইটা হইলো ইনভেস্টিগেশনের সূত্র। যেকোনো ইনভেস্টিগেশন করতে গেলে আপনারে ছয়টা প্রশ্নের জবাব জানতে হইবো। কি-কে-কোথায়-কখন-কেন আর কিভাবে। এই ছয়টা প্রশ্নের জবাব বাইর করতে পারলেই কেস সল্‌ভ।"

"আচ্ছা," বললো রুহিন মালিক। যদিও পুরো বিষয়টা এখনও পরিস্কার নয় তার কাছে।

"অন্যান্য কেসের মতো আপনের কেসটাতেও কিছু জবাব এমনিতেই পাওয়া গেছে। আমরা জানি ঘটনাটা কি...একটা খুন হইছে। কে খুন হইছে?...আপনের বন্ধু রফিক। কোথায় হইছে, কখন হইছে, সেইটাও জানি। আর আপনের কথা যদি সত্যি ধইরা নেই তাইলে কেন খুন হইছে তাও বুঝবার পারি। কিন্তু কিভাবে খুনটা হইছে? এইটাই হইলো সমস্যা।"

ব্যারিস্টারের কাছে এবার পুরো বিষয়টা পরিস্কার। "এটা কি শার্লোক হোম্‌সের সূত্র নাকি?"

"আরে না," হাত নেড়ে বাতিল করে দিলো। "এই ছয়টা প্রশ্নের ফর্মুলাটা কে দিছে জানেন?" রুহিন মালিক মাথা দোলালো। সে জানে না।

"বৃটিশ সাহিত্যিক রুইডইয়ার্ড ক্লিপলিং। সে আবার সবচেয়ে অল্পবয়সে সাহিত্যে নোবেল পাইছে।"

"তাই নাকি," বললো ব্যারিস্টার।

"কবি-সাহিত্যিকেরাও অনেক সায়েন্টিফিক কথা কইতে পারে, তাই না?"

"তাই তো দেখছি।"

"আপনের কেসটা কেন এতো ইন্টারেস্টিং মনে হইতাছে জানেন?"

কেএসকের প্রশ্নটা শুনে রুহিন মালিক আবারো মাথা দোলালো।

"বেশিরভাগ কেসে বাইর করতে হয় 'হু ডান ইট।' মানে কাজটা করলো কে। কিন্তু আপনের কেসে বাইর করতে হইবো কাজটা কেমনে করা হইলো। আই ফিল ভেরি এক্সাইটেড।"

"তাহলে আপনি ইনভেস্টিগেশন করতে রাজি আছেন?"

"না," ছোট্ট করে বললো সাবেক ইনভেস্টিগেটর।

হতভম্ব হয়ে গেলো ব্যারিস্টার। "না?"

"ভুইলা গেছেন, আপনে বলছিলেন তদন্তটা করবেন আপনে, আমি খালি আপনেরে গাইড করমু...মানে আমি আপনের কনসালটেন্ট।" কথাটা বলে হেসে ফেললো কেএসকে।

রুহিন মালিকও হেসে ফেললো। "দ্যাটস গুড।"

"কিন্তু একটা কথা," বললো মিঃ খান।

"বলেন?"

"আমি যেই মুহূর্তে জানতে পারুম খুনটা আসলে আপনেই করছেন তখন কিন্তু আপনের সঙ্গে আমার সব হিসাব খতম হইয়া যাইবো। আমি সোজা পুলিশের তদন্তকারী অফিসারের কাছে গিয়া রিপোর্ট কইরা দিমু।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ব্যারিস্টার। "আই হ্যাভ নো প্রবলেম। কারণ এরকম ঘটনা ঘটবে না। খুনটা আমি করি নি," বেশ জোর দিয়ে বললো রুহিন।

কেএসকে কিছু বললো না, ব্যারিস্টারের দিকে চেয়ে রইলো। এই প্রথম রুহিন মালিক বুঝতে পারলো সাবেক ইনভেস্টিগেটরের দৃষ্টি খুবই অন্তর্ভেদী। যেনো তার ভেতরটা ভেদ করে ফেলছে। দু'চোখের পেছনে কি

ভাবনা খেলে যাচ্ছে সেটা বোঝার চেষ্টা করছে।

"মনে হয় না খুনটা আপনে করছেন," মাথা নেড়ে সায় দিলো কেএসকে। "আমার অনুমাণ অবশ্য ভুলও হইবার পারে।"

"আপনার অনুমাণ একদম ঠিক আছে, মিঃ খান," বললো রুহিন। "ট্রাস্ট মি।"

"ওকে।" একটু থেমে আবার বললো, "বনানী থানার ওসিরেও ফোন দিছিলাম। ও কইলো কেসটা নাকি ডিবি তদন্ত করবো। তার মাইনে আমার কোনো কলিগ কিংবা স্টুডেন্ট এইটা করবো।"

"আচ্ছা," ছোট্ট করে বললো রুহিন।

"ওসির কাছ থেইকা কেসটা সম্পর্কে ডিটেইল শুইনা মনে হইলো এইরকম কেস আমি কখনও পাই নি। খুবই ইন্টারেস্টিং একটা কেস হইবো।"

এ ব্যাপারে রুহিন মালিকের নিজেরও কোনো সন্দেহ নেই। মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

"আদা দিয়া রঙ চা দেওন যাইবো?" বললো কেএসকে।

"অবশ্যই," সঙ্গে সঙ্গে ডেস্কের নীচে সুইচটা টিপে দিলো ব্যারিস্টার। "আর কিছু?"

"না। খালি এক কাপ আদার চা দিবার কন।"

হাসতে হাসতে মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

"চা আসতে আসতে পুরা ঘটনাটার ব্যাকগ্রাউন্ড আমারে খুইল্যা কন দেখি।"

এমন সময় অ্যাসিসটেন্ট ছেলেটা ঘরে ঢুকলো। "এক কাপ আদার চা। জলদি।" একটু থেমে আবার বললো ব্যারিস্টার, "ব্যাকগ্রাউন্ড মানে?"

"মাইনে মাহবুব নামের এক মেন্টাল পেশেন্ট কেন আপনেরে এইভাবে হত্যা মামলায় ফাঁসাইবো? কারণটা কি?"

"ও," বুঝতে পারলো রুহিন। "ঘটনার শুরু বেশ কয়েক বছর আগে..."

"বলেন।" উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো কেএসকে।

"মাহবুব সাহেব অনেক দিন আগে একটা কেস নিয়ে আমার কাছে

এসেছিলো।"

"আপনে ওর কেসটা নেন নাই?"

"না। সেটা আমার পক্ষে সম্ভবও ছিলো না।"

"সম্ভব ছিলো না ক্যান?"

ব্যারিস্টার রুহিন একটু চুপ মেরে থাকলো।

অ্যাসিসটেন্ট ছেলেটা চা দিয়ে গেলো এ সময়।

নিজের কাপে চুমুক দিলো কেএসকে। "আমি চা খাইতে থাকি আর আপনে বলতে থাকেন।"

মুচকি হেসে মাথা নেড়ে সায় দিলো রুহিন। "ঘটনা আসলে চার বছর আগে। আমি তখন লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারি শেষ করে ঢাকায় এসে প্র্যাকটিস শুরু করেছি..."

অধ্যায় ১১

নিজের অফিসে বসে আছে ব্যারিস্টার রুহিন মালিক। ক্রিস্টালের পেপারওয়েটটা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখছে। বেলজিয়ামের তৈরি এই জিনিসটা লন্ডনের এক সুপারমল থেকে কিনেছিলো। তখনই স্বপ্ন দেখছিলো তার একটি জমকালো চেম্বার হবে। মনের মতো করে সাজাবে সেটা। তাতে যেনো সুরুচির বর্হিপ্রকাশ থাকে। তাই হয়েছে। যে-ই তার এই চেম্বারে আসে মুগ্ধ হয়ে দেখে। এটা তার ভালো লাগে কিন্তু প্রবীণ আর প্রতিষ্ঠিত ব্যারিস্টারদের ঈর্ষাকাতর দৃষ্টি তার কাছে একটু বেশিই ভালো লাগে।

তার চেম্বারে খুব বেশি আসবাব নেই, কিন্তু যা আছে সবই ব্র্যান্ডের। আর এমন সব ব্র্যান্ডের যেগুলোর নাম এ দেশের খুব কম মানুষই জানে। কিছু দামি অ্যান্টিকও রয়েছে এখানে। চেয়ার টেবিল আর ডেস্কটা খাঁটি সেগুন কাঠের। ডিজাইন করেছে লন্ডনের এক ডিজাইনার বন্ধু। দেয়াল ঘড়িটার বয়স একশ' বছরের উপরে। এখনও সেটা সচল।

মাত্র দু'সপ্তাহ আগে এই চেম্বারটায় বসা শুরু করেছে। এখনও হাতে তেমন কোনো কেস নেই যে সারাদিন তাকে ব্যস্ত থাকতে হবে। তবে এরইমধ্যে ব্যারিস্টার রুহিন মালিক বেশ নাম করে ফেলেছে। প্রথম দুটি কেসই জিতেছে সে। পরেরটা জিতলে হ্যাট্রিক করবে, কিন্তু তিন নাম্বার কেসটা নিয়ে একটু সংশয়ের মধ্যে পড়ে গেছে। এই মামলায় জেতা বড্ড কঠিন হবে। হার-জিতের সম্ভাবনা ফিফটি-ফিফটি। এই ফিফটি-ফিফটি অবস্থা তার একদম পছন্দ নয়। এটা অনেকটা জুয়া খেলার মতো ব্যাপার হয়ে যায়। আর নিজের পেশায় জুয়া খেলতে বড্ড অনীহা। তার চাই আরেকটু নিশ্চয়তা। সে জানে, চেষ্টা করলে এই কেসটাও জিততে পারবে। তবে সেজন্যে একটু বাঁকাপথ অবলম্বন করতে হবে তাকে। এই ব্যাপারটা

নিয়েই একটু দোটানার মধ্যে পড়ে গেছে।

"স্যার," দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললো তার অফিস অ্যাসিসটেন্ট ছেলেটা, "একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।"

তরুণ ব্যারিস্টারের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। তার সঙ্গে দেখা করতে আসা মানে নতুন কোনো ক্লায়েন্ট। নতুন কোনো কেস। "ভেতরে পাঠিয়ে দাও।"

একটু পরই যে ভদ্রলোক তার চেম্বারে ঢুকলো তাকে দেখে আশাহত হলো রুহিন। মাথার চুল এলোমেলো। পরনের জামাকাপড়ও অগোছালো। এমনকি পায়ের জুতোয় কাদামাটি লেগে আছে। এমন লোকজনকে কবি-সাহিত্যিক আর কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবেই বেশি মানায়; লাখ টাকা দামের ব্যারিস্টারের ক্লায়েন্ট হিসেবে নয়।

ভদ্রলোক সালাম দিয়ে চুপচাপ বসে পড়লো ডেস্কের সামনে একটা চেয়ারে। চেহারা-সুরত একেবারেই বিষন্ন। মুখে খোচা খোচা দাড়ি।

"আমার নাম মাহবুব আনাম চৌধুরি," মলিন কণ্ঠে বললো সে। "আনাম প্রোপার্টিজ নামের একটি রিয়েলে এস্টেটের ব্যবসা আছে আমার।"

কথাটা ব্যারিস্টার রুহিন মালিকের বিশ্বাস করতেও কষ্ট হলো। আনাম প্রোপার্টিজের মালিকের এমন হাল! নাকি চাপা মারছে এই লোক?

"নাইস টু মিট ইউ, মিঃ চৌধুরি," হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো রুহিন।

মাহবুব সাহেব করমর্দন করলো। "শায়লা হত্যার খবরটা পত্রপত্রিকায় নিশ্চয় পড়েছেন?...আমি তার হাজবেন্ড।"

শায়লা! এই মার্ডার কেস সম্পর্কে বর্তমানে রুহিন মালিকের চেয়ে বেশি আর কে জানে! মনে মনে পুলকিত বোধ করলো সে। মেঘ না চাইতে জল! সে ঘুণাক্ষরেও এটা আশা করে নি। তারপরও মাথা নেড়ে শুধু সায় দিলো, মুখে কিছু বললো না।

"আমি চাই আপনি আমার ওয়াইফের মার্ডার কেসটা লড়বেন। ঐ হারামজাদা খুনিকে ফাঁসির দড়িতে ঝোলাবেন। এরজন্য যতো টাকা লাগে আমি আপনাকে দেবো।"

রুহিন ভদ্রলোককে ভালো করে দেখে নিলো। "আপনার কেসটা তো

বেশ আলোচিত...পত্রপত্রিকায় ফলাও করে প্রচার হয়েছে। যতোদূর জানি আপনি নিজেই ঐ কেসের একমাত্র আই-উইটনেস?"

"হ্যা। ঠিক বলেছেন। আমি নিজে ঐ বদমাশটাকে খুন করতে দেখেছি," উত্তেজিত স্বরে বললো মাহবুব সাহেব।

"আপনি নিজের চোখে দেখেছেন?"

"হ্যা!"

"কিন্তু পত্রিকায় তো দেখলাম, আপনি বলেছেন খুনিকে আপনার ফ্ল্যাট থেকে বের হতে দেখেছেন শুধু..."

"হ্যা, সেটাই!" জোর দিয়ে বললো সে। "আমি আমার ফ্ল্যাটে ঢুকতেই ওই বানচোতটা দৌড়ে পালিয়ে যায়।"

"আচ্ছা," একটু ভেবে নিলো রুহিন। "আপনি যাকে আসামী করেছেন সেই লোক আপনার পাশের ফ্ল্যাটেরই বাসিন্দা, তাই না?"

"হ্যা। বদমাশটা আমার পাশের ফ্ল্যাটেই থাকে।"

"এমন কি হতে পারে না, যাকে দেখেছেন সে আসলে আপনার স্ত্রীর লাশটা প্রথম আবিষ্কার করেছে...তারপর যখন বুঝতে পারে কেউ রুমে ঢুকছে তখন ভয় পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়?" রুহিন মালিক কথাটা বলে স্থিরচোখে চেয়ে থাকলো। "ভদ্রলোক হয়তো অন্ধকারে বুঝতে পারে নি ওটা আসলে আপনি ছিলেন?"

মাহবুব সাহেব ছটফট করতে লাগলো কথাটা শুনে। যেনো কোনোমতেই এ কথার সাথে একমত হতে পারছে না। "না! অসম্ভব!" রাগে ফেঁটে পড়লো সে। "ওই-ই খুনটা করেছে। আমি জানি!"

"আপনি এতোটা নিশ্চিত হলেন কী করে?" বেশ শান্ত কণ্ঠে বললো ব্যারিস্টার।

অস্থির হয়ে উঠলো মাহবুব। "অনেক আগে থেকেই আমার সুন্দরী স্ত্রীর উপর ঐ বদমাশটার নজর পড়েছিলো...তক্কে তক্কে ছিলো এতোদিন...সুযোগ বুঝে..." আর বলতে পারলো না।

"আহ্, শান্ত হোন। এতোটা অস্থির হবার কোনো দরকার নেই," ডেস্কের নীচে বেল টিপে আবার বললো, "একটু চা কিংবা কফি খান, ভালো লাগবে।"

মাথা দোলাতে লাগলো মাহবুব। "আপনি জানেন না, ঐ রফিক কুত্তারবাচ্চা কতো বড় হারামি!"

"স্যার?" অফিস সহকারী দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললো।

রুহিন ছেলেটার দিকে তাকিয়ে মাহবুব সাহেবের দিকে ফিরলো, "চা না কফি?"

"চা," একান্ত অনিচ্ছায় বললো সে। তাকে এখন বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে।

"দু'কাপ চা।"

সহকারী ছেলেটা চলে গেলো।

"আপনার স্ত্রীর সাথে কি রফিক সাহেবের কোনো সম্পর্ক ছিলো?"

ব্যারিস্টারের এ কথা শুনে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো মাহবুব আনাম চৌধুরি।

"সম্পর্ক মানে কথাবার্তা হতো কিনা। পাশাপাশি ফ্ল্যাটেই তো থাকতো...সুতরাং এটা হতেই পারে, কী বলেন?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ভদ্রলোক। "হ্যা, একটু আধটু কথাবার্তা তো হতোই।"

আস্তে ক'রে বললো রুহিন মালিক, "এ নিয়ে আপনি কি কখনও আপনার স্ত্রীকে সন্দেহ করতেন?"

অবিশ্বাস্য চোখে চেয়ে রইলো মাহবুব। "না!" উদভ্রান্তের মতো মাথা ঝাঁকালো সে। "কক্ষনও না!"

এমন সময় সহকারী এসে দু'জনের জন্য দু'কাপ চা দিয়ে গেলো। তার চেম্বারে বিশাল দুটি ফ্লাস্কে চা-কফি বানানোই থাকে। বলা মাত্রই সেখান থেকে কাপে করে পরিবেশন করা হয়।

"চা নিন," নিজের কাপটা তুলে নিয়ে বললো রুহিন। "মনে কিছু করবেন না। ডাক্তার আর আইনজীবিদের কাছে কোনো কিছু লুকাতে নেই। আমি শুধু পুরো ব্যাপারটা পরিস্কার হতে চাইছি।"

চোখ বন্ধ করে মাথা নেড়ে সায় দিলো ভদ্রলোক।

"আপনার সাথে আপনার স্ত্রীর বয়সের ডিফারেন্সটা বোধহয় একটু বেশি ছিলো, তাই না?"

চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে থেমে গেলো মাহবুব সাহেব। "আপনি

জানলেন কিভাবে?"

"পত্রিকায় পড়েছি।"

"ও," মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। "আমার লেট ম্যারেজ। ব্যবসা নিয়ে এতোটা ব্যস্ত ছিলাম যে একটু দেরি হয়ে গেছিলো। তবে বিয়েটা কিন্তু সেটেল্‌ড ম্যারেজ ছিলো না..."

চায়ে চুমুক দিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো রুহিন।

"বিয়ের আগে ও আমার অফিসেই কাজ করতো," মাহবুবও নিজের কাপে চুমুক দিলো এবার।

"আচ্ছা, আপনাদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং তাহলে ভালোই ছিলো?"

"জি। যদিও শায়লা আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোটো ছিলো কিন্তু সেটা আমাদের সম্পর্কের বেলায় কোনো সমস্যা তৈরি করে নি।"

"আপনার সাথে রফিক সাহেবের কেমন সম্পর্ক ছিলো?" প্রশ্নটা করেই স্থিরচোখে চেয়ে রইলো রুহিন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখলো মাহবুব আনাম। "ভালো না।" ছোট্ট ক'রে বললো সে।

একটু সামনে ঝুঁকে এলো ব্যারিস্টার। "আপনাদের মধ্যে কোনো সমস্যা হয়েছিলো?"

মাহবুবের মধ্য এক ধরণের অস্বস্তি দেখা গেলো এ সময়। "তেমন কিছু না। একদিন বাসায় ফিরে দেখি রফিক আমার ড্রইংরুমে বসে চা খাচ্ছে...আমার স্ত্রীর সাথে গল্প করছে..."

আগ্রহী হয়ে উঠলো রুহিন। "তারপর?"

"আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। বলতে পারেন রেগে গিয়েছিলাম কিছুটা। কারণ রফিকের সাথে আমাদের তেমন কোনো সখ্যতা ছিলো না। দেখা হলে হাই-হ্যালো হতো, কুশল বিনিময় হতো...এই যা।"

"আপনি কি তখন উনার সাথে দুর্ব্যবহার করেছিলেন?"

মাথা দোলালো মাহবুব সাহেব। "না। রেগে গেলেও আমি কিছু করি নি। পরে যখন শায়লা জানালো বদমাশটা যেচে এসে চা খেতে চেয়েছিলো তখন তাকে বলে দেই, এরকম ঘটনা যেনো আর না ঘটে। ঐ লোকের চরিত্র ভালো না।"

"রফিক সাহেবের চরিত্র ভালো না?"

"আপনি হয়তো জানেন না, তার স্ত্রী এজন্য তাকে ছেড়ে চলে গেছে," বললো মাহবুব আনাম চৌধুরি।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে মুচকি হাসলো রুহিন।

"শুনেছি, লোকটার নাকি নারী সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রবলেম আছে। অ্যাপার্টমেন্টে বাজে মেয়েমানুষও নিয়ে আসতো। এ নিয়ে অ্যালোটিরা তাকে সাবধানও করে দিয়েছিলো কয়েকবার।"

"আচ্ছা," বললো ব্যারিস্টার। "ঐ ঘটনার পর থেকে রফিক সাহেবের সাথে আপনার সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়?"

"না। ঠিক তা নয়।"

"তাহলে?"

"আমি বদমাশটাকে দেখলে আর কথা বলতাম না। এড়িয়ে যেতাম।"

"হুম," ভদ্রলোককে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলো রুহিন। "ঐ দিন, মানে যেদিন আপনার স্ত্রী খুন হয়...সেদিনের কথা একটু বলেন।"

দু'চোখ বন্ধ করে ফেললো মাহবুব সাহেব। নিজেকে গুছিয়ে নিলো যেনো। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে শুরু করলো, "অফিস থেকে সব সময়ই দেরি করে বাসায় ফিরি। আমার আবার ক্লাবে যাওয়ার অভ্যেস আছে–"

"আপনি কোন ক্লাবের মেম্বার?" কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললো রুহিন।

"উত্তরা।"

মনে মনে হাসলো ব্যারিস্টার। নব্যধনীরা জাতে ওঠার চেষ্টা করছে। ঢাকা ক্লাবে যারা পাত্তা পাবে না মনে করে তারা গুলশান-উত্তরা ক্লাব বানিয়েছে। "হ্যা, বলুন।"

"প্রায় প্রতিদিনই ক্লাবে গিয়ে একটু ড্রিঙ্ক করি, কার্ড খেলি," থেমে একটু ঢোক গিলে নিলো এবার। "ঐ দিন ক্লাবে গিয়ে সামান্য একটু ড্রিঙ্ক করেই বাড়ি ফিরে আসি। শরীরটা ভালো লাগছিলো না। ম্যাজ ম্যাজ করছিলো। বাসায় এসে কলিংবেল টিপেও কোনো সাড়া শব্দ পাই না..."

রুহিন মালিক একদৃষ্টিতে চেয়ে ছিলো মাহবুব চৌধুরির দিকে, এ

পর্যায়ে এসে একটু বাধা দিলো। "আপনার স্ত্রী কি ফ্ল্যাটে একাই থাকতেন?"

মাথা দোলালো ভদ্রলোক। "আমার স্ত্রীর এক ফুফাতো বোন থাকতো। ঢাকার এক কলেজে পড়তো সে। ওই দিন মেয়েটা বাসায় ছিলো না। দেশের বাড়িতে গেছিলো কয়েক দিনের জন্য–"

"কাজের লোকজন ছিলো না?" আবারো কথার মাঝখানে বাধা দিলো ব্যারিস্টার।

"আমরা পার্মানেন্ট কোনো কাজের লোক বাসায় রাখতাম না। তবে ছুটা বুয়া এসে কিছু কাজ করে যেতো।"

"হ্যা, তারপর?" বললো রুহিন মালিক।

"তো কয়েকবার বেল টিপেও কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে ভাবি শায়লা হয়তো ঘুমাচ্ছে। পকেট থেকে চাবি বের করে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেছি মাত্র, বাতি জ্বালানোরও সময় পাই নি, অমনি অন্ধকার থেকে একজন দৌড়ে এসে আমাকে ধাক্কা মেরে দরজা দিয়ে বাইরে চলে যায়। আমি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে সিঁড়ির কাছে ছুটে যাই। দেখতে পাই পাশের ফ্ল্যাটের রফিক সাহেব সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। একেবারে হতভম্ব হয়ে যাই আমি..." একটু থেমে গেলো মাহবুব। "একটু পানি খাবো, গলা শুকিয়ে গেছে।"

"ও, শিওর," বলেই ডেস্কের উপর রাখা জগ থেকে এক গ্লাস পানি ঢেলে দিলো সে।

এক ঢোকে অনেকটুকু পানি খেয়ে নিলো সদ্য স্ত্রী হারানো লোকটি। "মিথ্যে বলবো না, প্রথমে কয়েক মুহূর্তের জন্য আমি অন্য কিছু ভেবেছিলাম..."

"অন্য কিছু মানে?"

কথাটা বলতে যেনো সংকোচ বোধ করছে সে। "মানে, ভেবেছিলাম আমার স্ত্রীর সাথে হয়তো...মানে রফিক হারামজাদা হয়তো আমার অ্যাবসেন্সে...শায়লার সাথে...বুঝতেই তো পারছেন। স্ত্রীর সাথে আমার বয়সের অনেক ডিফারেন্স। একটু আনসিকিউর ফিল করতাম..."

"বুঝতে পেরেছি," বললো ব্যারিস্টার। "বলে যান। এরপর কি হলো?"

জাল

"ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালাই। ড্রইংরুমে কাউকে না দেখে শায়লাকে ডাকি। কোনো সাড়াশব্দ নেই। বেডরুমে ঢুকতেই দেখি..." নিজে থেকেই থেমে গেলো মাহবুব চৌধুরি। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে। "আমার শায়লা মরে পড়ে আছে! বদমাশটা তাকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে!"

ভদ্রলোক আর কিছু বলতে পারলো না। কান্নায় ভেঙে পড়লো।

ব্যারিস্টার রুহিন টিসুপেপারের বক্স থেকে কয়েকটা টিসুপেপার নিয়ে বাড়িয়ে দিলো মাহবুব সাহেবের দিকে। কয়েক মুহূর্ত দু'জনের কেউ কোনো কথা বললো না।

"বাকিটা তো পত্রিকায় দেখেছেনই..." অবশেষে বললো আনাম প্রোপার্টিজের মালিক।

"সো স্যাড," আস্তে করে বললো রুহিন মালিক। "আপনাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার জানা নেই।"

"আমি কোনো সান্ত্বনা চাইও না," চোখের জল মুছে বললো মাহবুব। "আমি চাই নায্য বিচার।"

"অবশ্যই। সবারই নায্য বিচার চাওয়ার অধিকার আছে।"

"এখন বাকি কাজটুকু আপনি করবেন। ঐ শূয়োরেরবাচ্চাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে হবে!"

"কিন্তু মিঃ চৌধুরি, আমার তো একটা প্রবলেম আছে," তরুণ ব্যারিস্টার ইতস্তত করে বললো।

"কি প্রবলেম?"

"আপনার এই কেসটা আমার পক্ষে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না।"

"কেন?" অবিশ্বাস্যের সাথে বললো মাহবুব। "আমি আপনাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবো। দরকার হলে আপনি যা নেন তার দ্বিগুন দেবো..."

"সমস্যাটা পারিশ্রমিক নিয়ে নয়।"

"তাহলে?" চট করে বললো মাহবুব চৌধুরি।

"কী বলবো," একটু দ্বিধার সাথে বললো ব্যারিস্টার। "আসলে আপনার এই কেসের যিনি আসামী সে আমার বাল্যবন্ধু হয়।"

হতবাক হয়ে চেয়ে থাকলো মাহবুব। "রফিক আপনার বন্ধু!?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো রুহিন মালিক। "আমরা একসাথে স্কুলে পড়েছি।"

হতাশায় দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললো মাহবুব আনাম চৌধুরি।

"আই অ্যাম সরি, মিঃ চৌধুরি।"

কথাটা এখনও হজম করতে পারে নি সে। দু'পাশে মাথা দোলাতে লাগলো। "আপনার বন্ধু বলে আপনি এই কেসটা নেবেন না!"

"ঠিক তা নয়..."

"তাহলে?"

তরুণ ব্যারিস্টার সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে বলে ফেললো, "গতকাল রফিকের এক মামা এসেছিলো আমার চেম্বারে।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো ভদ্রলোক।

"আমি রফিকের কেসটা অলরেডি নিয়ে নিয়েছি।"

"কি!?" বিস্ময়ে ফেঁটে পড়লো মাহবুব। "আপনি ঐ বদমাশ, ধর্ষণকারী খুনিটার..." আর বলতে পারলো না।

"একজন পেশাদার আইনজীবি হিসেবে আমি তো কাউকে ফিরিয়ে দিতে পারি না। তাছাড়া ও আমার পুরনো বন্ধু, ব্যাপারটা আপনাকে বুঝতে হবে।"

"তাই বলে রফিকের মতো একজনের হয়ে আপনি মামলা লড়বেন?" উদভ্রান্তের মতো মাথা দোলাতে লাগলো মাহবুব সাহেব।

"রফিক অপরাধ করেছে কিনা সেটা তো এখনও আদালতে প্রমাণ হয় নি..."

"আমি নিজের চোখে দেখেছি! এরচেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে?"

"আপনার তো ভুলও হতে পারে, তাই না?"

ব্যারিস্টারের ডেস্কে একটা কিল বসিয়ে দিলো মাহবুব। "আমার কেন ভুল হবে?"

"আহ্, আপনি বুঝতে পারছেন না।"

"আমি ঠিকই বুঝতে পারছি। আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না!"

ব্যারিস্টার রুহিন চুপ মেরে গেলো। "ব্যাপারটা বিশ্বাস অবিশ্বাসের

নয়, মিঃ চৌধুরি ।"

"তাহলে সেটা কি?"

"এটা হলো প্রফেশনাল ইন্টেগরিটির ব্যাপার–"

"ইন্টেগরিটি!" ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো মাহবুব । "আপনি আমাকে নীতি কথা শোনাচ্ছেন?"

"আহ্, বোঝার চেষ্টা করুন । আমি অলরেডি রফিকের কেসটা হাতে নিয়ে নিয়েছি ।"

"তাহলে এতোক্ষণ আমার কাছ থেকে এসব কথা শুনলেন কেন? শুরুতেই বলে দিতে পারতেন সেটা?"

এ প্রশ্নের জবাব রুহিন মালিকের কাছে নেই । নিজের কেসের ব্যাপারে খুব সহজে কিছু তথ্য জেনে নেবার লোভ সামলাতে পারে নি সে । তাও আবার ঐ কেসের বাদী এবং একমাত্র সাক্ষীর কাছ থেকে!

"তা না করে আপনি কৌশলে আমার কাছ থেকে সব শুনে নিয়েছেন–"

"ব্যাপারটা এভাবে দেখছেন কেন?" দুর্বল কণ্ঠে বললো ব্যারিস্টার ।

"আপনি কি মানুষ না বেশ্যা? ক্লায়েন্ট হলেই হলো? টাকা পেলে খুনির জন্যেও কোর্টে গিয়ে লড়বেন?"

"শান্ত হোন, মিঃ চৌধুরি–"

"শাট আপ!" গর্জে উঠলো মাহবুব । "শাট আপ, ইউ ব্লাডি সোয়াইন! রাস্তার বেশ্যার চেয়েও তুই খারাপ!"

আক্ষেপে মাথা দোলালো ব্যারিস্টার রুহিন মালিক । আইনজীবি হওয়ার এই এক ঝক্কি । কেউ বোঝে না, বুঝতে চায় না একজন আইনজীবি ক্লায়েন্টের দোষি-নির্দোষিতা নিয়ে মাথা ঘামাবে না । এটা তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না । এ দায়িত্ব বিচারকের । তিনিই নির্ধারণ করবেন কে দোষি আর কে নির্দোষি ।

"প্লিজ, মাইন্ড ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ, অ্যান্ড কুল ডাউন, মিঃ চৌধুরি ।"

"চুপ, খানকিরপোলা!" চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ভদ্রলোক । তার আচরণ এখন মারমুখি । "আমার সাথে ইংরেজি মারাবি না! বেশ্যা কোথাকার!"

রুহিন মালিক আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলো না । সেও উঠে

দাঁড়ালো। "এনাফ ইজ এনাফ! লিভ মাই অফিস অ্যাট ওয়ান্স!" বেশ চেঁচিয়ে বললো কথাটা।

এমন সময় অফিস অ্যাসিসটেন্ট ছেলেটা ঘরে ঢুকে পড়লো। বাইরে থেকে চিল্লাফাল্লা তার কানেও গেছে। "স্যার!" বললো সে।

মাহবুব এক ঝটকায় পেছনে তাকিয়ে অ্যাসিসটেন্ট ছেলেটাকে দেখে নিলো। তারপর রুহিন মালিককে অবাক করে দিয়ে প্রচণ্ড ঘৃণায় এক দলা থুতু ছুঁড়ে মারলো তার দিকে। "তোদের মতো বেশ্যাদের থুতু দিতেও আমার ঘেন্না লাগে!"

কথাটা বলেই ঝট করে চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেলো মাহবুব আনাম চৌধুরি।

দু'চোখ বন্ধ করে একটা গভীর নিঃশ্বাস নিলো ব্যারিস্টার। অ্যাসিসটেন্ট ছেলেটা হতভম্ব হয়ে চেয়ে আছে তার দিকে। চোখ খুলে আস্তে করে টিসুবক্স থেকে একটা টিসু পেপার নিয়ে মুখে আর বুকে লেগে থাকা থুতু পরিস্কার করতে লাগলো।

প্রথমবারের মতো আইনপেশার ঝক্কিটা হাঁড়ে হাঁড়ে টের পেলো ব্যারিস্টার রুহিন মালিক।

অধ্যায় ১২

চা প্রায় শেষ পর্যায়ে। নিজের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা রেখে দিলো কেএসকে।

ব্যারিস্টার রুহিনের দৃষ্টিতে শূণ্যতা। কিছুক্ষণ আগে মাহবুব সাহেবের ঘটনাটি বলার পর গত পরশুদিন কিভাবে তাকে ফাঁদে ফেলে রফিক হত্যায় ফাঁসিয়েছে সে কথাও বলেছে বিস্তারিত। তবে একটা কথা সচতেনভাবেই এড়িয়ে গেছে। রফিকের মামলা লড়তে গিয়ে এমন কিছু পয়েন্ট দাঁড় করিয়েছিলো যে, সেটা তার নিজের কাছেও কিছুটা অনৈতিক বলে মনে হয়েছিলো। কিন্তু নিজের ক্যারিয়ারের ব্যাপারে এতোটাই মোহগ্রস্ত ছিলো, মামলাটা জেতার ব্যাপারে এতোটাই মরিয়া ছিলো, এসব নীতি-নৈতিকতার ধার ধারে নি তখন।

আদালতে সে প্রমাণ করে ছাড়ে ঐদিন মাহবুব সাহেবের ফ্ল্যাটে একটি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছিলো। ডাকাতরাই তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করার পর খুন করে। পাশের ফ্ল্যাটের রফিক সাহেব ঘটনার পর পরই নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে আসার সময় মাহবুব সাহেবের ফ্ল্যাটের দরজা খোলা দেখে অবাক হয়। কৌতুহলী হয়ে অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে গিয়ে দেখতে পায় মিসেস মাহবুবের লাশ পড়ে আছে। দৃশ্যটা দেখে যারপরনাই ঘাবড়ে যায় সে। ভয়ে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হবার সময় মুখোমুখি হয় মাহবুব সাহেবের। কিন্তু অন্ধকারে তাকে চিনতে পারে না। বরং মনে করে ডাকাত দলের কেউ হবে বুঝি। নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য আগন্তুককে ধাক্কা মেরে দৌড়ে বেরিয়ে যায় সে। পরে জানতে পারে ওটা মাহবুব সাহেব ছিলো।

নিজের ক্লায়েন্ট-বন্ধু রফিককে বাঁচাতে আরো কিছু কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলো সে। আদালতে বিজ্ঞ বিচারকের কাছে এমন একটি চিত্র তুলে ধরে যে, সবাই মনে করতে থাকে নিতান্তই ভুলবোঝাবুঝি আর পূর্বধারণার জের ধরে মাহবুব সাহেব তার প্রতিবেশি রফিক সাহেবকে এই মামলায়

অভিযুক্ত করেছে।

বয়সের বিরাট পার্থক্যের কারণে মাহবুব সাহেবের সাথে তার স্ত্রীর আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো ছিলো না; পাশের ফ্ল্যাটের সুদর্শন আর অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সী রফিক সাহেবের সাথে স্ত্রীর মেলামেশাটা ভদ্রলোক ভালো চোখে দেখতো না; এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়শই বাকবিতণ্ডা হতো; রফিক সাহেবের সাথে কথা না বলা, যোগাযোগ না রাখার জন্য অনেকবার শাসিয়েছিলো স্ত্রীকে; মাহবুব সাহেব অফিস থেকে মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরতো; খুনের পর পর রফিক সাহেবকে নিজের ফ্ল্যাট থেকে দৌড়ে বেরিয়ে যেতে দেখে মাহবুব সাহেব ধরে নেয় তার স্ত্রীকে সে-ই খুন করেছে; এক্ষেত্রে ঘটনাচক্রও অনেকটা দায়ি।

মামলা চলাকালীন এসব যুক্তিতর্ক দিয়ে যখন নিজের ক্লায়েন্টকে রক্ষা করার চেষ্টা করছিলো সে তখন মাহবুব সাহেব স্থিরচোখে চেয়ে ছিলো তার দিকে। তার সেই চোখে অবিশ্বাস আর ক্রোধ দেখতে পেয়েছিলো রুহিন মালিক। হয়তো সেই চোখের পেছনে প্রতিশোধের সুতীব্র আগুনের আঁচটাও টের পেয়েছিলো।

যেদিন মামলার রায় হলো, আসামী রফিক হাওলাদার বেকসুর খালাস পেয়ে গেলো হত্যা মামলা থেকে, ঠিক সে সময় মাহবুব সাহেবের আচরণে কিছুটা অবাক হয়েছিলো রুহিন। ভদ্রলোক কেমন জানি চুপসে গেছিলো। একদম ধীরস্থির আর শান্ত ছিলো পুরোটা সময় জুড়ে। আদালত থেকে বের হয়ে যাবার সময় রুহিন মালিকের সাথে মাহবুব সাহেবের চোখাচোখি হয়েছিলো কয়েক মুহূর্তের জন্য। সেই চোখে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হওয়া মানুষের যন্ত্রণা দেখেছিলো সে। আরো দেখেছিলো, দুর্বোধ্য আর বাঁকা হাসি।

এটা সত্য, মামলা শেষ হবার পর বেশ কয়েকদিন রুহিন মালিক ভয়ে ভয়ে ছিলো। মাহবুব সাহেব হয়তো তার কোনো ক্ষতি করতে পারে। আশংকা এতোটাই বেড়ে গিয়েছিলো যে, থানায় গিয়ে মাহবুব সাহেবের বিরুদ্ধে একটা জিডি করার সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেছিলো। কিন্তু মাহবুবের দিক থেকে কোনো সাড়াশব্দ না পাওয়াতে সেটা বাতিল করে দেয়। একজন আইনজীবি হিসেবে একেবারে বিনা কারণে, বিনা উস্কানিতে কারো বিরুদ্ধে জিডি করাটা অশোভন দেখায়। তবে জিডি না করলেও রুহিন মালিক অন্য

একটা কাজ করে–দ্রুত লাইসেন্স করিয়ে নেয় আগ্নেয়াস্ত্রের। সেই থেকে সব সময় সঙ্গে একটা পিস্তল রাখে সে।

অনেকটা উদাস হয়ে এসব কথাই ভেবে যাচ্ছিলো ব্যারিস্টার। তার ভাবনায় ছেদ ঘটালো কেএসকের তিন তিনটি শুকনো কাশি।

এতোক্ষণ ধরে চুপচাপ শুনে গেছে ভদ্রলোক। শ্রোতা হিসেবে বরাবরই সে অসাধারণ। একেবারে জরুরি কোনো পয়েন্ট ছাড়া কথার মাঝখানে বাধা দেয় না। আজও তাই করেছে।

"সব শুনে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন এই কেসে আমি ভালোমতোই ফেঁসে গেছি," বললো রুহিন মালিক।

আবারো একটু কেশে নিলো কেএস খান। "হুম। একটা ক্যারাব্যারার মইধ্যে পইড়া গেছেন। আই উইটনেস আপনের অ্যাগেইনস্টে আছে। তারচায়াও বড় কথা, ব্যালেস্টিক ফরেনসিক টেস্টও আপনের বিপক্ষে যাইবো।" একটু চুপ থেকে আবার বললো সে, "খালি একটা জায়গা এখনও ফাঁক আছে, ওইটা যদি আপনেরে কিছুটা অ্যাডভান্টেজ দিবার পারে।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো ব্যারিস্টার।

"মাইনে, রফিক সাহেবের সাথে আপনের কোনো ঝামেলা ছিলো না। আপনেরা বন্ধু ছিলেন। আপনাগো মইধ্যে কোনো ঝগড়াঝাটি হয় নাই। উনারে খুন করার ব্যাপারে আপনের কোনো মোটিভ থাকবার কথা না।"

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো রুহিন মালিকের ভেতর থেকে। ব্যাপারটা কেএসকের তীক্ষ্ণ চোখেও ধরা পড়লো।

"নাকি উনার সাথেও আপনার ঝামেলা ছিলো?"

"সত্যি বলতে কি, মামলায় জেতার পর আমার কেন জানি মনে হতে থাকে খুনটা আসলে রফিকই করেছে। আমি এটা আপনাকে বোঝাতে পারবো না। তবে আমার বিশ্বাস হতে শুরু করে রফিকই ক্রিমিনাল।"

"আচ্ছা।" আর কিছু বললো না সাবেক ইনভেস্টিগেটর।

"এরপর থেকে আমি সচেতনভাবেই রফিককে এড়িয়ে চলতে শুরু করি।"

মুচকি হাসলো কেএসকে। "কাউরে এড়ায়া যাওয়াটা ঝগড়াঝাটির মইধ্যে পড়ে না, মিঃ মালিক।"

"তা ঠিক," একটু চুপ থেকে ভেবে নিলো সে। সিদ্ধান্ত নিলো সাবেক ইনভেস্টিগেটর ভদ্রলোকের কাছে খুব বেশি কিছু লুকাবে না। "গত বছর রফিক আমার কাছে আরেকটা কেস নিয়ে এসেছিলো..."

কেএসকের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো সে খুব আগ্রহী হয়ে উঠেছে। "ধর্ষণের কেস?"

রুহিন মালিক অবাক হলো কথাটা শুনে। "হুম।" ছোট্ট করে বললো সে।

মাথা নেড়ে সায় দিলো মিঃ খান। "ধর্ষকদের একটা ব্যাপার কি জানেন?" উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই বলতে লাগলো, "ওরা আবার ধর্ষণের চেষ্টা করবোই। ওইটা ওগো হ্যাবিট হইয়া যায়। কইতে পারেন, এইদিক থেইকা ধর্ষণকারীরা সিরিয়াল কিলারদের মতোনই। ক্রাইমের রিপিটিশন করে আর কি।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ব্যারিস্টার। "কাজের মেয়ে ধর্ষণের কেস ছিলো ওটা," একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, "আমি ওই কেসটা নেই নি। এ নিয়ে আমার সাথে তুমুল বাকবিতণ্ডা হয়। ব্যাপারটা হাতাহাতির পর্যায়েও চলে যায়।"

"তাই নাকি," আপন মনে বললো কেএসকে।

"তারপর থেকে রফিকের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক ছিলো না।"

"তাইলে তো এইখানেও আপনে কোনো সুবিধা পাইতাছেন না। ভিক্টিমের সাথে আপনার ঝগড়াঝাটির হিস্ট্রি আছে।"

ব্যারিস্টার রুহিন চুপ মেরে থাকলো। ডাক্তার আর আইনজীবির কাছে কোনো কিছু লুকাতে হয় না–নিজে একজন আইনজীবি হয়েও এই আপ্তবাক্যটি পুরোপুরি মানে নি সে।

রফিকের দ্বিতীয় কেসটি না নেয়ার কারণে তাদের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হলেও এরপরে আরো একটি ঘটনা ঘটে। লম্পট রফিক বন্ধুর উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য ব্যারিস্টারের বান্ধবীদের মধ্যে একটা ঝামেলা তৈরি করে ফেলে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু হবার সুবাদে সে ভালো করেই জানতো রুহিনের সাথে কার কি রকম সম্পর্ক রয়েছে। এটাকেই সে ব্যবহার করে। রুহিনের বেশ কয়েকজন বিবাহিত বান্ধবীর স্বামীদের কাছে তাদের স্ত্রীদের পরকীয়া সম্পর্কের কথা রটিয়ে দেয়।

এরফলে ব্যারিস্টারকে অনেক ঝামেলা সহ্য করতে হয়েছিলো, যদিও শেষ পর্যন্ত বড় কোনো ঘটনাই ঘটে নি।

এখন সব কিছু বলার সময় এ ঘটনাটি ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেলো সে।

"আমি জানি কেসটা অনেক বেশি জটিল। অদৃশ্য এক জালে আটকা পড়ে গেছি আমি," দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো সে। "এখন এই জাল থেকে আমাকে মুক্ত করার কাজে সাহায্য করতে হবে আপনাকে। আমি জানি আপনি এটা করতে পারবেন।"

চুপ মেরে থাকলো কেএসকে। "হুম," অনেকক্ষণ পর বললো। "আপনার কথা যদি সত্যি হইয়া থাকে, তাইলে কইতে হইবো, মাহবুব সাহেব একটা অ্যালিবাই ব্যবহার করছে। কঠিন অ্যালিবাই। যতোটুকু জানবার পারছি, ঐদিন তার অ্যাপেনডিক্সে অপারেশন হইছে।" একটু চুপ থেকে বললো সাবেক ইনভেস্টিগেটর, "অপারেশনটা সত্যি সত্যি হইছে কিনা সেইটা দেখতে হইবো সবার আগে।"

"আমি শিওর, অপারেশনটা ফেইক ছিলো...এটা কোনোভাবেই হতে পারে না। আমি নিজের চোখে দেখেছি তাকে।"

কেএসকে মুচকি হাসলো। "খালি আপনে দেখছেন, আর কেউ তো দেখে নাই।"

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো ব্যারিস্টার। আইনের লোক হিসেবে সেও জানে এর অর্থ কি। আসামী নিজে সাক্ষী হলে খুব একটা সুবিধা পাওয়া যায় না, আর যদি সে হয় একমাত্র সাক্ষী তাহলে...

"কঠিন একটা কেস।"

সাবেক ইনভেস্টিগেটরের কথায় নিষ্পলক চেয়ে রইলো রুহিন। সেও জানে কেসটা কঠিন। তবে তার সামনে বসা লোকটি এই কঠিন কাজ করতে পারবে বলে তার বিশ্বাস। সমগ্র পুলিশ বিভাগে এরচেয়ে ভালো কোনো মাথা নেই। মানে তখনও ছিলো না, এখনও নেই।

আচমকা উঠে দাঁড়ালো কেএসকে।

অবাক হলো ব্যারিস্টার। "চলে যাচ্ছেন?"

"হ," হাতঘড়িটা দেখলো। "একটু পর আমার ক্লাশ, তারপর যাইতে হইবো ডাক্তারের কাছে। হের লগে একটু কথা বলা দরকার।"

"ক্লাশ?" অবাক হলো ব্যারিস্টার।

"তরুণ ইনভেস্টিগেটরদের আমি ট্রেনিং দিবার কাজ করি," হেসে বললো অসুস্থ লোকটি।

"ও," ব্যারিস্টারও উঠে দাঁড়ালো। "এটা তো জানতাম না।"

"বেশিদিন হয় নাই শুরু করছি। তেমন কিছু না, ক্রিমিনোলজি পড়াই আর কি। ঠিক আছে, এখন আমি যাই। ডাক্তারের লগে কি কথা হইলো আপনেরে জানামু নি।"

ব্যারিস্টার বুঝলো না। ভদ্রলোক ডাক্তারের কাছে যাবে চিকিৎসা নিতে, ভালো কথা কিন্তু এটা তাকে বলার কী দরকার। মুখে অবশ্য কিছু বললো না।

"কেসটা খুব জটিল, একটু টাইম কিন্তু লাগবো।"

"শিওর। টেক ইউর টাইম, মিঃ খান।"

"আপনে একটু ফ্রি থাইকেন। আমি যখন তখন কল দিবার পারি।"

"ওকে। নো প্রবলেম। আমার নিজের কেসটা ছাড়া এ মুহূর্তে আর কিছুই ভাবছি না।"

"গুড।"

"বাই দ্য ওয়ে, আপনার ফোন নাম্বারটা কি চালু আছে?"

"সন্ধ্যার মইধ্যে চালু হয়া যাইবো মনে করতাছি।"

"ওকে। দ্যাটস ফাইন। আমাকে যখনই দরকার হবে জনাবেন।"

"আচ্ছা," হেসে বললো কেএসকে। তারপর মুচকি হেসে ঘর থেকে চলে গেলো।

অসুস্থ লোকটার দিকে চেয়ে রইলো ব্যারিস্টার রুহিন মালিক।

অধ্যায় ১৩

ডাক্তার মামুন নিজের অফিসে বসে আছে। আজকে তার ডিউটি বিকেল থেকে। অফিসে আসার পরই দেখে তার রুমে এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক বসে আছে। নিজের পরিচয় দেবার পর থেকেই ডাক্তার মামুন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে তাকে।

কেএস খান, এ নামেই পরিচয় দিয়েছে সে, পুরো নাম অবশ্য বলে নি। মামুনের কাছে কোনোভাবেই মনে হচ্ছে না এই লোক এক সময় ডিবির ইনভেস্টিগেটর ছিলো। অবশ্য এটাও তো ঠিক, সব সময় বাইরেরটা দেখে বোঝাও যায় না। ভদ্রলোকের বয়সও অবসরে চলে যাওয়ার মতো নয় অথচ বলছে ডিবি থেকে নাকি রিটায়ার করেছে।

"আপনি বলছেন আপনি রিটায়ার করেছেন, এই কেসটার তদন্ত করছেন না?" অবশেষে জিজ্ঞেস করলো ডাক্তার।

"হ।" ছোট্ট করে জবাব দিলো কেএস খান।

"তাহলে আমার কাছে কেন এসেছেন?"

"আমি আসলে ব্যারিস্টার রুহিন মালিকের কনসালটেন্ট।"

"কনসালটেন্ট?" অবাক হলো ডাক্তার মামুন। "আজব!"

"ঘটনাটা খুইলা বলি," একটু থেমে আবার বললো কেএসকে, "আপনেরে তো আমি আগেই বলছি, ডিবি থেইকা রিটায়ার করছি। তো, ব্যারিস্টার রুহিন সাহেব আমারে খুব ধরলো তার এই কেসটার ব্যাপারে হেল্প করার জন্য..."

"দাঁড়ান দাঁড়ান," তাকে বাধা দিলো সার্জন। "আপনি কি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর হিসেবে কাজ করছেন?"

"আরে না," হেসে বললো মিঃ খান। "এই দেশে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর বইলা কিছু আছে নি।"

সার্জন মামুন চেয়ে রইলো, কিছু বললো না।

"আসলে ব্যারিস্টার নিজেই তার কেসটা তদন্ত করবো। আমি তার কনসালটেন্ট হিসেবে আছি আর কি।"

ডাক্তার মামুন আল্‌তো করে মাথা নেড়ে সায় দিলো শুধু। তার সামনে বসা ভদ্রলোককে দেখেই মনে হয় অসুস্থ। কথাবার্তাও বলে চলভাষায়। এই লোক ডিবিতে ছিলো সেটা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে। এখন আবার বলছে, এক খুনের মামলার আসামীর কনসালটেন্ট!

"ডিবির এক গোয়েন্দা কিন্তু এই কেসটার ব্যাপারে আমার কাছে এসেছিলো, আমার সাথে কথাও বলে গেছে সে।"

"হ, আমিনুল। আমার স্টুডেন্ট।"

অবাক হলো ডাক্তার। "আপনার স্টুডেন্ট মানে? একটু আগে না বললেন আপনি ডিবি'তে ছিলেন?"

"রিটায়ার করার পর এখন আমি নতুন রিক্রুটদের ক্রিমিনোলজি পড়াই।"

মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলো না মামুন। একটু চুপ থেকে বললো, "ঠিক আছে বলুন, আমি কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?"

"মাহবুব সাহেবের অপারেশনটা তো আপনি নিজেই করছেন, তাই না?"

"হুম।"

"উনি ঠিক কখন অ্যাডমিট হইছিলেন এইখানে?"

"সেটা তো আমি সঠিক বলতে পারবো না। অ্যাডমিনে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে। ডিবির ঐ অফিসার, মানে আপনার স্টুডেন্ট তো ওখান থেকে সব জেনে গেছে।"

"আপনি আনুমানিক সময়টা বলতে পারবেন তো?"

ডা: মামুন একটু ভেবে নিলো। "বিকেলের দিকে হবে। আমি তাকে বিকেলের দিকেই প্রথম চেক করি। অ্যাপেন্ডিক্সটার অবস্থা ভালো ছিলো না। ইমার্জেন্সি অপারেশন করার দরকার ছিলো।"

"উনি কি একাই আসছিলেন?"

"হ্যা।"

একটু ভাবলো কেএসকে। "অপারেশনটা কয়টার দিকে হইছিলো?"

"আমার মনে হয় সন্ধ্যা সাতটার পর হবে...ঠিক সময়টা অবশ্য

হাসপাতালের রেকর্ডে আছে।"

"আচ্ছা," বললো কেএস খান। "অ্যানেস্থিশিয়া দেয়া হইছিলো নিশ্চয়?"

"অবশ্যই। এরকম অপারেশন অ্যানেস্থেশিয়া ছাড়া সম্ভব নয়।"

একটু ভাবলো সাবেক ইনভেস্টিগেটর। "উনার জ্ঞান ফেরে কখন?"

"এতো কিছু তো আমার মনে থাকার কথা নয়। আমি অপারেশন করে সোজা বাসায় চলে গেছি। অ্যানেস্থিশিয়া যিনি করেছেন তিনি ভালো বলতে পারবেন।"

"আপনি কখন বাসায় ফিরা গেলেন?"

প্রশ্নের সারি দীর্ঘ হওয়াতে অস্বস্তিতে পড়ে গেলো ডাক্তার। তার চোখেমুখে বিরক্তি সুস্পষ্ট।

"অপারেশন করেই আমি চলে যাই নিউমার্কেটে। কিছু কেনাকাটা করে বাসায় ফিরি।"

"আপনার বাসা কোথায়?"

মুচকি হেসে ফেললো ডাক্তার মামুন। "এটাও আপনার জানতে হবে?" সঙ্গে সঙ্গেই আবার বলে উঠলো, "মিরপুরে।"

"ও," কেএসকে আর কিছু বললো না।

"আমাদের পেশেন্ট মাহবুব সাহেবের ব্যাপারে এতো খোঁজ খবর কেন নিচ্ছেন জানতে পারি? পত্রিকা আর টিভিতে দেখলাম আপনার ঐ ব্যারিস্টার খুনের দায়ে গ্রেফতার হয়েছে। এর সাথে মাহবুব সাহেবের কি সম্পর্ক?"

"ব্যারিস্টার দাবি করতাছে ঐ খুনটা করছে আপনার পেশেন্ট মাহবুব সাহেব।"

অবাক হলো মামুন। "কিন্তু সেটা কি করে সম্ভব? উনি তো হাসপাতালে ছিলেন!"

মাথা নেড়ে সায় দিলো কেএসকে। "হুম। কেসটা খুব জটিল। কিন্তু ব্যারিস্টার নিশ্চিত, খুনটা মাহবুব সাহেবই করছেন।"

"একজন অ্যাপেনডিক্সের রোগি, যার অপারেশন হয়েছে, সে কিভাবে এটা করবে?"

"সেইটা তো আমারও কথা," কেএসকে সহমত পোষণ করলো।

"আমি জানি না খুনটা ঠিক কখন হয়েছে কিন্তু অপারেশনের পর মাহবুব সাহেব এই হাসপাতাল থেকে আর বের হন নি। বের হবার মতো অবস্থাও তার ছিলো না। পোস্ট অপারেটিভে ছিলেন উনি। হাসপাতালের সবাই এটা জানে।"

"খুনটা সন্ধ্যা সাতটার সময় হইছে," আস্তে করে বললো কেএসকে। চকিতে ডাক্তার মামুনের বাম হাতের দিকে তাকালো সে।

"তাহলে কিভাবে মাহবুব সাহেব ঐ খুন করবেন? ঐ সময় তো উনার অপারেশন চলছে!"

"হুম, ঠিক বলছেন। সেটাই তো সমস্যা।"

"বুঝতে পারছি না ঐ ব্যারিস্টার কেন এরকম কথা বলছে। এটা তো অ্যাবসার্ড মনে হচ্ছে।" একটু থেমে আবার বললো ডাক্তার, "আর কিছু জানতে চান? আমাকে একটু উঠতে হবে।"

কেএসকে উঠে হাত বাড়িয়ে দিলো ডাক্তারের দিকে। "আপনে কি বিবাহিত?" ডাক্তারের হাতটা ধরে হঠাৎ বলে উঠলো সাবেক ইনভেস্টিগেটর।

"কি!" ডাক্তার মামুন একটু বিস্মিতই হলো। ভুরু কুচকে তাকালো কেএসকের দিকে। "না," ছোট্ট করে বললো সে।

"ও," আর কিছু বললো না ডিবির সাবেক কর্মকর্তা। যেনো এমনটাই সে আশা করেছিলো। "আপনারে অনেক ধন্যবাদ।"

কেএসকে চলে যাবার পরও দরজার দিকে তাকিয়ে রইলো ডাক্তার মামুন। *ভদ্রলোক হঠাৎ এ কথা বললো কেন?*

অধ্যায় ১৪

ঘরটা অন্ধকারে ডুবে আছে। ঘুটঘুটে অদ্ভুত এক অন্ধকার। ব্যারিস্টার রুহিন বুঝতে পারছে না কিছুই। একটু আগে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। হঠাৎ জেগে উঠেছে। এখন বিছানার উপর বসে আছে সে। টের পেলো পাশে কেউ নেই!

ববি গেলো কোথায়? এখানেই তো ছিলো!

বিছানার ওপাশটা হাতরালো। না। কেউ নেই। সে একাই ঘুমাচ্ছিলো। কিন্তু এটা তো অসম্ভব। রাত দশটার দিকে ববি এসেছিলো। তারপর চুটিয়ে মদ খেয়েছে তারা। বদ্ধ মাতাল হয়ে একে অন্যেকে নিয়ে বন্য হয়ে উঠেছিলো।

খুট করে একটা শব্দ হলে চেয়ে দেখলো জানালার পর্দাটা বাতাসে উড়ছে। জানালাটা খোলা! কে খুললো? তার এই ঘরে এসি আছে, জানালা বন্ধ করে ঘুমিয়েছে সে। তাহলে?

হঠাৎ কারোর পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলো। যেনো পা টিপে টিপে সতর্কতার সাথে এগিয়ে আসছে তার দিকে।

কে? ব্যারিস্টার রুহিন কথাটা জোরে বলতে গেলেও গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বের হলো না। হুট করে সুতীব্র ভয় জেঁকে বসেছে তার মধ্যে। গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হচ্ছে না। *ববি? ববি!* আপ্রাণ চেষ্টা করলো মেয়েটাকে ডাকতে কিন্তু কেউ তার ডাকে সাড়া দিলো না।

তারপরই ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্যটা দেখতে পেলো।

মস্তিষ্ক বিকৃত মাহবুব সাহেব যেনো অন্ধকার ফুড়ে তার সামনে এসে দাঁড়ালো। লোকটার হাতে পিস্তল। চোখেমুখে জিঘাংসা। অপার্থিব এক অভিব্যক্তি।

"আপনি!" রুহিন যারপরনাই অবাক হলো। নিজের হৃদস্পন্দন শুনতে পাচ্ছে সে।

মাহবুব সাহেব নিঃশব্দে হাসলো। লোকটার অসমান সাদা দাঁতগুলো স্পষ্ট দেখা গেলো অন্ধকারে!

"আপনি এখানে কি চান?" ব্যারিস্টার টের পেলো তার সারা শরীর কাঁপছে।

"একটা খেলা!" ফ্যাসফেসে কণ্ঠে বললো মাহবুব। "জাস্ট একটা খেলা খেলতে চাই!"

"কি-কিসের খেলা?" তোতলালো রুহিন।

"হা-হা-হা!" জান্তব হাসি দিলো মাহবুব। তারপর হঠাৎ করেই থেমে গেলো। তার দু'চোখ দিয়ে যেনো আগুন বের হচ্ছে। "যে খেলাটা তুই আমার সাথে খেলেছিলি!"

ব্যারিস্টার ঢোক গিললো। ভয়ে তার জিভ শুকিয়ে গেছে। কিছু বলতে পারলো না।

"খুব ভালো খেলেছিলি! অসাধারণ!" মাহবুব আরেকটু কাছে এগিয়ে এলো। তার হাতের পিস্তলটা ব্যারিস্টারের কপাল বরাবর তাক্ করলো এবার।

"পি-প্লিজ!" রুহিন শুধু এটুকুই বলতে পারলো।

অমনি অ্যাটাচড বাথরুম থেকে বের হয়ে এলো ববি। তার পরনে উত্তেজক নাইটি। মাহবুবকে অস্ত্র হাতে দেখে সে থমকে দাঁড়ালো কিন্তু চিৎকার দিলো না। মুখে হাতচাপা দিয়ে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলো। তার চোখেমুখে বিস্ময় আর ভীতি মিলেমিশে একাকার।

ববির দিকে ফিরলো অস্ত্রধারী। পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো তাকে। তারপর ফিরলো রুহিনের দিকে। "বাহ্! দারুণ!" তার কণ্ঠটা আরো বেশি ফ্যাসফেসে শোনাচ্ছে এখন। "অন্যের বউকে নিয়ে ফুর্তি করছিস! প্লেবয় ব্যারিস্টার!"

রুহিন খুবই অবাক হলো। *এটা সে জানলো কিভাবে!*

"ও, ভুলে গেছিলাম! তুই তো আবার রফিকের বন্ধু। শালার মাগিবাজ! লুইচ্চা!"

রুহিন চেষ্টা করেও গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের করতে পারলো না। এই লোকটা এখানে ঢুকলো কিভাবে?

"শূয়োরেরবাচ্চা!" বলেই একদলা থুতু ছুঁড়ে দিলো ব্যারিস্টারের

দিকে।

থুতুগুলো মুখে এসে লাগতেই চোখ বন্ধ করে ফেললো সে। তারপরই বিকট শব্দে কেঁপে উঠলো ঘরটা। রুহিন চোখ খুলে দেখতে পেলো ববির শরীরটা ঢলে পড়ে যাচ্ছে।

না! এবারও তার গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হলো না।

বাঁকা হাসি হাসছে অস্ত্রধারী। মাথা দোলাচ্ছে সে। "তোকে আমি এতো সহজে মারবো না। মারলে তো খেলাটাই শেষ হয়ে যাবে!"

ব্যারিস্টার টের পেলো তার বুকে হাতুড়ি পেটা হচ্ছে। সারা শরীর ভয়ঙ্করভাবে কাঁপছে। সে কিছুই করতে পারছে না। অস্ত্রের মুখে জমে গেছে। নড়াচড়ার করার ক্ষমতা নেই।

"কি রে, এই পিস্তলটা চিনতে পেরেছিস?" কথাটা বলেই মাহবুব নিঃশব্দে হেসে ফেললো। "এটাও তোর!" আবারো সেই জান্তব হাসি। তারপর তাকে অবাক করে দিয়ে অন্ধকারে মিশে গেলো মাহবুব।

বাথরুমের দরজার দিকে তাকালো। ববির শরীর থেকে গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে কিন্তু মেয়েটা একদম নড়ছে না।

মরে গেছে!

সমস্ত শক্তি জড়ো করে চিৎকার দিলো রুহিন : "না!"

"অ্যাই, কি হয়েছে?" তার শরীরটা ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিলো ববি। "কি হয়েছে?"

সম্বিত ফিরে পেলো সে। ববি তার পাশে বসে আছে। ঘরটাও এখন তেমন অন্ধকার নেই। মৃদু আলোর মুনলাইট জ্বলছে, অনেকটা চাঁদের আলোর মতো। সেই আলোতে ববির বাদামী শরীরটা কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

"দুঃস্বপ্ন দেখছিলে?" ববি তাকে জড়িয়ে ধরে বললো।

রুহিন কিছু বললো না, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ে থাকলো মেয়েটার দিকে। মনে মনে খুব অবাক হলো সে। এরকম একটা দুঃস্বপ্ন দেখার পরই তার মনে অন্য চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। আদিম আর বন্য এক চিন্তা। শুধুমাত্র এ চিন্তাটাই মৃত্যুভয়কে তাড়িয়ে দিতে পারে। পরিহাসের বিষয় হলো এটাকে অনেক সভ্যতায় 'ছোটোমৃত্যু' বলেও ডাকা হয়।

"কি হলো, চেয়ে আছো কেন?" ববি হেসে বললো।

মেয়েটাকে জাপটে ধরে তার ঠোঁটে গাঢ় চুম্বন খেলো সে। অনেকক্ষণ পর দম ফুরিয়ে গেলে বিরতি দিলো তারা।

বুক ভরে দম নিয়ে ফিসফিসে কণ্ঠে ববি বললো, "অ্যাই, কি হয়েছে তোমার?"

রুহিন তার চোখের দিকে তাকালো। কে বলবে এই মেয়ের বয়স ঊনচল্লিশ। তার একটা বারো বছরের ছেলে আছে। ববির সর্বনাশা চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো আরো কিছুক্ষণ। এই চোখ তাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে আবার।

খপ্ করে মেয়েটার চুল মুঠো করে ধরে কানে কানে বললো, "গিভ মি অ্যা লিটল ডেথ!"

অধ্যায় ১৫

নিজের ঘরে বসে বই পড়ছিলো কেএসকে কিন্তু আজ পড়তে ভালো লাগছে না বলে বুকের উপর বইটা রেখে চুপচাপ ভেবে যাচ্ছে। তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে দু' দুটো চিন্তা : ঘর থেকে মোবাইলফোনটা কিভাবে চুরি হলো? আর একজন লোক অপারেশন টেবিলে শুয়ে থেকে বাইরে এসে কিভাবে খুনটা করতে পারলো?

এ দুটো প্রশ্নের জবাব তার জানা নেই। তবে সে জানে, আরেকটু তদন্ত করলেই উত্তরগুলো পাওয়া যাবে। ঘরে বসে থেকে, কোনো প্রচেষ্টা না থাকলে তো আর জানা সম্ভব নয়। সত্যের কাছে পৌঁছাতে হলে অনেক বাধাবিপত্তি পেরোতে হবে। সত্য হলো পাহাড়ের মতো, অটল দাঁড়িয়ে থাকে। তার কাছে তোমাকে যেতে হবে, সে তোমার কাছে সুরসুর করে চলে আসবে না।

হাতের রুমালটা দিয়ে নাক পরিস্কার করে নিলো। আজ সকাল থেকে সর্দিতে পেয়ে বসেছে। পাতলা সর্দির মতো বিচ্ছিরি জিনিস আর হয় না। ফ্যাচফ্যাচ করে নাক দিয়ে পানি পড়বে আর রুমাল দিয়ে সেটা মুছতে হবে বার বার। একটু আগে অ্যালাট্রল নামের একটা ওষুধ খেয়েছে, উন্নতির কোনো লক্ষণ এখনও দেখা যাচ্ছে না। এরা কীসব ওষুধ বানায়! আল্লাহই জানে। শুধু সাদা পাউডার না তো!

এমন সময় ফোনটা বেজে উঠলে খুশিতে তার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠলো। আজকেই নতুন এই ফোনটা কিনেছে। আইনস্টাইন সিমও তুলে এনেছে, কিন্তু ফোনটা হাতে তুলে নিতেই কেএসকের খুশি উবে গেলো। একটা অপরিচিত নাম্বার।

"হ্যালো?" আস্তে করে বললো সে।

"মিঃ খান, আমি রুহিন মালিক বলছি।"

"আরে, ব্যারিস্টার যে...কি খবর," একটু হেসে বললো কেএসকে।

"ভালো। আপনার কি অবস্থা? শরীর ভালো তো?"

"আমার শরীর কি আর ভালো থাকে," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো সে। "আজ পাইছে সর্দিতে। অবস্থা কাহিল।"

"ওহ্," ওপাশ থেকে সহমর্মিতার সুরে বললো ব্যারিস্টার রুহিন মালিক। "ওষুধ খেয়েছেন?"

"খাইছি, তয় কাজ হইতাছে না..." রুমাল দিয়ে নাকটা আবার পরিস্কার করে বললো, "আপনের খবর কি, বলেন?"

"ডিবির ঐ ইন্সপেক্টর, আপনার ছাত্র, আমিনুল সাহেব ফোন করেছিলেন।"

"সে কি কইলো?"

"আজ আমাকে একটু আসতে বলছে। জিজ্ঞাসাবাদ করবে নাকি।"

"সেইটা তো স্বাভাবিক। কেসটা এখন ও-ই ডিল করতাছে।"

"আপনি কি আমার সাথে থাকবেন?"

মাথা দোলালো কেএসকে, যদিও ফোনের ওপাশে থাকা রুহিন মালিক সেটা দেখতে পাচ্ছে না। "আমার থাকনটা ঠিক হইবো না। কেসটা ও তদন্ত করতাছে। ওইটা ওর অ্যাফেয়ার। আমি থাকলে অয় আনইজি ফিল করবো।"

"তা ঠিক," বললো ব্যারিস্টার। "আচ্ছা, আপনি যে আমার সাথে আছেন, আই মিন, আমরা যে একসাথে এই কেসটার উপর কাজ করছি সেটা কি আমিনুল সাহেব জানে?"

কেএসকে একটু সময় নিলো জবাব দিতে। আজ ক্লাস শেষে আমিনুলকে আলাদাভাবে ডেকে কথা বলেছে এ নিয়ে। আমিনুল তাকে প্রাইমারি কিছু তথ্য জানিয়ে বলেছে, পোস্টমের্টেমের রিপোর্টটা পেলেই তার একটা কপি পাঠিয়ে দেবে তার কাছে। যা যা দরকার সবই তাকে সরবরাহ করা হবে।

"হুম, জানে," ছোট্ট করে বললো সাবেক ইনভেস্টিগেটর। "কিন্তু আপনে ওর লগে এইসব নিয়া কোনো কথা বলবেন না। অফিশিয়ালি ও আপনেরে ইন্টেরোগেট করবো। ব্যাপারটা খুবই সিম্পল। যা যা ঘটছে আপনে ওরে বলবেন। কোনো কিছু লুকাইবেন না।"

"ঠিক আছে," বললো রুহিন মালিক।

“ছেলেটা খুব ব্রাইট। হয়তো আমার আগে ও-ই কেসটা সল্‌ভ কইরা ফালাইবো।”

কিন্তু ওপাশে থাকা ব্যারিস্টার কথাটা বিশ্বাস করতে পারলো না। যদিও এ নিয়ে আর কিছু বললো না সে। “আজ বিকেলে কি আমরা একটু দেখা করতে পারি?”

“একটু না, অনেক বেশি,” হেসে বললো কেএসকে। “আমাগো ফিল্ডওয়ার্ক করতে হইবো। আপনে ফ্রি থাইকেন।”

মনে হলো কথাটা শুনে তরুণ ব্যারিস্টার খুশিই হলো। “ওকে, ওকে। নো প্রবলেম। আমি ডিবি অফিস থেকে বের হয়েই আপনার ওখানে চলে আসছি।”

“আচ্ছা।”

ফোনটা রেখে কেএসকে উদাস হয়ে গেলো। আজ দু'দিন ধরে তার কোনো ফোন নেই। সে জানে, ও চেষ্টা করেছিলো কিন্তু ফোন বন্ধ পেয়েছে। হয়তো এজন্যে খুব চিন্তাও করছে। তার জন্য কেউ চিন্তা করছে, উদ্বিগ্ন হচ্ছে এটা ভাবতে খুব ভালো লাগে।

ফোনটা নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলো। ওর নাম্বারটা তার মুখস্ত। ইচ্ছে করলেই ফোন করতে পারে কিন্তু কখনও সেটা করা হয় নি। কেন যে করা হয় নি জানে না। ব্যাপারটা যেনো এমনই দাঁড়িয়ে গেছে : শুধু ও-ই তাকে ফোন করবে।

ঘড়ির দিকে তাকালো। প্রায় দুপুর। এ সময়ে ও ফোন দেয়। রাতের খাবার খেয়েছে কিনা জানতে চায়।

একটা এসএমএস করবে? হ্যা, তা করা যায়। কিন্তু কি লিখবে?

অমনি হাতের ফোনটা আবার বেজে উঠলো। কিছুটা চমকে উঠে ডিসপ্লের দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার।

“হ্যালো?” হেসে বললো।

“কি ব্যাপার, ফোন বন্ধ কেন? কাল থেকে ট্রাই করে যাচ্ছি, কোনো খবর নেই। ঘটনা কি? তোমার আবার কি হলো? ঠিক আছো তো?”

এক নিঃশ্বাসে বলে গেলো ওপাশ থেকে। কণ্ঠের মিষ্টতা উধাও হয়ে গেছে বিরক্ত আর রাগের আড়ালে কিন্তু কেএসকের খুবই ভালো লাগছে।

“ফোনটা চুরি হইয়া গেছিলো,” আস্তে করে বললো সে।

“ফোন চুরি হয়ে গেছিলো? কিভাবে? কখন?”

“পরশু সকালে ঘুম থেইকা উইঠা দেখি ফোনটা নাই।”

“নাই মানে?” ঝাঁঝের সাথে বললো।

“সেইটা তো বুঝবার পারতাছি না, ফোনটা গেলো কই,” কাচুমাচু ভঙ্গিতে বললো কেএসকে।

“কী সব আজগুবি কথা বলো,” ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ শোনা গেলো। “ঘরের ভেতর থেকে আবার কে চুরি করবে?”

“সেইটা তো রহস্য।”

“এসবের মধ্যে রহস্য-টহস্য কিছু নেই, বুঝলে? তোমার অভ্যেস খারাপ হয়ে গেছে। সব কিছুতে রহস্য খোঁজো।”

“কী যে কও, ঘর থেইকা ফোনটা গায়েব হইয়া গেলো, এইটা রহস্য না?”

“না, এটা মোটেও রহস্য নয়। আমি জানি ওটা কে চুরি করেছে।”

“কি?” খুবই অবাক হলো কেএসকে। তার মতো অভিজ্ঞ ইনভেস্টিগেটর যার কুলকিনারা করতে পারে নি সেটা কিনা...

“তোমার ঐ আইনস্টাইন না কী যেনো একটা ছেলে আছে, ও-ই চুরি করেছে,” চূড়ান্ত রায় দেবার ভঙ্গিতে বললো।

“আরে না,” সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বললো কেএসকে। “ও করে নাই।”

“আমি জানতাম তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে না,” একটু রেগেই বললো ওপাশ থেকে।

“রাগ কইরো না। ও চুরি করে নাই। আমি শিওর।”

“কিভাবে শিওর হলে?”

“আমার ঘরের দরজা বন্ধ ছিলো তো।”

“তো কি হয়েছে?”

“বাহ্, দরজা বন্ধ থাকলে অয় কিভাবে চুরি করবো?”

আবারো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ শোনা গেলো তবে এবারেরটা বেশ জোরে। “তোমার ব্রিলিয়ান্ট মাথায় এটা ঢুকছে না?”

চুপ মেরে রইলো কেএসকে। তার মাথায় আসলেই কিছু ঢুকছে না।

“তুমি বলছো দরজা বন্ধ ছিলো। এখন আমাকে বলো, কাল রাতে

ঘুমানোর আগে দরজাটা কখন বন্ধ করেছিলে?" একেবারে পেশাদার ইনভেস্টিগেটরদের মতো করে জিজ্ঞাসাবাদের সুরে বললো ওপাশ থেকে।

কেএসকে মনে করার চেষ্টা করলো। "ইয়ে মানে..."

"ঐদিন রাতে তোমার সাথে আমার কথা হয়েছিলো না?"

"হুম।"

"এখন ভেবে দেখো, কখন দরজা বন্ধ করেছিলে, কখন ঘুমিয়েছিলে।"

কেএসকের কিছুই মনে পড়লো না। তার শুধু মনে আছে, অনেক রাত পর্যন্ত বই পড়েছিলো। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলো সেটা মনে নেই।

"তুমি জানোই না কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলে, তাই না?"

"হুম," ছোট্ট করে বললো কেএসকে।

"আমার ধারণা বই পড়তে পড়তে তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে...তারপর মাঝরাতে উঠে দরজা বন্ধ করে আবার ঘুমিয়েছো। এরকমই তো করো সব সময়।"

কেএসকে আর কিছু বলতে পারলো না। সে যে এরকম করে এটা ফোনের ওপাশে থাকা মানুষটার চেয়ে ভালো আর কে জানে।

"তোমার ফোনটা আসলে রাতেই সরিয়ে ফেলেছে ওই ছেলে।"

কিছুই বলতে পারলো না অভিজ্ঞ ইনভেস্টিগেটর কেএস খান।

"আর তুমি কিনা আকাশ-পাতাল ভেবে অস্থির হয়ে পড়েছো। সব কিছুতে রহস্য! আরে বাবা, জীবনটা এতো রহস্যে ভরা থাকে না। একটু বাস্তববাদি হও। বুঝলে?"

"হুম," এর বেশি বলা সম্ভব হলো না তার পক্ষে।

"রাস্তা থেকে একজনকে তুলে এনে বাড়িতে রেখে দিয়েছো। তার বাপ কে মা কে, কোথায় থাকে, কিছুই জানো না। আজকালকার দিনে মানুষ এতোটা আহাম্মকি করে!"

চাপা হাসি দিলো কেএসকে।

"হাসছো কেন?" চটে গেলো ওপাশের জন।

"না, অনেকদিন পর আহাম্মক বলছো তো তাই..."

"আমি তোমাকে আহাম্মক বলি নি, বলেছি আহাম্মকিপনার কথা!"

"ওই একই হইলো। আহাম্মকরাই তো আহাম্মকি করে।"

"অসহ্য, তোমার তো দেখি কোনো বিকার নেই। আমার কথাগুলো

সিরিয়াসলি নিচ্ছো না।"

"না, না, সিরিয়াসলি নিতাছি তো।"

"শোনো, ঐসব রাস্তার ছেলেদের নিয়ে থাকলে কোন্‌দিন দেখবে তোমার বিরাট কোনো সর্বনাশ করে চলে গেছে।"

"আমার আবার কী সর্বনাশ করবো?" আস্তে করে বললো কেএসকে। "যার কেউ নাই তার আবার সর্বনাশ কেমনে হইবো!"

ওপাশে যে আছে সে চুপ মেরে গেলো কথাটা শুনে।

কেএসকেও বুঝতে পারলো ব্যাপারটা। কথাটা বলা ঠিক হয় নি। নিজেকে ভর্ৎসনা করলো মনে মনে।

"জুবায়ের মনে হয় ডাকছে, আমি এখন রাখি। তুমি দেরি না করে খেয়ে নিও।"

লাইনটা কেটে গেলেও এতোক্ষণ ধরে যে বাচিক-সম্পর্কটা ছিলো সেটার রেশ কাটলো না। কেএসকের মনে হলো তার এই ঊষর-ধূসর জীবনে এখনও একজন আছে। বিশাল ক্যাকটাসের মতো দাঁড়িয়ে আছে সে, যেনো শূণ্যতাকে অগ্রাহ্য করার জন্যই।

অধ্যায় ১৬

এক ঘন্টার ক্লাস শেষে এক এক করে যখন সবাই রুম থেকে বের হয়ে যাচ্ছে তখনই কেএসকের সামনে এসে দাঁড়ালো আমিনুল।

"স্যার, একটু কথা ছিলো আপনার সাথে," বললো সে।

হাসি দিলো কেএসকে। "আমারও কথা আছে তোমার সাথে।"

"আমরা কি উপরের ক্যান্টিনে গিয়ে বসবো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সাবেক ইনভেস্টিগেটর। "হ, একটু চা খাওনের দরকার। বক বক করতে করতে গলা শুকায়া গেছে।"

ক্যান্টিনে এসেই চায়ের অর্ডার দিয়ে বসে পড়লো তারা। সকালের এ সময়টাতে খুব বেশি লোকজন নেই। একেবারে ছিমছাম পরিবেশ।

"কতোদূর আগাইলা?" জানতে চাইলো কেএসকে।

"কেসটা মাত্র হাতে পেলাম, এখনও সব ইনফর্মেশন জোগার করতে পারি নি," বললো ডিবির উদীয়মান ইনভেস্টিগেটর। "তারপরও মনে হচ্ছে, কেসটা খুবই মিস্টেরিয়াস।"

"হুম, আমি কখনও এইরকম কেস হাতে পাই নাই। রুহিন মালিকের মতো প্রতিষ্ঠিত একজন ব্যারিস্টার ক্যান্ তার বন্ধুরে খুন করবো? আবার সে যেটা বলতাছে, ঐ মাহবুব সাহেব কেমনে খুনটা করলো? সে তো তখন ওটি'তে। এক্কেবারে হিচককের সিনেমার গল্প।"

"আপনার কি মনে হয় ব্যারিস্টার সত্যি কথা বলছে?"

আমিনুলের এ কথায় মুচকি হাসলো সে। "আমি তার কথা বিশ্বাস করছি কিনা সেইটা জানতে চাইতাছো?"

ডিবির কর্মকর্তা একটু কাচুমাচু খেলো।

"আমাগো লাইনে বিশ্বাস-অবিশ্বাস বাদ দিয়া কাজ শুরু করতে হয়। যাচাই না কইরা বিশ্বাস-অবিশ্বাস করা আমাগো কাজ না।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো আমিনুল। "ঐ ব্যারিস্টারের কথা যদি সত্যি

হয় তাহলে এই কেসটা একদম জটিল হয়ে যাবে, স্যার।"

"হুম," একটু চুপ থেকে আবার বললো সে, "শোনো, আমিনুল। আমি উনার কনসালটেন্ট হিসাবে কাজ করতাছি ঠিক আছে, কিন্তু আমার কোনো বাইডিন্ডংস নাই। আমি তার এমপ্লয়ি না। কিউরিসিটি থেইকা কেসটার ব্যাপারে জড়াইছি। যদি দেখি মার্ডারটা সে-ই করছে তাইলে সবার আগে আমি তোমারে জানামু। সব প্রমাণ তোমার হাতে তুইলা দিমু। আফটার অল কেসটা অফিশিয়ালি তুমি তদন্ত করতাছো।"

কথাটা শুনে খুশি হলেও আমিনুল একটু অবাকই হলো।

"অবাক হওনের কিছু নাই। ব্যারিস্টারের সাথে আমার এরকম কথাই হইছে। সেও এইটা মাইনা নিছে।"

"তাহলে তো ভালোই হলো, স্যার," বললো কেএসকের ছাত্র। "আমিও আপনার হেল্প পাচ্ছি।"

হা-হা করে হেসে ফেললো কেএস খান। "সেইটা তুমি সব সময়ই পাইবা।"

"আমি জানি, স্যার।"

এমন সময় চা এসে পড়লে তারা দু'জনেই চায়ের কাপ তুলে নিলো হাতে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে কথা বলতে লাগলো এবার।

"আজকে ব্যারিস্টারকে আমি ইন্টেরোগেট করবো," বললো আমিনুল।

"জানি। সে আমারে বলছে।"

"ভদ্রলোক ভয় পাচ্ছে নাকি?"

নিজের কাপে চুমুক দিলো কেএসকে। "মনে হয় না। সে খুব কনফিডেন্ট, খুনটা মাহবুব সাহেবই করছে।"

আমিনুল কিছু বললো না।

"ঐ ব্যারিস্টারের ধারণা কেসটা ঠিকমতো সল্‌ভ হইলে শেষ পর্যন্ত লাভ হইবো তারই।"

আমিনুল শুধু মাথা নেড়ে সায় দিলো। একটু ভেবে নিয়ে প্রসঙ্গ পাল্টালো সে। "আমাকে কোনো সাজেশন দেবেন, স্যার?"

চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখলো সে। "ঠিক সাজেশন না, তয় কেসটা যেহেতু অন্যরকম, তাই একটু ভিন্নভাবে আগাইতে হইবো।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো তার ছাত্র।

"তোমারে তো আগেই কইছি, ভিক্টিমের সাথে রফিক সাহেব আর রুহিন মালিকের একটা ঝামেলা ছিলো। তিন-চাইর বছর আগের মামলা।"

"জি, স্যার।"

"এই ঝামেলার ব্যাপারটা ডিটেইল জাইনা নিতে হইবো।"

"ব্যারিস্টার আপনাকে এ ব্যাপারে কিছু বলে নি?" আমিনুল জানতে চাইলো।

"ব্যারিস্টার আমারে অনেক কিছুই বলছে, তারপরও ক্রশ-চেক করা দরকার।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো কেএসকের ছাত্র। "ওকে, স্যার। আমি এটা চেক করে দেখবো।

একটু চুপ থেকে বললো সাবেক ইনভেস্টিগেটর, "এখন আমারে কও, রফিক সাহেব ঠিক কখন থেইকা নিখোঁজ হইলো, কেমনে হইলো।"

এবার আমিনুল চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখলো। "আমি উনার অফিসের লোকজনের সাথে কথা বলেছি। ওরা বলছে, ঘটনার দিন বিকেল চারটার দিকে উনি অফিস থেকে বের হয়ে যান। তারপর থেকে আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। উনার গাড়িটাও এখন পর্যন্ত লাপাত্তা।"

"ভদ্রলোক কি নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করতেন?"

"জি, স্যার।"

"উনি কি সব সময় চাইরটা বাজেই অফিস থেইকা বাইর হইতেন?"

"তারা তো এরকমই বললো। বিশেষ কোনো কাজ না থাকলে চারটার মধ্যেই বের হয়ে যেতেন।"

"আচ্ছা," চায়ের কাপটা আবার তুলে নিলো কেএসকে।

"অফিসের একজন বললো, বিকেল পাঁচটার দিকে কী একটা দরকারে যেনো উনাকে ফোন দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু ফোনটা বন্ধ পাওয়া যায় তখন।"

কেএসকে চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়ে থেমে গেলো। "পাঁচটায়?"

"জি, স্যার।"

চিন্তায় ডুবে গেলো মিঃ খান। আমিনুল কিছু না বলে অপেক্ষা করলো।

"উনার অফিসের পার্কিংলট আছে?"

"আছে, স্যার। ওখানেই উনার গাড়িটা ছিলো।"

মাথা নাড়লো সাবেক ইনভেস্টিগেটর।

আমিনুল জানে, কেএসকের মাথায় কিছু একটা ধরা পড়েছে। "কিছু ধরতে পেরেছেন, স্যার?"

মুখ তুলে তাকালো ডিবির সাবেক কর্মকর্তা। "আরে না। এতো তাড়াতাড়ি কিছু বুঝা যায় নাকি।"

কিন্তু আমিনুল জানে, কেএসকে কিছু একটা ধরতে পেরেছে। এটাই তার স্বভাব। অনেক কিছু আগেভাগে ধরতে পারলেও একদম নিশ্চিত হওয়ার আগপর্যন্ত সেটা বলবে না।

"ওই অফিসের সিকিউরিটি কেমন?" জানতে চাইলো কেএস খান। "মানে, সিসি ক্যাম-ট্যাম কিছু আছে তো? আজকাল তো প্রায় অফিসেই এগুলা থাকে।"

"আছে, স্যার," বললো আমিনুল। "তবে কাজ করে কিনা কে জানে।"

"তুমি পার্কিংলটের সিসি-ক্যামটার ফুটেজ জোগার করার চেষ্টা করো নাই?"

আমিনুল একটু কাচুমাচু খেলো।

নিজের ছাত্রকে চুপ থাকতে দেখে বললো, "ঐখান থেইকা কিন্তু ভাইটাল ইনফর্মেশন পাওয়া যাইতে পারে।"

"কি রকম?" একটু অবাকই হলো কেএসকের ছাত্র।

"এই ধরো পার্কিংলট থেইকা রফিক সাহেবের গাড়িটা ঠিক কয়টায় বাইর হইলো সেইটা আমরা জানতে পারুম। আরো অনেক কিছু জানা যাইতে পারে।"

"সরি, স্যার," বললো আমিনুল। "এট আমার মাথায় আসে নি। চিন্তা করবেন না। আমি সেটা জোগার করে ফেলবো।"

কেএসকে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে চায়ের শেষটুকু পান করে কাপটা রেখে দিলো। "রফিক সাহেবের গাড়িটা এখনও পাওয়া যায় নাই, তাই না?"

"জি, স্যার।"

"তুমি গাড়িটার নম্বর আর ডেসক্রিপশন সবগুলা থানায় ইনফর্ম কইরা দাও। গাড়িটা পাওয়া গেলে আমাগো কাজে অনেক সুবিধা হইবো।"

"ঠিক আছে, স্যার। আর কিছু?"

একটু ভাবলো সে। "যে কোনো ইনভেস্টিগেশনের শুরুতে কিছু সত্য নিয়া আগাইতে হয়। এইটা অনেকটা জ্যামিতির মতো।"

জ্যামিতির মতো! অবাক হয়ে চেয়ে রইলো আমিনুল।

মাথা নেড়ে আশ্বস্ত করলো শিষ্যকে। "জ্যামিতিতে এইটারে কয় স্বতঃসিদ্ধ। তুমি একেবারে শূণ্য থেইকা কিছু শুরু করবার পারবা না।"

মনে হলো আমিনুল কিছুটা বুঝতে পেরেছে। মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

"এই কেসেও কিছু স্বতঃসিদ্ধ, মাইনে প্রতিষ্ঠিত সত্য আছে।" খুকখুক করে একটু কেশে নিলো। "সেইটা কি?" ছাত্রকে বাজিয়ে দেখতে চাইলো যেনো।

ক্রিমিনোলজি আর অ্যাডভান্স ইনভেস্টিগেশন প্রসিডিউডিং পড়াতে গিয়ে ইনভেস্টিগেশনের অনেক কিছুই আলোচনা করেছে তার এই শিক্ষক। আমিনুল সেখান থেকে বললো, "একটা খুন হয়েছে। কারণ ডেডবডি পাওয়া গেছে..."

"হুম।"

"...খুনটা কোথায় কখন হয়েছে সেটাও আমরা জানি।"

হাসলো কেএসকে। "আমরা কিন্তু আরো কিছু জানি। ভিক্টিম কখন থেইকা নিখোঁজ হইছে।"

"জি, স্যার," বললো আমিনুল।

"এখন খুন হওয়া আর নিখোঁজ হওয়ার মাঝখানের সময়টা যতো নিঁখুত বাইর করন যাইবো ততোই সুবিধা।"

আবারো মাথা নেড়ে সায় দিলো আমিনুল তবে এবার তার ঠোঁটে মুচকি হাসি। "স্যার, আরেকটা ব্যাপার আছে।"

ভুরু তুলে জানতে চাইলো কেএসকে।

"মাহবুব সাহেবের অপারেশনটা কিন্তু সত্যিই হয়েছে। আমি সবকিছু চেক করে দেখেছি। হাসপাতালের রেকর্ড, চাক্ষুস স্বাক্ষী...এমনকি অন্য এক ডাক্তারের সাহায্যে ভদ্রলোকের শরীরে অপারেশনের চিহ্ন পর্যন্ত খতিয়ে দেখেছি।"

সাবেক ইনভেস্টিগেটর চুপ মেরে গেলো। সে অবশ্য মাহবুব সাহেবের শরীরে অপারেশনের চিহ্ন সত্যি সত্যি আছে কিনা সেটা খতিয়ে দেখতে

পারে নি। তার পক্ষে সেটা করা শোভনও হতো না। সেজন্যে এই অপারেশনের ব্যাপারটা নিয়ে তার মধ্যে কিছুটা সংশয় রয়ে গেছিলো।

"হুম।" ছোট্ট করে বললো সে।

মাহবুব সাহেবের অপারেশনটা ভুয়া হলে এই কেসটা পানির মতো সহজ হয়ে যেতো। এখন মনে হচ্ছে একদলা গিট পাকানো সুতোর মতোই জটিল একটা কেস।

"আপনার কি কোনো সন্দেহ আছে, স্যার?"

কেএসকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো ছাত্রের দিকে। "না," অবশেষে বললো সে।

কিন্তু আমিনুলের কাছে মনে হলো এখনও তার শিক্ষকের মনে এ নিয়ে কিছুটা দ্বিধা রয়ে গেছে।

"তুমি তোমার মতো কইরা আগাইতে থাকো। যখন দরকার হইবো আমারে বলবা। আর আমি যদি তেমন কিছু পাই তেমার সাথে শেয়ার করুম, ঠিক আছে?"

"জি, স্যার।"

কেএস খানকে উঠতে দেখে আমিনুলও উঠে দাঁড়ালো। "আমি তাহলে সিসি-ক্যামের ফুটেজ জোগার করে আপনার কাছে একটা কপি পাঠিয়ে দেবো। পোস্টমর্টেমের রিপোর্টটা যদি হাতে পেয়ে যাই তাহলে ওটার একটা ফটোকপিও দিয়ে দেবো।"

"হ হ, ঐ রিপোর্টটাও দেখা দরকার আছে।"

তারা দু'জন কথা বলতে বলতে ক্যান্টিন থেকে বের হয়ে গেলো একসাথে।

অধ্যায় ১৭

ইন্টেরোগেশন রুম কেমন হয় সেটা জানতো না ব্যারিস্টার রুহিন মালিক। আজ দেখা হয়ে গেলো। টিভি আর সিনেমায় যেরকম ইন্টেরোগেশন রুম দেখেছে এটা সেরকম নয়। মনে হচ্ছে উর্ধতন কোনো কর্মকর্তার অফিস। ডেস্ক, চেয়ার আর কিছু আসবাব ছাড়া ঘরে কিছু নেই। তাকে এখানে আসতে বলা হয়েছিলো তিনটার পর পরই। সে ঘড়ি ধরে ঠিক তিনটা বাজে উপস্থিত হয়েছে। কয়েক বছর লন্ডনে থাকার ফলে এই নিয়মানুবর্তিতায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে কিন্তু মুশকিল হলো এ দেশের কেউই এসবের ধার ধারে না। ফলে সমস্যা হয় তার মতো পাঙ্কচুয়াল লোকজনের। নিয়মনিষ্ঠ হতে গিয়ে খামোখা বসে বসে অপেক্ষা করতে হয়, কখন তার কাউন্টারপার্ট দয়া করে হাজির হবে। এখনও তাকে সেটাই করতে হচ্ছে। এরইমধ্যে পনেরো মিনিট লেট!

এরা যে কবে সময়ের মূল্য বুঝবে!

ডেস্কের উপর আজকের কিছু দৈনিক পত্রিকা দেখতে পেলো। ছোট্ট করে হলেও প্রথম পৃষ্ঠাতেই আছে তার নিউজটা। পত্রিকাটা হাতে নিয়ে দেখতে ইচ্ছে করলো না। একেকজন একেক রকম নিউজ ছেপেছে। তার মতো প্রতিষ্ঠিত একজন মানুষ খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়েছে বলে প্রেস একদম পাগল হয়ে গেছে। নতুন কিছূ না ঘটলেও প্রতিদিন খবর ছেপেই যাচ্ছে। এসব প্রেস হলো কফিন ব্যবসায়ীদের মতো। সারাক্ষণ মনে মনে জপ করতে থাকে কখন খারাপ কিছু ঘটে। যতো বড় বিপর্যয় ততোই তাদের পোয়াবারো। তার চোখমুখ তিক্ততায় ভরে উঠলো।

সারাদেশের মানুষ জেনে গেছে, রফিক হাওলাদারের খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত সে। টিভি নিউজ আর পত্রিকাগুলো ঘটনার পর থেকে নিয়মিত এ সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশন করে যাচ্ছে। যেনো বিরাট কোনো সেলিব্রেটি স্ক্যান্ডাল।

মুচকি হাসলো সে। টিভি'র টকশো'তে সে নিয়মিত হাজির হয়, আইনের অনেক জটিল বিষয় নিয়ে কথা বলে। মাঝেমধ্যে পত্রিকাগুলোতেও কলাম লেখে। তাকে তো ছোটোখাটো সেলিব্রেটি বলাই যায়।

"সরি," হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে বললো আমিনুল।

ব্যারিস্টার রুহিন উঠে দাঁড়ালো না। বসে থেকেই মুচকি হেসে বললো, "ইটস ওকে।"

"কখন এসেছেন?" নিজের ডেস্কে বসতে বসতে বললো ডিবির কর্মকর্তা।

"যখন আসতে বলেছিলেন," শীতলকণ্ঠে বললো রুহিন। "ঠিক তিনটায়।"

"ওহ্, তাহলে তো অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন।"

রুহিন কিছু বললো না।

"চা না কফি?"

আমিনুলের এ কথায় অবাক হলো ব্যারিস্টার। ইন্টেরোগেশন রুমের বর্ণনা সে শুনেছে ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে। কিন্তু এরকম আপ্যায়নের কথা শোনে নি। "চা," ছোট্ট করে বললো।

"গুড," বলেই ইন্টারকমটা তুলে নিয়ে দু'কাপ চায়ের অর্ডার দিলো ডিবির কর্মকর্তা। "আপনি তো বেশ কয়েক বছর লন্ডনে ছিলেন সেজন্যেই চায়ের হ্যাবিট হয়ে গেছে। বৃটিশরা তো চা-ই বেশি খায়, তাই না?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো রুহিন।

"আর দেখেন, আমাদের এখানে কী অবস্থা," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো যেনো। "অনেকেই মনে করে চায়ের চেয়ে কফি হলো বেশি স্মার্ট। কারণ ওটা সাদা চামড়ার লোকেরা খায়। গর্দভের দল!"

রুহিন মালিক নির্বিকার রইলো। এসব আলাপে অংশ নেবার কোনো ইচ্ছে তার নেই।

"আমি সব সময় চা-ই পছন্দ করি। কফি খুব কড়া। জিভের স্বাদ নষ্ট করে ফেলে।"

এবার একটু হাসলো ব্যারিস্টার। নেহায়েতই সৌজন্যবশত।

চুপ মেরে গেলো আমিনুল। যেনো কাজের কথায় আসার জন্য একটু বিরতি নিচ্ছে।

"এর আগে পুলিশ আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলো, তাদের কাছে আপনি যা যা বলেছেন সবই আমার কাছে আছে। আমি আর ওসব কথা জিজ্ঞেস করে সময় নষ্ট করবো না।"

ড্রয়ার থেকে একটা ফাইল বের করে ডেস্কের উপর রাখলো সে।

"আমি আপনার স্টেটমেন্টটা মন দিয়ে পড়ে দেখেছি। দুএকটা জায়গায় খটকা লেগেছে।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো ব্যারিস্টার রুহিন মালিক।

"মেডিকেল রিপোর্ট বলছে আপনি ঐ দিন ড্রিঙ্ক করেছিলেন। আপনার রক্তে বেশ ভালো পরিমাণ অ্যালকোহল পাওয়া গেছে। বনানী থানার ওসিও এটা উল্লেখ করেছে রিপোর্টে।"

"হ্যা, ঐদিন অফিস থেকে বের হবার আগে সামান্য ড্রিঙ্ক করেছিলাম। ওটা আমি সব সময়ই করি।"

"বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার একটু ড্রিঙ্ক করতেই পারে, কি বলেন?" হেসে বললো আমিনুল।

রুহিন মালিক কিছু বললো না। তার কাছে মনে হলো এই ইনভেস্টিগেটর টিপ্পনী কাটছে।

"আমার প্রশ্ন, আপনি পার্কের ভেতরে, যেখানে খুব একটা আলো নেই, সেখানে অল্প সময়ের জন্য মাহবুব সাহেবকে দেখে চিনতে পারলেন কিভাবে? আপনি নিজেই বলেছেন ভদ্রলোকের সাথে আপনার কোনো যোগাযোগ ছিলো না। কয়েক বছর আগে উনি আপনার কাছে গেছিলেন একটা কেসের ব্যাপারে। এতোদিন পরও তাকে এক ঝলক দেখে চিনে ফেললেন?"

"আপনি কি মনে করছেন আমি ভুল দেখেছি?" রুহিন ভুরু কুচকে জানতে চাইলো।

"দেখতেই পারেন," আমিনুল সরাসরি বলে দিলো। "ড্রিঙ্ক করা অবস্থায় এমন ভুল হতেই পারে।"

"দেখুন, আমি নিয়মিত ড্রিঙ্ক করি। খুবই পরিমিত। কখনও মাতাল হয়েছি, উল্টাপাল্টা কাজ করেছি এমন রেকর্ড আমার নেই।"

এ সময় ঘরে একজন আরদার্লি ঢুকলো চায়ের ট্রে নিয়ে। ট্রে'টা রেখে সে চুপচাপ চলে গেলে আমিনুল বললো, "রেকর্ড হতে কতোক্ষণ, বলেন।"

চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে ব্যারিস্টারকে ইশারা করলো চা খাওয়ার জন্য। "ঐদিন হয়তো ওরকম একটা রেকর্ড হয়ে গেছে?"

মাথা দোলালো ব্যারিস্টার। "আপনি যদি মনে করে থাকেন আমি ড্রিঙ্ক করার কারণে উল্টাপাল্টা দেখেছি তাহলে আমার আর কিছু বলার নেই।"

"আহ্, রেগে যাচ্ছেন কেন?" আমিনুল বললো।

গভীর করে দম নিয়ে নিজের রাগ প্রশমিত করলো ব্যারিস্টার। "মাহবুব সাহেবের সাথে আমার যোগাযোগ ছিলো না সত্যি কিন্তু রফিকের মামলা চলার সময় নিয়মিত কোর্টে দেখা হতো তার সাথে। তার চোহারাটা আমার ভালোই মনে আছে।"

আমিনুল ভুরু তুলে চেয়ে রইলো, যেনো আপন মনে কিছু একটা বলছে। "মাহবুব সাহেবের সাথে আপনার ঝামেলাটার কথা আপনি পুলিশের কাছেও বলেছেন। আমি আর সেদিকে গেলাম না।"

রুহিন কিছু বললো না, অপেক্ষা করলো কথা শোনার জন্য।

"ভদ্রলোক মেন্টাল হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর কি আপনার সাথে দেখা হয়েছিলো?"

"না।" ছোট্ট করে বললো রুহিন।

"ফোন করে কোনো ধরণের হুমকি দিয়েছিলো?"

"না।"

"আচ্ছা," আমিনুল মনে মনে গুছিয়ে নিতে শুরু করলো এরপর কি বলবে।

"আপনি মনে হয় আমার কথাটা এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না।"

রুহিনের এ কথায় স্থিরচোখে চেয়ে রইলো ডিবির ইনভেস্টিগেটর। "খুনটা যখন হয় মাহবুব সাহেব তখন হাসপাতালের ওটি'তে। উনার অপারেশন হচ্ছিলো। এ ব্যাপারটা একদম সত্যি। আমি নিজে চেক করে দেখেছি।"

রুহিন মালিক মাথা দোলালো শুধু, কিছু বললো না।

"আমার কথা বিশ্বাস না হলে স্যারকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।"

"স্যার?" অবাক হলো ব্যারিস্টার। পরক্ষণেই বুঝতে পারলো কেএসকের কথা বলছে।

"আপনার কনসালটেন্ট।"

"ও ।" ব্যারিস্টার মাথা নেড়ে সায় দিলো ।

"এখন আপনিই বলুন, আপনার এসব কথা কিভাবে আমরা বিশ্বাস করবো? আপনার পিস্তলের গুলিতে আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু খুন হয়েছে । আর ঘটনাস্থলেও আপনি উপস্থিত ছিলেন ।"

ব্যারিস্টার আবারো গভীর করে দম নিলো ।

"আপনি নিশ্চয় বলবেন না, মাহবুব সাহেবের বডিডাবল আছে? আর সেই বডিডাবল এ কাজটা করেছে?"

মাথা দোলালো রুহিন । এরকম উদ্ভট কিছু সে ভাবছে না । কিন্তু এ প্রশ্নের জবাবও তার জানা নেই । অন্তত এ মুহূর্তে । এই এক জায়গাতে এসে পুরো কেসটা জট পাকিয়ে যায় ।

"শুনুন," বেশ শান্তকণ্ঠে বললো রুহিন মালিক । "খুনটা মাহবুবই করেছে । আমার আর রফিকের উপর সে রেগে ছিলো । প্রতিশোধ নেবার জন্য এরকম একটা কঠিন চাল চেলেছে । কাজটা সে কিভাবে করেছে আমি জানি না । আপনারা তদন্ত করে সেটা বের করতে পারবেন আশা করি ।"

"আপনারাও তো তদন্ত করছেন, তাই না?" ভুরু তুলে জানতে চাইলো আমিনুল । "আপনারাও হয়তো বের করতে পারবেন ।"

ব্যারিস্টার চেয়ে রইলো শুধু ।

"মানে আপনি আর মি: খান, আমাদের স্যারের কথা বলছি ।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ব্যারিস্টার । "আমার কথাকে সত্যি বলে ধরে নিলে আপনাদের তদন্ত সঠিকপথে এগোবে । নইলে..."

"নইলে?" উদগ্রীব হয়ে জানতে চাইলো ডিবির ইনভেস্টিগেটর ।

"একটা কানাগলিতে গিয়ে পৌঁছাবেন ।"

ডেস্কের পেপারওয়েটটা হাতে নিয়ে খেলতে খেলতে বললো আমিনুল, "সেক্ষেত্রে আপনারই সমস্যা হবে । বিপদে পড়ে যাবেন । আমরা বড়জোর একটা কেসে ব্যর্থ হবো, তাই না?"

"আমার কোনো সমস্যা হবে না । বিপদেও পড়বো না । সাময়িক ঝামেলায় পড়ে যাবো, এই যা," দৃঢ়ভাবে বললো ব্যারিস্টার ।

"এতো আত্মবিশ্বাস কিভাবে পেলেন!" মুচকি হাসলো ডিবির কর্মকর্তা । "স্যার আপনাকে সাহায্য করছে, তাই?"

"না," চট করে বললো রুহিন মালিক । "আপনার স্যারের জন্য নয় ।"

"তাহলে?"

"খুনটা যে আমি করি নি সেটা আমার চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না। এটাই আমার আত্মবিশ্বাস।"

"ও," আমিনুল একটু চুপ করে রইলো।

"তবে আমি নিশ্চত, আপনার স্যার এটা বের করতে পারবেন।"

"অবশ্যই পারবেন।" আমিনুল সহজ ভঙ্গিতে বললো। "উনি না পারলে আর কেউ পারবেন না।"

ব্যারিস্টার চেয়ে রইলো তার সামনে বসা ইনভেস্টিগেটরের দিকে। বুঝতে পারলো না লোকটা এ কথা বিশ্বাস করে নাকি ঠাট্টা করে বললো।

"আমি কিন্তু ঠাট্টা করছি না।"

আমিনুলের এ কথায় কিছুটা চমকে উঠলো ব্যারিস্টার। তার মনের ভাব বুঝে ফেলেছে বলে কিছুটা অবাকও হলো।

"আপনি হয়তো ভাবছেন আমরা আপনাকে সন্দেহ করছি, আসলে ব্যাপারটা সেরকম কিছু না।"

আমিনুলের এ কথায় ভুরু কুচকে তাকালো রুহিন। "তাহলে বার বার আমাকে ইন্টেরোগেট করছেন যে?"

মাথা দোলালো ইনভেস্টিগেটর। "পুলিশ আপনাকে প্রথমবার ইন্টেরোগেট করেছে। কিন্তু কেসটা এখন ডিবি'র কাছে চলে এসেছে। তদন্তকারী অফিসার হিসেবে আপনাকে আমার জিজ্ঞাসাবাদ করার দরকার ছিলো। ওয়ান কাইন্ড অব ফর্মালিটি বলতে পারেন।"

রুহিন মালিক কিছু বললো না।

"আমি আগে নিশ্চিত হতে চাইছি আপনি কোনো ভুল করেন নি, মানে ভুল দেখেন নি।"

"আমি আবারো বলছি, আমার কোনো ভুল হয় নি। মাহবুব ক্লায়েন্ট সেজে আমাকে ডেকে নিয়ে এসে একটা ফাঁদে ফেলেছে। ইট ইজ অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট।"

"কিন্তু আপনার ফোনের কললিস্ট চেক করে দেখা গেছে ঐ সময় আপনাকে দু'তিনবার কল করেছিলো আপনার বন্ধু রফিক।"

রুহিন মাথা দোলালো। এর জবাব তো খুবই সোজা তারপরও এরা কেন বুঝতে পারছে না।

"আপনিও তাকে ফোন করেছিলেন।"

"হুম। আমাদের মিট করার কথা ছিলো। কিন্তু ওই লোক আসতে দেরি করছিলো তাই তাগাদা দেবার জন্য কল দিয়েছিলাম।"

"ওই লোক মানে কার কথা বলছেন?"

বিরক্ত হলো রুহিন। "মাহবুব।"

"কিন্তু ফোনটা ছিলো রফিক সাহেবের," আমিনুল আস্তে করে বললো।

"সেটা আমি জানি না। আমাকে ঐ নাম্বার থেকে ফোন দিয়ে সালেহীন চৌধুরি নামে পরিচয় দেয়া হয়। একটা কেসের ব্যাপারে দেখা করার জন্য বলে..."

"রফিক সাহেব তো আপনার বন্ধু ছিলো, তাহলে উনার নাম্বারটা দেখেও চিনতে পারলেন না?"

গভীর করে নিঃশ্বাস নিয়ে বললো ব্যারিস্টার, "ঐ নাম্বারটা যদি রফিকের হয়ে থাকে তাহলে সেটা আমার কাছে ছিলো না। তাছাড়া, ওর সাথে অনেকদিন আমার কোনো যোগাযোগ নেই। ওর নাম্বারটাও আমার ফোনবুকে ছিলো না।"

"কেন, আপনাদের কি ঝগড়া হয়েছিলো?"

"ঠিক ঝগড়া না," কথাটা বলেই রুহিন স্থিরদৃষ্টিতে তাকালো ডিবির কর্মকর্তার দিকে। "আমি এটা মিঃ খানকে ডিটেইল বলেছি।"

হেসে ফেললো আমিনুল। "কিন্তু উনি তো অফিশিয়ালি কেসটা তদন্ত করছেন না, তদন্ত করছি আমি।"

রুহিন চুপ মেরে থাকলো।

"আপনার পছন্দ না হলেও কথাটা আমাকে আবার বলতে হবে, মিঃ মালিক।"

আইনের কারবারি হয়ে রুহিন জানে ইনভেস্টিগেটরের কথা ঠিক। সংক্ষেপে পুরো ঘটনাটি বললো সে। বলতে গিয়ে গলা শুকিয়ে এলো, এক গ্লাস পানিও খেলো।

তার কথা শেষ হলে চুপচাপ ভেবে গেলো আমিনুল। "স্যারের সাথে আজ দেখা করবেন?" অবশেষে জানতে চাইলো সে।

"হ্যা।"

"কখন?"

“একটু পরই।”

“তাহলে তো আপনাকে বেশিক্ষণ আটকে রাখা ঠিক হবে না,” বললো ডিবি’র কর্মকর্তা। “ইচ্ছে করলে আপনি এখনই চলে যেতে পারেন। আপনার সাথে আমার কাজ আপাতত শেষ। পরে দরকার হলে আবার কথা বলবো।”

ব্যারিস্টার রুহিন মালিক চেয়ে রইলো ইনভেস্টিগেটরের দিকে। তারপর কিছু না বলেই উঠে দাঁড়ালো। “ওকে, আমি যাচ্ছি।” দরজার দিকে পা বাড়ালো সে।

“থ্যাঙ্কস ফর কামিং,” আমিনুল বলে উঠলো।

অধ্যায় ১৮

ড্রইংরুমে বসে সাবেক ইনভেস্টিগেটর চা খাচ্ছে আর ভাবছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো তার ভাবনায় ব্যারিস্টারের কেসটা নেই। নিজের ঘর থেকে মোবাইলফোনটা কিভাবে চুরি হলো এ নিয়ে কোনো কুলকিণারা করতে পারে নি এখনও। ব্যাপারটা আজ ক'দিন ধরেই তাকে খোঁচাচ্ছে। যখনই একটু অবসর পাচ্ছে এটা নিয়ে ভাবছে সে।

এখন অবশ্য তার সাথে সাথে আইনস্টাইনও ভেবে যাচ্ছে। বরং বলা চলে তার চেয়ে বেশিই ভাবনায় পড়ে গেছে ছেলেটা। আজ দুপুরের দিকে নাকি সে লগ্গি দিয়ে জানালার সামনে থেকে চেষ্টা করে দেখেছিলো মোবাইলফোনটা নেয়া যায় কিনা। ফলাফল হতাশাজনক।

এখন মেঝের কার্পেটের উপর বসে গালে হাত দিয়ে কেএসকের দিকে উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে সে।

"তাইলে লগ্গি দিয়া সম্ভব না," অনেকটা আপন মনে বললো কেএস খান।

মাথা দোলালো আইনস্টাইন। একদমই সম্ভব না।

চায়ের কাপে চুমুক দিলো সে। "আমি আগেই জানতাম এইটা সম্ভব না।"

কথাটা শুনে আইনস্টাইন পিটপিট করে তাকালো তার দিকে। "তাইলে কেমনে চুরি করলো, স্যার?"

কেএসকে সেটাই ভেবে যাচ্ছে। এই কেসটা আসলে ব্যারিস্টারের কেসের চেয়েও বেশি জটিল। এখানে দুটো প্রশ্নের জবাব খুঁজে বের করতে হবে–কে এবং কিভাবে। চুরিটা কে করলো, কিভাবে করলো।

"মনে হইতাছে কেসটা খুব ভুগাইবো," উদাস হয়ে বললো সে।

মাথা নেড়ে সায় দিলো আইনস্টাইন। "চোরটা অনেক চালাক। কেমনে যে চুরি করলো মাথায় কিছুই ঢুকতাছে না।"

“খালি চালাক হইলে তো হইবো না, ওর লম্বা একটা হাতও থাকন লাগবো।”

“অনেক লম্বা হাত!” বিস্ময়মাখা কণ্ঠে বললো ছেলেটা।

“কিন্তু এতো লম্বা হাত তো কোনো মানুষের নাই,” চায়ে আবারো চুমুক দিলো সাবেক ইনভেস্টিগেটর।

“আমি তো বাপের জনমেও কুনো মাইনষের এতো লম্বা হাত দেখি নাই।”

“তার মাইনে চোরটা ঘরে ঢুকছিলো,” ভাবনায় ডুবে থেকে বললো কেএসকে।

“কিন্তু কেমনে ঢুকলো, স্যার?”

“সেইটা-ই তো বুঝতে পারতাছি না।”

ঠিক এ সময় দরজায় নক্ করার শব্দে তারা দু'জনেই তাকালো সেদিকে। দেখতে পেলো ব্যারিস্টার রুহিন মালিক খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

“আসেন আসেন,” ব্যারিস্টারকে দেখে বলে উঠলো কেএসকে।

রুহিন মালিক মলিন হাসি দিয়ে ঘরে ঢুকলো। ডিবির ইন্টেরোগেশন রুম থেকে বের হয়ে সোজা চলে এসেছে এখানে। কেএসকের পাশের সোফায় বসে পড়লো সে।

“তুই এখন যা। আমরা এই কেসটা নিয়া পরে ভাবুম নে,” আইনস্টাইনকে বললো কেএস খান।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে চলে গেলো ছেলেটা।

“কোন কেসের কথা বলছেন?” জানতে চাইলো ব্যারিস্টার। এই লোক কি তার কেসটা নিয়ে কাজের ছেলের সাথে ডিসকাস করছে? অদ্ভুত! ভাবলো সে।

“কয়দিন আগে আমার ঘর থেইকা মোবাইলফোন চুরি হইছিলো, ওইটা এখনও বাইর করবার পারি নাই।” কথাটা বলে এমনভাবে হাসলো যেনো কেস সমাধান না করতে পারাটাও মজার ব্যাপার।

“ও,” ব্যারিস্টার আর কিছু বললো না।

“এখন বলেন, ইন্টেরোগেশন কেমন হইলো?”

“বুঝতে পারছি না,” বললো রুহিন। “আপনার স্টুডেন্ট মনে হয়

আমার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না ।"

হেসে ফেললো কেএসকে। "বিশ্বাস করনের কোনো কারণ তো দেখতাছি না ।"

অবাক হলো ব্যারিস্টার। "আপনিও তাই মনে করছেন?"

"আহ্, এইটা তো স্বাভাবিক। ইনভেস্টিগেশনের এই পর্যায়ে ও ক্যান বিশ্বাস করতে যাইবো। আরেকটু আগাক। পুরা বিষয়টা বুঝুক। তারপর দেখা যাইবো ।"

মনে হলো তার এ কথাটা পছন্দ হয় নি ব্যারিস্টারের।

"আইনস্টাইন, আরেক কাপ চা দে," জোরে বললো কেএসকে।

"চা কি আমার জন্য?" জানতে চাইলো রুহিন।

"হ ।"

"আমি চা খাবো না ।"

কেএস খান কথাটা আমলেই নিলো না। "আইনস্টাইন?"

"দিতাছি ।" ঘরের ভেতর থেকে জবাব দিলো ছেলেটা।

"চা ছাড়া তো আমি আর কিছু দিয়া মেহমানদারি করবার পারি না। বুঝবারই পারেন। একা থাকি ।" কথাটা বলেই এমনভাবে হাসলো যেনো একা থাকাটাও খুব সুখের বিষয়। "চা খান। ভালা লাগবো। দেইখা তো মনে হইতাছে মুড অফ ।"

মাথা দুলিয়ে বললো ব্যারিস্টার, "না, ঠিক তা নয়..."

আইনস্টাইন চলে এলো চা নিয়ে।

ছেলেটা চলে যাবার পর রুহিন বললো, "ওর নাম কি সত্যিই আইনস্টাইন?"

চায়ে চুমুক দিয়ে মাথা দোলালো কেএসকে। "আরে না ।"

"আপনি দিয়েছেন?"

"হ ।"

"ওর আসল নাম কি?"

চায়ের কাপটা মুখের কাছে ধরেই বললো, "আইনউদ্দীন ।"

এবার ব্যারিস্টারও হেসে ফেললো। "ভালোই। আসলের সাথে মিল দিয়েই রেখেছেন ।"

কেএসকে কিছু বললো না, শুধু হাসলো।

"ওকে পেলেন কোথায়?"

"এই তো, আমার বাড়ির সামনে দাঁড়ায়া দাঁড়ায়া কাঁদতে ছিলো।"

ব্যারিস্টার আগ্রহী হয়ে উঠলো। "কেন?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো কেএসকে। "ওর বাপে আগেই আরেকটা বিয়া কইরা ওর মায়েরে রাইখা চইলা গেছিলো...পরে মায়েও একটা বিয়া করে...ট্রাকের হেল্পার...ওরে মাইরা-টাইরা বের কইরা দিছিলো আর কি..."

"ও," বললো রুহিন মালিক। "তারপর?"

"আমি ওরে আমার বাড়িতে আইনা রাখলাম।"

"ওর খোঁজে কেউ আসে নি?"

"আমি ভাবছিলাম ওর মায়ে হয়তো খুঁজতে আসবো...কিন্তু আর আসে নাই।"

চুপ মেরে রইলো রুহিন। তার বয়স যখন মাত্র তেরো তখনই তার বাবা-মায়ের ডিভোর্স হয়ে যায়। বাবা আরেকটা বিয়ে করে, আর তার মাও খুব বেশিদিন একা থাকে নি। তিন-চার বছর সৎবাবার সংসারে ছিলো সে। তারপর প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর বাবার সম্পত্তি থেকে বিরাট একটা অংশ পেয়ে গেলে সেই অল্পবয়সেই একা একা চলতে শুরু করে। অবশ্য তার এক ফুপু যতোদিন বেঁচে ছিলো ততোদিন তার অভিভাবক ছিলো। বেচারি তিন বছর আগে মারা যায়।

"চা তো ঠাণ্ডা হইয়া যাইতাছে।"

কেএসকের কথায় সম্বিত ফিরে পেলো ব্যারিস্টার। সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রসঙ্গে চলে এলো সে। "আপনি বলেছিলেন আজ আমরা ফিল্ডে কাজ করবো, আমি তো খুব এক্সাইটেড।"

"হ, ঘরে বইসা বইসা তো আর মার্ডার কেস সল্‌ভ করন যায় না। অ্যাস্ট্রোফিজিক্স হইলে না-হয় কথা ছিলো। অঙ্ক কইষা কইষা সব বাইর কইরা ফালাইতাম।"

রুহিন চায়ে চুমুক দিলো।

"এখন আমরা একটা কাজে বাইর হমু। আপনে তো গাড়ি নিয়া আসছেন, তাই না?"

"হ্যা।"

"ভালাই হইলো।"

"আমরা কোথায় যাবো এখন?" রুহিন জানতে চাইলো। তাকে খুব রোমাঞ্চিত মনে হচ্ছে।

"লালমাটিয়ায়।"

"কার কাছে?"

চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখলো কেএসকে। "আসেন। সব জানতে পারবেন।"

ব্যারিস্টার চায়ের কাপটা রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

কেএসকে জোরে বললো, "আইনস্টাইন, আমি বাইরে যাইতাছি। দরজাটা লাগায়া রাখ।"

রুহিন মালিককে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো সে।

অধ্যায় ১৯

অনেকক্ষণ চোখ বন্ধ করে ঘুমের মতো পড়ে থাকার পর চোখ খুললো মাহবুব। তার ঠোঁটে হাসি দেখা গেলো। "আসো," বললো সে।

ঘরের এককোণে শায়লা দাঁড়িয়ে আছে! আজ খুব সেজেগুঁজে এসেছে। তাকে দেখে কী যে ভালো লাগছে তার।

"আসো!" আবার বললো মাহবুব।

শায়লা চুপচাপ তার পাশে এসে দাঁড়ালো।

"বসো।"

মেয়েটা বসে পড়লো তার পাশে।

মাহবুব টের পেলো সারা ঘর পারফিউমের গন্ধে ভরে গেছে। এটা কোন্ পারফিউম? সে গন্ধ শুকে চেনার চেষ্টা করলো। *মার্লিন?*

প্যারিস থেকে তার এক বন্ধু এনে দিয়েছিলো। শায়লা খুব পছন্দ করেছিলো পারফিউমটা। কিন্তু এতোদিনেও ওটা শেষ হয় নি?

"অ্যাই, মার্লিন দিয়েছো?"

শায়লা মৃদু হেসে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

মার্লিনের ঘ্রানটা দারুণ কিন্তু শায়লার শরীরের ঘ্রানের সাথে মিশে যাবার পর ওটা হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য। মাহবুবের খুব ইচ্ছে করলো তাকে জড়িয়ে ধরতে কিন্তু অনেক কষ্টে ইচ্ছেটাকে দমন করলো সে। এমনটা করলে শায়লা চলে যায়। আর সহজে ফিরে আসে না।

"তুমি খুশি হও নি?" জিজ্ঞেস করলো মেয়েটাকে।

মাথা নীচু করে রাখলো সে।

"হও নি?" উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো সদ্য হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফেরা লোকটি।

আল্তো করে মাথা নেড়ে সায় দিলো কেবল।

"আমার অপারেশন নিয়ে খুব চিন্তায় ছিলে?"

আবারো মাথা নেড়ে সায় দিলো শায়লা।

"আরে এটা এমন কিছু না। সামান্য একটা অপারেশন। আমি কোনো ব্যথা পাই নি। সত্যি বলছি। একটুও পাই নি। অ্যানেস্থেশিয়া দিয়েছিলো তো।"

শায়লা তার দিকে তাকালো।

"এই যে, দেখছো না আমি কতো তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছি। হাটতে পারি, চলতে-ফিরতে পারি। কোনো সমস্যা হয় না। কয়েকদিন পর অপারেশনের দাগ ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।"

মনে হলো শায়লা তার পেটের দিকে তাকালো।

"তুমি দেখতে চাইছো?"

কিছু বললো না মেয়েটি।

শার্টটা তুলে অপারেশনের জায়গাটা দেখালো মাহবুব। ওখানে এখন ছোট্ট একটা ব্যান্ডেজ-টেপ লাগানো।

"অ্যাপেনডিক্সের অপারেশন খুব সিম্পল হয়, বুঝলে?"

শায়লার অভিব্যক্তি দেখে বোঝা গেলো না সে বুঝেছে।

"তুমি কি আমাকে নিয়ে চিন্তিত?"

মাথা নীচু করে ফেললো মেয়েটা।

"তুমি কোনো চিন্তা করবে না। আমি একদম ঠিক আছি।"

শায়লা বড় বড় চোখে তাকালো তার দিকে। খুবই মায়াবি চোখ।

"ওসব নিয়ে একটুও ভাববে না। আমি সব সামলে নেবো। কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না।"

মনে হলো শায়লার ঠোঁটে এক চিলতে হাসি দেখা গেলো।

"তুমি কি আমাকে কখনও স্পর্শ করতে দেবে না?" আকুল হয়ে বললো মাহবুব। "তোমাকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে। খুব।"

আস্তে আস্তে মাথা দোলালো শায়লা।

"কেন!" কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বললো সে। "আমি কি তোমার পর হয়ে গেছি?"

শায়লা আবারো মাথা দোলালো।

"তাহলে?"

ঠিক তখনই সমস্ত নীরবতা চুরমার করে দিয়ে মোবাইলফোনটা বেজে

উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে পারফিউমের গন্ধটা মিইয়ে গেলো বাতাসে। ফোনটা বিছানার উপরেই রাখা আছে, মাহবুব সেদিকে তাকালো। ইচ্ছে করলো আছাড় মেরে ফোনটা গুড়ো গুড়ো করে ফেলে। ডিসপ্লের দিকে তাকালো রেগেমেগে। একটা অপরিচিত নম্বর। বিরক্ত হয়ে ফোনটা তুলে নিলো সে।

"হ্যালো?" তার কণ্ঠ খুবই ঝাঁঝালো।

"আমি ডিবি থেকে বলছি," ফোনের ওপাশ থেকে বলা হলো। "আপনি মাহবুব সাহেব বলছেন?"

চোখমুখ শক্ত করে সে বললো, "হ্যা।"

"আমার নাম আমিনুল ইসলাম..."

আরে ব্যাটা, তোর নাম আমিনুল ইসলাম হোক আর জামায়াতে ইসলাম, তাতে আমার কী! রাগে গজ গজ করতে করতে মনে মনে বললো মাহবুব।

"...রফিক হাওলাদারের কেসটা এখন আমিই তদন্ত করছি।"

"বুঝলাম, তো আমাকে কেন ফোন করেছেন?"

"আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাইছি।"

ভুরু কুচকে উঠলো তার। "আমার সাথে? কেন?"

"দরকার আছে।"

"কি দরকার?"

"সেটা দেখা হলেই বলবো। আপনাকে যে একটু আমাদের কার্যালয়ে আসতে হবে।"

নীচের ঠোঁট দুটো কামড়ে ধরলো মাহবুব। "আপনারা ঐ ব্যারিস্টারের আষাঢ়ের গল্পটা বিশ্বাস করে বসে আছেন, তাই না?"

"না।" বেশ দৃঢ়ভাবেই বললো আমিনুল। "আমরা কারো কথা শুনেই বিশ্বাস করি না। খতিয়ে দেখি। আর সেজন্যেই আপনার সাথে কথা বলতে চাচ্ছি।"

"আমি যখন হাসপাতালে তখন কিন্তু পুলিশের কাছে যা বলার বলেছি।"

"হ্যা, তা জানি।"

"তাহলে আবার কেন জিজ্ঞেস করার দরকার পড়লো?"

"কারণ কেসটা এখন ডিবি'তে ট্রান্সফার করা হয়েছে।"

জাল

তিক্ততায় চোখমুখ বিকৃত হয়ে গেলো মাহবুবের।

“আপনি কি আজ বিকেলে একটু আসতে পারবেন?”

“আপনি নিশ্চয় জানেন মাত্র গতকাল আমি হাসপাতাল থেকে রিলিজ পেয়েছি। এখনও পুরোপুরি সুস্থ নই। আমার পক্ষে বাইরে বের হওয়া সম্ভব নয়।”

“ঠিক আছে, আপনাকে তাহলে আসতে হবে না। আমি নিজেই আপনার সাথে দেখা করবো।”

ধুত শালা! মনে মনে ক্ষেপে উঠলো মাহবুব।

“আপনার বাসার ঠিকানাটা আমাকে দিন।”

একটু চুপ থেকে বাসার ঠিকানাটা বলে দিলো সে। ওপাশ থেকে আমিনুল জানিয়ে দিলো আজ বিকেল পাঁচটার দিকে আসছে।

ফোনটা আছাড় মেরে বিছানার উপর রেখে দিলো। ডিবি অফিসে গেলেই ভালো হতো। এই শালার পুলিশ এখন তার বাড়িটাও চিনে যাবে। তারপরই মুচকি হাসি ফুটে উঠলো তার ঠোঁটে। সমস্যা নেই। তার আরো একটা ঠিকানা আছে।

তারপরই মনে পড়ে গেলো শায়লার কথা। মেয়েটা তার পাশেই বসে ছিলো এতোক্ষণ কিন্তু এখন আর নেই!

পুরো ঘরটা ফাঁকা।

আবার চোখ দুটো বন্ধ করে শুয়ে পড়লো সে।

শায়লা, প্লিজ! আসো! প্লিজ!

অধ্যায় ২০

ব্যারিস্টার রুহিন মালিক গাড়ি চালাচ্ছে। তার পাশে বসে আছে কেএসকে। রুহিন ভেবেছিলো লালমাটিয়ায় কাজ সারতে সারতে বুঝি অনেক সময় লেগে যাবে কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে মাত্র আধঘণ্টায় কাজ শেষ করে ফেলে সাবেক ইনভেস্টিগেটর। ভদ্রলোকের কাজকর্ম কেমন জানি, রুহিন মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না। যে ডাক্তার মাহবুব সাহেবের অপারেশন করেছিলো তার সম্পর্কে এটা ওটা জেনে নিয়েছে লোকজনকে জিজ্ঞেস করে।

মাহবুবকে বাদ দিয়ে ঐ ডাক্তারের পেছনে কেন লাগলো? এ প্রশ্নের জবাব এখন পর্যন্ত সে জানে না। আসল কালপ্রিট তো মাহবুব। তার ব্যাপারে খোঁজ নেবে না?

তবে এটাও তো ঠিক, কেএস খানের মতো ইনভেস্টিগেটরকে বলে দিতে হবে না কিভাবে তদন্ত করতে হবে।

লালমাটিয়ায় খুব অল্প সময়ে কাজ শেষ হবার পরই রুহিনের মাথায় একটা আইডিয়া আসে। ইনভেস্টিগেটর ভদ্রলোককে সে জিজ্ঞেস করেছিলো তার আর কোনো কাজ আছে কিনা। কেএসকে বলেছিলো নেই। এখন সোজা বাসায় চলে যাবে। কথাটা শুনে রুহিন বলেছিলো, ভালোই হলো। ওখান থেকে অন্য একটা জায়গায় তাকে নিয়ে যাবে আজ। খুব মজা হবে।

"অন্য একটা জায়গা মানে?" কেএসকে বুঝতে না পেরে বলেছিলো।

ব্যারিস্টার ঠোঁটে রহস্যমাখা হাসি এঁটে তখন বলে, "আসেন না, সবই জানতে পারবেন, দেখতে পাবেন।"

কথাটা শুনে রুহিন মালিকের দিকে চেয়ে থাকে কেএস খান। তারপর ফিক করে হেসে দেয়। "পার্টি-ফার্টিতে কিন্তু যাইবার পারুম না।"

অবাক হয়েছিলো রুহিন। "পার্টির কথা কেন বললেন? আমাকে দেখে

কি পার্টিবাজ বলে মনে হয় নাকি আপনার?"

মুচকি হেসে কেএসকে বলেছিলো, "খালি পার্টিবাজ না, ফুর্তিবাজও মনে হয়।"

ব্যারিস্টার কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে হেসে ফেলেছিলো। হাজার হোক, ভদ্রলোক মিথ্যে বলে নি। হা-হা-হা করে হেসে বলেছিলো সে, "ভালোই বলেছেন। মনে হচ্ছে আপনার অবজার্ভেশন খুব ভালো।"

কেএসকে আর কিছু বলে নি।

"পার্টি না, অন্য কিছু," রুহিন তাকে আশ্বস্ত করে বলে তখন।

"আল্লায় জানে আপনি আমারে কই নিয়া যাইবেন," হেসেই বলেছিলো ইনভেস্টিগেটর।

"ডোন্ট ওরি, মিঃ খান। আই থিঙ্ক, জায়গাটা আপনার ভালো লাগবে।"

"ভালা লাগলেই ভালা।"

ভদ্রলোককে আশ্বস্ত করে রওনা হয় তারা। এখন যাচ্ছে গুলশানের দিকে।

অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর রুহিন মুখ খুললো। "আপনার বয়স কতো হলো?"

"আ?" যেনো চিন্তার মধ্যে ডুবে ছিলো কেএসকে।

"বলতে অসুবিধা আছে?"

"আরে না। আমি কি মাইয়া মানুষ নাকি," কথাটা বলেই হেসে ফেললো সে। "আজকাল তো মাইয়া মানুষও বয়স লুকায় না। দেখেন না, ম্যাডোনা কেমনে গর্ব নিয়া কয়, তার বয়স এখন তিপান্ন।"

"বাপ্‌রে, আপনি দেখি ম্যাডোনার খোঁজখবরও রাখেন," গাড়ি চালাতে চালাতে বললো রুহিন।

"আপনার কি ধারণা আমি বুড়া হইয়া গেছি?"

"আরে না। আমি এটা মোটেও মনে করি না। আপনি আমার চেয়ে খুব বেশি বড় হবেন না।"

"তা তো বলতে পারুম না তবে আমি যে ম্যাডোনার চেয়ে অনেক ছোটো সেইটা কিন্তু শিওর।"

হা-হা-হা করে হেসে উঠলো রুহিন।

"পুরা দশ বছরের।"

রাস্তা থেকে চোখ সরিয়ে পাশে বসা কেএসকের দিকে তাকালো ব্যারিস্টার। "তাহলে তো আমার চেয়ে খুব বেশি বড় না।"

মুচকি হাসলো সাবেক ইনভেস্টিগেটর। "আপনেরে দেইখা অবশ্য অনেক ইয়াং লাগে। খালি..."

পাশ ফিরে তাকালো রুহিন। "কি?"

"কাঁচাপাকা দাড়িটা...ওইটা যদি কলপ লাগায়া রাখেন তাইলে আরো ইয়াং লাগবো।

"হা-হা-হা," হেসে ফেললো ব্যারিস্টার। "এটা আমার স্টাইল, মিঃ খান।"

"তা বুঝবার পারছি।"

রাস্তার দিকে চোখ রেখেই রুহিন মিটিমিটি হাসতে লাগলো।

অধ্যায় ২১

একই কথা দু'বার বলতে বাধ্য হলো মাহবুব আনাম চৌধুরি। একটু আগে আমিনুল আর তার এক সহযোগী এসেছে। তাপরই শুরু করেছে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। মাহবুব সাহেব যে একটু রুষ্ট হয়েছে সেটা বুঝতে পারছে ডিবির দুই কর্মকর্তা।

"তাহলে ব্যারিস্টার রুহিন মালিক কেন আপনার কথা বলছেন?" সব শোনার পর আমিনুল বললো। "মানে, এর পেছনে কী কারণ থাকতে পারে বলে আপনি মনে করেন?"

মাথা দোলালো সদ্য হাসপাতাল থেকে মাহবুব সাহেব। "আমি আসলেই জানি না। হয়তো অনেক দিন আগে আমি তার সাথে দুর্ব্যবহার করেছিলাম সেটার জন্য। কিংবা রফিককে কোনো কারণে খুন করার পর বাঁচার জন্য আমার নামটা ব্যবহার করেছে, কারণ সে ভালো করেই জানে রফিকের বিরুদ্ধে আমি কেস করে হেরে গেছিলাম। তার উপরে আমার রাগ ছিলো। পুলিশকে এসব বললে হয়তো তারাও বিশ্বাস করবে," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডিবির দুই কর্মকর্তার দিকে তাকালো সে। "এখন তো দেখছি তার ধারণাই ঠিক।"

আমিনুল মাথা দোলালো। "মিঃ চৌধুরি, `আমরা কারোর কথায় প্রভাবিত হই না। বিচার বিশ্লেষণ করে তারপর বিশ্বাস করি।"

"কেমন বিচার করেন সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি," নীচুস্বরে বললো মাহবুব। "যে লোক হাসপাতালের অপারেশন টেবিলে ছিলো তাকেই সন্দেহ করে বসে আছেন।"

মাথা দোলালো আমিনুল। "আপনি ব্যাপারটা অন্যভাবে দেখছেন...আসলে তদন্ত করতে গেলে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সাথেই কথা বলতে হয়।"

"আমি এই কেসের সংশ্লিষ্ট পক্ষ?"

"ব্যারিস্টার যদি আপনার বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ না আনতো তাহলে এসব করার কোনো দরকার ছিলো না।"

"মনে হচ্ছে আপনারা আসামীর কথাকেই বেশি গুরুত্ব দেন," বলেই আক্ষেপে মাথা দোলালো মাহবুব। "কেন দেবেন না, সে তো আর যে-সে লোক নয়। জাঁদরেল ব্যারিস্টার। তার কথার অবশ্যই মূল্য আছে।" শেষ বাক্যটি শ্লেষের সাথে বললো।

আমিনুল বুঝতে পারলো সরাসরি কাজের কথায় চলে আসাই ভালো। তাদের কথাবার্তা অন্যদিকে চলে যাচ্ছে।

"আমি আসলে জানতে চাইছি, কয়েক বছর আগে ঐ মামলাটার পর ব্যারিস্টার আর রফিক সাহেবের সাথে আপনার কোনো ঝামেলা হয়েছিলো কিনা?"

আমিনুলের দিকে তাকিয়ে রইলো মাহবুব। তারপর মুখে তিক্ততা ফুটে উঠলো। "মামলায় হেরে যাওয়ার পর ওই দুই নরপশুর চেহারাও আমি কোনোদিন দেখি নি।"

"মামলায় হেরে যাবার পর আপনি মানসিকভাবে..." কথাটা শেষ না করে চুপ মেরে গেলো ইনভেস্টিগেটর।

মাথা নেড়ে সায় দিলো মাহবুব। "প্রায় দুই বছর ধরে আমি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাই। ব্যবসা-বাণিজ্য সব শেষ হয়ে যায়। ব্যাঙ্কে কিছু জমানো টাকা ছাড়া বলতে গেলে আমি দেউলিয়া হয়ে পড়ি।"

আমিনুল এসব তথ্য জানে। ভদ্রলোকের জন্য তার সহমর্মিতাও হলো। "কিন্তু ওখান থেকে বাইরে আসার পর...আই মিন, সুস্থ হবার পর কি ওদের সাথে আপনার আর যোগাযোগ হয় নি?"

মাথা দোলালো মাহবুব আনাম চৌধুরি। "ঐ ব্যারিস্টার কি আপনাদেরকে এ কথা বলেছে নাকি?"

"না, না," আমিনুল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো। "উনি অবশ্য এরকম কথা বলেন নি।"

"সত্যি বলতে কি, আমি ঐ দু'জনের কথা ভুলেই গেছিলাম। সুস্থ হবার পর নতুন করে জীবন শুরু করার চেষ্টা করছিলাম।"

আমিনুল একটু চুপ থেকে আবার বললো, "এটা তো ঠিক, আপনি ওই দু'জনকে খুব ঘৃণা করেন।"

"অবশ্যই করি," চট করে বলে উঠলো মাহবুব সাহেব। "আমার চেয়ে বেশি আর কে ওদেরকে ঘৃণা করবে? কিন্তু তার মানে এই না, আমি ওদেরকে খুন করতে যাবো।"

আমিনুল কিছু বললো না।

"আপনারা আমার মতো অসুস্থ মানুষের পেছনে অযথাই সময় নষ্ট করছেন। ঐ ব্যারিস্টারকে ঠিকমতো ধরুন, সব সত্য বের হয়ে যাবে। ওই ব্যাটা মনে করছে সে আইনের সব অলিগলি বোঝে। পুলিশ তার বালও ছিঁড়তে পারবে না।"

আমিনুল তার সঙ্গির দিকে তাকালো, তারপর ফিরলো মাহবুব সাহেবের দিকে। "আপনি খামোখাই রেগে যাচ্ছেন। কেসটার তদন্ত করতে হলে সব পক্ষের সাথেই আমাদের কথা বলা দরকার। এটা আপনাকে বুঝতে হবে। আর কি করতে পারি, কি ছিঁড়তে পারি সেটা তদন্ত শেষ হলেই বুঝতে পারবেন।"

তাচ্ছিল্যভাবে মুখটা বিকৃত করে সরিয়ে নিলো মাহবুব।

"আপনি ঐদিন হাসপাতালে একাই গিয়েছিলেন, তাই না?"

আমিনুলের দিকে তাকালো ভদ্রলোক। "হ্যা।"

"কেন?"

বাঁকা হাসি হাসলো মাহবুব। "হাসপাতালে একা একা যাওয়াটা কি সন্দেহজনক নাকি?"

"না, তা বলছিল না..."

"তাহলে জিজ্ঞেস করছেন যে?"

"মানে, সাধারণত রোগির সাথে তার পরিচিত লোকজন, আত্মীয়স্বজন থাকে, তাই বলছিলাম..."

"আমার তো সেরকম কেউ নেই, আমি কী করবো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো আমিনুল। "তা ঠিক। কেউ না থাকলে তো কিছু করার নেই।"

"দেখুন, একটা কথা স্পষ্ট করে বলে দেই। আমি দুই বছর মানসিকভাবে ভীষণ ডিস্টার্ব ছিলাম। সোজা বাংলায় যাকে বলে পাগল। আমি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছিলাম। এরকম লোক সুস্থ হয়ে উঠলেও আমাদের সমাজ তাকে স্বাভাবিকভাবে নেয় না। আমার বেলায়ও সেটা হয়েছে।"

“তার মানে আপনার পরিচিতজনদের সাথে আপনার তেমন একটা সম্পর্ক ছিলো না?”

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে সায় দিলো মাহবুব সাহেব। “সবাইকে আমার চেনা হয়ে গেছে!”

“আপনার পরিবারের লোকজন, বাবা-মা, ভাই-বোন, এরা?”

গম্ভীর হয়ে গেলো সে। “আমার বাবা-মা মারা গেছেন অনেক আগে। আর ভাই-বোনদের কথা বলছেন–আমরা এক ভাই এক বোন। ছোটো বোনটা বিয়ের পর কানাডায় সেটল্ড হয়েছে। দেশে কিছু আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধব ছাড়া আমার কেউ নেই। সুস্থ হবার পর ওদের সাথে আর যোগাযোগ করি নি আমি। ওরাও আমার খোঁজখবর নেয় নি।”

চুপচাপ শুনে গেলো আমিনুল, ভেবে পেলো না আর কি প্রশ্ন করবে।

অধ্যায় ২২

গুলশানের একটি শিশা পার্লারে বসে আছে ব্যারিস্টার রুহিন মালিক আর কেএসকে। একটু আগে তারা এখানে এসে পৌঁছেছে। চারপাশে অসংখ্য ছেলেমেয়ে হুক্কার মতো একটা জিনিস টেনে যাচ্ছে।

ঘরের মৃদু আলো আর সুগন্ধী ধোঁয়ায় পুরো পরিবেশটা কেমন অদ্ভুত লাগছে সাবেক ইনভেস্টিগেটরের কাছে। বিস্ময়মাখা দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছে আশেপাশে। শিশাসেবীদের মধ্যে টিনএজারদের সংখ্যাই বেশি।

"আপনে আমারে হুক্কা খাইতে নিয়া আসছেন?" ফিসফিসিয়ে রুহিন মালিককে বললো সে।

"হুক্কা না, শিশা," শুধ্রে দিলো তরুণ ব্যারিস্টার।

"শিশা কন আর তামা কন, জিনিসটা তো হুক্কাই।"

কেএসকের কথায় হেসে ফেললো রুহিন। "এটাকে বলতে পারেন মডার্ন হুক্কা। আজকাল খুব চলছে। ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয়।"

"আরে এইসব অন্তঃসারশূন্য ইয়াং জেনারেশনের কাছে তো ইয়াবাও খুব জনপ্রিয়," টিপ্পনী কাটলো মিঃ খান। "ওগো খালি একটা উসিলা লাগে, বুঝলেন?"

"হুম, বয়সের দোষ বলতে পারেন।"

"আরে বয়সের দোষ না, এইটারে কয় কলোনিয়াল হ্যাংওভার। ইংরেজরা গেছে কিন্তু ওগোর প্রতি আমাগো যে সম্ভ্রম, যে দৃষ্টিভঙ্গি ওইটা আরো বাইড়া গেছে। হুক্কারে একটু ঝাক্কিঝুক্কি মাইরা রঙ লাগায়া শিশা বানাইছে, আর ঐ জিনিস হুমরি খায়া খাইতাছে পোলাপানে।"

ব্যারিস্টার হেসে বললো, "শিশা কিন্তু ইংল্যান্ড থেকে আসে নি, টার্কি থেকে এসেছে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো মিঃ খান। "এই হলো আরেক সমস্যা। কতো আর

ইউরোপ-আমেরিকানগিরি করন যায়, কন? একটু চেঞ্জ দরকার না?"

কেএসকের কথায় খুব মজা পাচ্ছে রুহিন।

"তাই গলায় আরবি গামছা 'মুফতি' পেচাইয়া স্টাইল করে...টার্কি থেইকা হুক্কা আইনা শিশা নামে টানে।"

"বাপ্‌রে! আপনি তো দেখি এই জেনারেশনের উপর চটে আছেন।"

"আরে, না। আমি কেন ওগোর উপর চেত্‌তে যামু," একটু থেমে গলারস্বর নীচু করে বললো, "সত্য কথা কি জানেন?" ব্যারিস্টারের জবাবের অপেক্ষা না করেই বললো আবার, "ওরাই আমাগো উপরে চেইতা আছে। ব্যাক-ডেটেড কইয়া গালি দেয়।"

হেসে ফেললো রুহিন। "কী যে বলেন না।"

"আমার তো খুব আনইজি লাগতাছে, ব্যারিস্টার সাহেব।"

"কেন?"

"দেহেন না, সব টিনএজার। আমার বয়সি কয়জন আছে?"

হাসলো রুহিন মালিক। "আমার বয়সিও খুব বেশি নেই। বাট আই ডোন্ট ফিল বদার।"

"চ্যাংড়া পোলাপানগুলা আমার দিকে বার বার তাকাইতাছে," চারপাশের দিকে ইঙ্গিত করে বললো সাবেক ইনভেস্টিগেটর।

"ইগনোর দেম, অ্যান্ড এনজয় দ্য মোমেন্ট।"

"আরে আমি ইগনোর করলে কি হইবো, ওরা তো আমারে ইগনোর করতাছে না।"

এমন সময় দুটো শিশা নিয়ে হাজির হলো সার্ভিসম্যান। তাদের সামনে রেখে চুপচাপ চলে গেলো ছেলেটা। ব্যারিস্টার একটা শিশার পাইপ নিয়ে আয়েশ করে টান দিলো। "নিন।"

কেএসকে ইতস্তত করে শিশার পাইপটা হাতে নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। গ্রামেগঞ্জের হুক্কার মতোই, তবে বেশ সুন্দর নক্সা করা ডিজাইন। স্বচ্ছ ট্যাঙ্কিটার ভেতরে লালচে রঙের পানি দিয়ে ভরা। কলকিটা রাঙতা কাগজে মোড়ানো। ওটার মধ্যে বড় একটা কয়লার টুকরো জ্বলছে।

"কি হলো, টানুন," তাড়া দিলো ব্যারিস্টার।

কেএসকে আস্তে করে একটা টান দিলো। সুগন্ধী ধোয়া ছাড়া আর কিছু টের পেলো না।

"ভাল্লাগছে না?" শিশা টানতে টানতে জিজ্ঞেস করলো রুহিন।

"বুঝতাছি না," সহজ ভঙ্গিতে বললো সে।

"টানতে থাকুন, ভালো লাগবে।"

কেএস খান পর পর তিনটা টান দিলো কিন্তু কিছুই অনুভব করতে পারলো না। তার কাছে মনে হলো এটা বেকুবদের জন্য। বড়লোকের ছেলেপেলেরা এখানে আসবে, চড়া মূল্যে শিশা খাবে আর ভাববে বিরাট কিছু একটা করে ফেলছে!

"ঐ ডাক্তার সম্পর্কে এতো খোঁজ নিচ্ছেন কেন?"

রুহিনের প্রশ্ন শুনে তার দিকে তাকালো। "দরকার আছে।" এর বেশি আর বললো না।

"আমাকে সেটা বলা যাবে না?"

"যাইবো না কেন, অবশ্যই যাইবো।" তারপর শিশায় একটা টান দিয়ে চিন্তাটা গুছিয়ে নিলো। "হাসপাতালের রেকর্ডে ডাক্তার মামুনের ঠিকানা দেয়া আছে মিরপুরে কিন্তু সে এখন ওইখানে থাকে না।"

রুহিন কিছু বললো না।

"এইটা একটা চিন্তার বিষয়।"

কেএসকে এমন সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললো যে ব্যারিস্টার অবাক না হয়ে পারলো না। ঢাকা শহরে যার নিজস্ব বাড়ি নেই সে ঠিকানা পরিবর্তন করতেই পারে। এটা আর এমন কি।

"ঐ ডাক্তার নিশ্চয় কয়েক বছর আগে হাসপাতালে জয়েন করেছে। এরপর হয়তো শিফট করেছে অন্য কোথাও?" বললো রুহিন।

শিশায় টান দিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো সাবেক ইনভেস্টিগেটর। মনে হচ্ছে চিন্তায় ডুবে যাবার উসিলা হিসেবেই শিশা টানছে এখন। হঠাৎ তার চোখ পড়লো পাশের টেবিলে দুটো অল্পবয়সি মেয়ের দিকে। একটা শিশা পালা করে টানছে তারা। একজনের পরনে জিন্স আর টি-শার্ট, অন্যজনের মাথায় হিজাব! মেয়ে দুটো ঘনিষ্ঠভাবে বসে আছে। চারপাশের সবাইকে তোয়াক্কা না করে তারা চুমু খেলো। একদম ঠোঁটে ঠোঁটে!

"আমি তো এরমধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা দেখতে পাচ্ছি না।"

চোখ সরিয়ে নিলো কেএসকে। "কি কন? পুরাই অস্বাভাবিক।"

"সেটা কি রকম?"

“আবার জিগায়,” শিশার পাইপটা নামিয়ে রাখলো। “মাহবুব সাহেবের অপারেশনটা কবে হইছে?”

“এই তো গত সপ্তাহে।”

“আমি কয়দিন আগে ডাক্তারের সাথে কথা বলছি, মনে আছে?”

“হুম, সেটা তো জানি।”

“তখন সে আমারে বলছে, অপারেশনের পর হাসপাতাল থেইকা বাইর হইয়া নিউমার্কেটে গেছিলো কিছু কেনাকাটা করতে, তারপর সোজা চইলা যায় মিরপুরের বাসায়।”

রুহিন বুঝতে পারলো এবার কিন্তু তার কাছে এখনও পরিস্কার নয়, এটা এমন কি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য!

মাথা দোলালো কেএসকে। “ডাক্তার কেন এইরকম একটা মিথ্যা বলতে গেলো?”

শিশার পাইপটা নামিয়ে রাখলো ব্যারিস্টার। “আপনি কি তাকে সন্দেহ করছেন?”

“কেউ মিথ্যা কথা বললে তারে সন্দেহ করুম না?”

মাথা নেড়ে সায় দিলো ব্যারিস্টার।

“ঐ ডাক্তার আবার বিয়াশাদি করে নাই,” শিশা টেনেই চলছে কেএসকে। “কিন্তু বয়স তো হইছে, নাকি?”

রুহিন বুঝতে পারলো না। ডাক্তার না-হয় তার থাকার জায়গা নিয়ে মিথ্যে বলেছে, এটা অস্বাভাবিক হিসেবে মেনে নেয়া গেলো কিন্তু তার বিয়ে না করাটা এমন কি বড় ঘটনা? এই শহরে এমন অনেকে আছে যারা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পরও বিয়ে-থা করে নি। সে নিজেও এদের মধ্যে পড়ে।

“সম্ভবত উনার এনগেজমেন্টের পর বিয়াটা ভাইঙা গেছে। কি কারণে বিয়াটা ভাঙলো সেইটা এখনও বুঝবার পারতাছি না।”

রুহিন আরো অবাক হলো। মাহবুব সাহেবের খোঁজখবর বাদ দিয়ে ডাক্তারের বিয়েশাদি নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছে দেখছি! ভদ্রলোক কি ধান ভানতে শিবের গীত গাইছে না?

“আপনি এসব কিভাবে জানলেন? ঐ ডাক্তার নিশ্চয় এটা বলে নি?”

“আরে না,” হেসে বললো কেএস খান। “এইটা আমারে কেউ বলে

নাই।"

"তাহলে?"

"এইটা আমার অনুমান," এক গাল ধোয়া ছেড়ে বললো সাবেক ইনভেস্টিগেটর।

"আপনি অনুমাণ করে এটা বের করলেন?" ব্যারিস্টার অবাক হলো।

শিশার পাইপটা মুখে দিয়ে টান মারতে মারতে মাথা নেড়ে সায় দিলো শুধু।

"শার্লোক হোমস যেভাবে অবজার্ভ করে সব বলে দিতো, সেরকম?"

"দেখেন, এই যুগে মিঃ হোম্‌সের মতো অবজার্ভ কইরা তেমন কিছু জানা সম্ভব হয় না...এইটা হইলো ইনভেস্টিগেশনের অনেকগুলা টুল্‌সের মইধ্যে একটা টুল। ওয়ান অব দেম, কইতে পারেন।"

রুহিন চুপ রইলো। মন দিয়ে শুনছে তার কথা।

"এখন কতো মেথড ডেভেলপ করছে তার কোনো হিসাব আছে নি..." শিশায় টান মেরে আবার বললো, "তারপরও অবজার্ভ কইরা কিছু জিনিস তো বলাই যায়..." আবারো শিশায় মনোযোগ দিলো কিন্তু তাকে দেখে মনে হলো না জিনিসটা উপভোগ করছে।

মাথা দোলালো রুহিন। "তাহলে আমাকে দেখে কিছু বলেন তো।"

"আপনেরে দেইখা আবার কী বলবো," পাইপটা ঠোঁটের কাছে ধরে রাখলো সে। "আপনের সব খবর তো ট্যাবলয়েড আর পেপারেই বাইর হয়া গেছে। প্লেবয় ব্যারিস্টার।"

হেসে ফেললো রুহিন মালিক। মন্দ বলে নি সাবেক ইনভেস্টিগেটর। "তারপরও এমন কিছু আছে যা আমি ছাড়া কেউ জানে না...এরকম কিছু বলেন?"

"এইটার একটা বিপদ কি জানেন?"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো ব্যারিস্টার।

"আপনে পুরাপুরি সুবিধাজনক অবস্থায় আছেন...আমার অনুমাণ যদি সত্যি সত্যি মিলাও যায় আপনে সেইটা খুব সহজেই অস্বীকার করবার পারবেন। কারণ বিষয়টা আপনে ছাড়া তো আর কেউ জানে না।"

রুহিন ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো। "আপনার কথায় যুক্তি আছে কিন্তু আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি...মিলে গেলে আমি অস্বীকার করবো না।

সেটা যতো শক্ত কথাই হোক না কেন।"

মাথা দুলিয়ে শিশায় টান মারলো সে। "আপনের বাবা-মা'র সম্পর্ক ভালো ছিলো না। ব্রোকেন ফ্যামিলি..."

হেসে ফেললো রুহিন। "এটা অনেক সহজ হয়ে গেলো। আমার মতো একজন সচ্ছল ব্যারিস্টার সব কিছু থাকা সত্ত্বেও বিয়েথা করে নি, একা থাকে...তার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে এটা অনুমাণ করা যেতেই পারে। পারিবারিক অশান্তির মধ্যে যারা বেড়ে ওঠে তাদের বিয়েভীতি থাকাটাই স্বাভাবিক।"

"হুম," মাথা নেড়ে সায় দিলো কেএসকে।

"আমি চাইছি আপনি এমন কিছু বলেন যা খুবই গোপন...কিন্তু সত্য। আমার জীবনের একটি অজানা কথা..."

রুহিন মালিকের দিকে অন্তর্ভেদি দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো কেএস খান। তারপর শিশায় টান দিয়ে আস্তে করে বললো, "আপনে মাহবুব সাহেবের সাথে একটা নীতিহীন কাজ করছেন...কিন্তু এই কথাটা আমারে বলেন নাই...ইচ্ছা কইরা এড়ায়া গেছেন।"

শিশার ধোঁয়া টানতে গিয়ে রুহিন মালিকের বিষম খাবার জোগার হলো। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলো সে। "যেমন?"

"আপনে ভালো কইরাই জানতেন মাহবুব সাহেবের কেসটা নিবেন না, তারপরও উনার কাছ থেইকা সব শুনছেন...আমি নিশ্চিত, উনার বলা কথাগুলা আপনে উনার বিরুদ্ধেই ব্যবহার করছেন আদালতে।"

চুপ মেরে গেলো রুহিন।

"বিলাত থেইকা দেশে আসছেন তখন...নতুন ক্যারিয়ার...খুবই ডেসপারেট ছিলেন কেস জেতার জন্য।"

কেএসকে অন্তর্ভেদি দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে।

"এইটারে অন্যরকম অবজার্ভেশন বলতে পারেন...আমি কিন্তু আপনেরে দেইখা এইসব আন্দাজ করি নাই। আপনের কথা শুইনা বুঝবার পারছি।"

এটা পুরোপুরি সত্য। অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই। রুহিন বুঝতে পারলো না কিভাবে কথাটা স্বীকার করবে।

"ধুর, পুরাই ফালতু একটা জিনিস," শিশার পাইপটা রেখে বলে উঠলো

সাবেক ইনভেস্টিগেটর। "পকেটের ট্যাকা খরচ কইরা মানুষ কেমনে এই জিনিস খায় আল্লায়ই জানে।"

রুহিন অনেক কষ্টে হেসে ফেললো। ইচ্ছে করেই প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলেছে কেএসকে। যেনো রুহিনকে বিব্রতকর সত্য স্বীকার করার হাত থেকে রেহাই দেবার জন্যই। তারও এখন শিশায় মন টানছে না। এই সাবেক ইনভেস্টিগেটরের সাথে বসে শিশা খেতে গিয়ে তার কাছে মনে হচ্ছে অর্থহীন একটা কাজ করছে। খেয়াল করলো তার শিশার কয়লাও নিভে গেছে। সার্ভিসম্যানকে ডাকলে আগুন ধরিয়ে দিয়ে যাবে কিন্তু সে ডাকলো না।

এমন সময় ব্যারিস্টারের ফোনটা বেজে উঠলো। "এক্সকিউজ মি," বলে কলটা রিসিভ করলো সে।

অন্য দিকে তাকালো কেএসকে। শিশা পার্লারের তেলেসমাতি দেখতে লাগলো আবার।

"আজকে না," যথাসম্ভব চাপাকণ্ঠে বললো রুহিন। ফোনের ওপাশ থেকে কিছুক্ষণ শোনার পর আবার বললো, "আমার কেসটা নিয়ে খুব বিজি আছি। কাল এসো।" চোরা চোখে তাকালো কেএসকের দিকে। সে এখনও আশেপাশের কাণ্ডকারখানা দেখছে। "প্লিজ, সুইটহার্ট, আজ না, ওকে?" ফোনটা রেখে যেনো হাফ ছেড়ে বাঁচলো তরুণ ব্যারিস্টার।

কেএসকে আগ্রহ নিয়ে পার্লারের ভেতরে চোখ বুলাচ্ছে।

"এখন বলুন, কি খাবেন?" অন্য প্রসঙ্গে চলে যাবার জন্য বললো সে।

কেএসকের খুব চা খেতে ইচ্ছে করছে। "এইখানে চা পাওয়া যাইবো?"

"পার্লারের বাইরে যে রেস্টুরেন্টটা আছে সেখানে সব খাবারই পাওয়া যায় কিন্তু আমি বলছিলাম ডিনারের কথা।"

"ডিনার তো বাসায় গিয়া করুম।"

"সেটা তো সব সময়ই করেন। আজ আপনাকে আমি অন্যরকম কিছু খাওয়াবো।"

"একটা তো খাওয়াইলেন, মাশাল্লা...কী আর কমু," হেসে বললো সে। "পুরাই বোগাস।"

রুহিন উঠে দাঁড়ালো। "চলেন। আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে। এখন

যেটা খাওয়াবো সেটাকে আর বোগাস বলতে পারবেন না।"

"আবার কৈ যে নিয়া যাইবেন কে জানে," উঠে দাঁড়ালো কেএসকে। "চলেন। এই জায়গাটা আমার একটুও ভালা লাগতাছে না। পোলাপান নষ্ট করনের আড্ডাখানা।"

মুচকি হাসলো রুহিন। এই আধো-আলো-অন্ধকার আর ধোঁয়াটে পরিবেশে কেমন জানি দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। এখানে সে অনেক এসেছে কিন্তু আগে কখনও এমন হয় নি। তার কাছেও মনে হচ্ছে এই ধোঁয়ার জগত থেকে বের হতে হবে।

অধ্যায় ২৩

রাতে বেশ খোশমেজাজে বাড়ি ফিরে এলো কেএসকে। ড্রইংরুমে ঢুকতেই দেখলো আইনস্টাইন টিভি দেখছে। এই ছেলেটা টিভি না দেখে থাকতে পারে না। সুযোগ পেলেই টিভি দেখবে। তার বয়সের চেয়ে প্রিয় চ্যানেলের সংখ্যা কয়েক গুন বেশি।

"স্যার, খানা দিমু?" কেএসকে ঘরে ঢুকলে ছেলেটা টিভি থেকে অনিচ্ছায় চোখ সরিয়ে বললো ।

"না। আমি খায়া আসছি।"

"চায়নিজ, নাকি বিরানী?" ছেলেমানুষী কৌতুহলে জানতে চাইলো আইনস্টাইন।

মুচকি হাসলো কেএসকে। "না না, ওইগুলা না।"

শিশা পার্লার থেকে বের হবার পর ব্যারিস্টার রুহিন তাকে নিয়ে যায় এক কোরিয়ান রেস্টুরেন্টে। ওখানে যেসব খাবার সে খেয়েছে তার নাম-ধাম কিছুই জানে না। তবে খেতে খুব ভালো লেগেছে। সবচাইতে ভালো লেগেছে যে আইটেমটা সেটা নাকি অক্টোপাসের ঠ্যাংয়ের ফ্রাই! ভাগ্য ভালো, খাওয়ার পর ব্যারিস্টার এটা বলেছে, আগে বললে মুখে দিতে পারতো কিনা সন্দেহ।

"তাইলে কি?" নাছোরবান্দা অল্পবয়সি ছেলেটা।

"কোরিয়ান।"

চোখমুখ বিকৃত করে ফেললো আইনস্টাইন। "অ্যা...করছেন কি! ওরা তো কুত্তা খায়। আল্লায় জানে আপনেরে কি খাওয়াইয়া দিছে।"

ভুরু কুচকে হেসে ফেললো সে। "থাক, আমি কি খায়া আসছি এইটা নিয়া তরে আর চিন্তা করতে হইবো না। তুই খা'ইছোস?"

"না।"

"আর টিভি দেখন লাগবো না, যা, খায়া-দায়া ঘুম দে।" কথাটা বলেই

নিজের ঘরে চলে এলো।

কোরিয়ান রেস্টুরেন্ট থেকে সোজা গাড়িতে করে তার বাসা পর্যন্ত লিফট দিয়েছে তরুণ ব্যারিস্টার। আচার-ব্যবহারে ছেলেটা ভালোই। প্রাণখোলা। ডিনার খেতে খেতে নিজের অনেক ব্যক্তিগত কথাও শেয়ার করেছে তার সাথে।

রুহিনের সাথে পরিচয় হবার পর এই প্রথম একসাথে অনেকটা সময় কাটালো সে। ব্যারিস্টারকে আরেকটু ভালোমতো জানার সুযোগ হয়েছে তার। সম্ভবত ইচ্ছে করেই রুহিন মালিক এ কাজটা করেছে। সাবেক ইনভেস্টিগেটর যেনো তার ব্যাপারে জানতে পারে, তাকে ভালো করে বুঝতে পারে সেজন্যে। কিংবা একসাথে কাজ করার জন্য দু'জনের মধ্যে সম্পর্কটা একটু গাঢ় করার দরকার মনে করেছে সে।

জামা কাপড় পাল্টে বিছানায় এসে আরাম করে বই পড়তে শুরু করবে এমন সময় আইনস্টাইন এসে দাঁড়ালো দরজার সামনে।

"কিছু বলবি?" রিডিং গ্লাসের উপর দিয়ে তাকালো কেএসকে। খেয়াল করলো ছেলেটার হাতে একটা বড় এনভেলপ।

"ভুইলা গেছিলাম," কাচুমাচু হয়ে বললো সে। "সন্ধ্যার পর এক লোক আইসা এইটা দিয়া গেছে। কইছে, আপনে ছাড়া যেন্ আর কাউরে না দেই।"

বইটা বিছানার পাশে রেখে দিলো কেএসকে। "দে।"

আইনস্টাইন তার হাতে এনভেলপটা দিয়ে চলে গেলো।

এনভেলপের উপর বড় করে লেখা : ফর কেএসকে। নীচে ছোট্ট করে লেখা : আমিনুল ইসলাম।

আমিনুল কাউকে দিয়ে এটা তার কাছে পাঠিয়েছে। এনভেলপটার মুখ ছিঁড়ে ভেতর থেকে কাগজগুলো বের করে বুঝতে পারলো এটা রফিক হাওলাদারের পোস্টমর্টেম রিপোর্টের ফটোকপি।

রিপোর্টটা হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করলো সে। পুরো রিপোর্টটা পড়তে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগার কথা নয় কিন্তু বিশ মিনিট ধরে ওটা পড়ে গেলো।

তার এই মনোযোগের বিঘ্ন ঘটালো একটা ফোনকল। বেডসাইড টেবিল থেকে ভাইব্রেট করতে থাকা ফোনটা তুলে নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে

পারলো না কলটা রিসিভ করবে কিনা। রাতের এ সময় খুবই প্রত্যাশিত একটি কল। এটা তাকে ভালো লাগার একটি অনুভূতি দেয়, তারপরও আজ আর ইচ্ছে করলো না কথা বলতে।

মোবাইলফোন চুরির ব্যাপারে এই কলার আইনস্টাইনকে যেভাবে চোর ভেবেছে সেটা ছিলো খুবই পীড়াদায়ক। এখন হয়তো এ নিয়ে আবার কথা তুলবে। ছেলেটাকে কেন এখনও বাড়িতে রেখেছে, পুলিশে দেয় নি কিংবা ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় নি–এরকম কঠিন কঠিন কথা শোনাবে। ঘুমাতে যাবার আগে এসব কথা শুনতে চাইছে না। আজ অনেক দিন পর তার শরীর কিছুটা ভালো যাচ্ছে, হালকা মাথাব্যথা ছাড়া তেমন কোনো সমস্যা হচ্ছে না।

দ্বিতীয়বার ভাইব্রেট করতে শুরু করলো তার ফোনটা। রিংটোন অফ, সাইলেন্স মুডে আছে। ফোনটা বেডসাইড টেবিলের উপর রেখে দিলো কেএসকে। সে জানে, পর পর দু'বার কল করে না পেয়ে এই কলার কেমন রেগে যাবে।

কয়েক মুহূর্ত থম মেরে বসে থেকে রিপোর্টটা আবার হাতে তুলে নিলো তবে পড়লো না। রিপোর্টের ফাইন্ডিংসগুলো নিয়ে ভেবে গেলো চোখ বন্ধ করে।

রিপোর্টে যা আছে তা প্রত্যাশিতই ছিলো, শুধু একটা ব্যাপার ছাড়া। আর সেটাই কেএসকের চিন্তার খোরাক যোগাচ্ছে।

রফিক হাওলাদার খুন হয়েছে আনুমানিক সন্ধ্যা সাতটার দিকে। কজ অব ডেথ ক্লোজ রেঞ্জ শুটিং। পয়েন্ট নাইন মিলিমিটারের দুটো বুলেট তার প্রাণ সংহার করেছে। ঠিক একই ক্যালিবারের পিস্তল ব্যবহার করে রুহিন মালিক। ভিক্টিমের শরীরে আর কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। তবে...

মুচকি হাসি ফুটে উঠলো তার ঠোঁটে। পাজলের টুকরোগুলো এবার মিলতে শুরু করেছে।

...ভিক্টিমের হাতের কব্জিতে আর দু'পায়ের গোড়ালিতে সামান্য ছিলে যাবার দাগ ছিলো।

ছিলে যাবার দাগ!

মনে মনে একটা দৃশ্য নিমার্ণ করতে শুরু করলো সে।

অধ্যায় ২৪

একটা সিগারেট ধরিয়ে আস্তে আস্তে টেনে যাচ্ছে রুহিন মালিক। পুরো ঘরটা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। পরিহাসের বিষয় হলো, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেও শিশা পার্লারের ধোঁয়াচ্ছন্ন জগতটা অসহ্য ঠেকছিলো, এখন আবার সেই ধোঁয়ায় ডুবে আছে সে।

তার পাশে শুয়ে আছে সিলভিয়া। রুহিনের সাথে সাথে সেও একটা ধরিয়েছে। দুটো সিগারেটের ধোঁয়া আর ডিমলাইটের আলো মিলে মিশে এক রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

কেএসকের সাথে ডিনার করে বাসায় এসে দেখে সিলভিয়া তার জন্য অপেক্ষা করছে। মেয়েটাকে দেখে চমকে গেছিলো সে। আজ নাকি তাদের অ্যানিভার্সারি! তাই ফোন না করেই সারপ্রাইজ দিতে চলে এসেছে।

কীসের অ্যানিভার্সারি? রুহিন কিছু বুঝতে না পেরে জানতে চেয়েছিলো। তারপর সিলভিয়া যা বললো তা শুনে মনে মনে খুব হেসেছিলো সে। কবে কোথায় তারা একসঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলো, প্রথমবারের মতো মিলিত হয়েছিলো সেসব হিসেব কে রাখে। মেয়েরা পারেও! একেবারে দিন-তারিখ এমনকি সময়টা পর্যন্ত মনে রেখে বসে আছে!

তার ভাগ্যটা ভালোই বলতে হবে। কিছুক্ষণ আগে ববি ফোন করে বলেছিলো সে আজও আসতে চায়। রুহিন তাকে না করে দিয়েছিলো। পর পর দুদিন একজনের সাথে শোয়াশুয়ির মতো বিরক্তিকর অভ্যেস এখনও তার গড়ে ওঠে নি। অবশ্য মেয়েটাকে বলেছিলো আজ সে খুব বিজি আছে নিজের কেসটা নিয়ে। মিথ্যে তো বলে নি। কেসটা নিয়ে সত্যি ব্যস্ত ছিলো সে।

মেয়েটার দিকে তাকালো রুহিন। উদাস হয়ে সিগারেট টেনে যাচ্ছে।

সিলভিয়া হক খুবই ধনী পরিবারের মেয়ে। তার বাবা একজন

স্বনামধন্য শিল্পপতি। গত বছর তার বাবা-মায়ের মধ্যে ডির্ভোস হয়ে গেছে। তার বাবা এখন সুযোগ পেলেই সুন্দরী সেক্রেটারিকে নিয়ে বিদেশে চলে যায়। সিলভিয়াকে শাসন কিংবা বারণ করার মতো এখন আর কেউ নেই। মেয়েটার বয়স মাত্র চব্বিশ। কিছুদিন আগে গ্র্যাজুয়েশন করেছে। এই মেয়েটার সাথে তার পরিচয় দেড় বছর আগের এক থার্টিফার্স্ট নাইট পার্টিতে।

পরিচয়ের পর পরই ফেসবুকে অ্যাড হয়, তারপর ফোন নাম্বার বিনিময়। প্রায়ই তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোনে কথা বলতো। তো একদিন ফোনে কথা বলার সময় রুহিন তাকে বলেছিলো গিফট হিসেবে দুটো ফ্রি এয়ার টিকেট পেয়েছে একটি প্রতিষ্ঠান থেকে কিন্তু তার যেতে ইচ্ছে করছে না। চাইলে সিলভিয়া টিকেট দুটো নিতে পারে, ঘুরে আসতে পারে কক্সবাজার থেকে। ঠিক তখনই মেয়েটা তাকে অবাক করে দিয়ে বলে, রুহিন যদি তার সঙ্গে যায় তাহলে সে দু'তিন দিনের জন্য ঘুরে আসতে পারে। গতকাল তার বাবা এক সপ্তাহের জন্য মালয়েশিয়া গেছে। বাড়িতে সে একা, খুব বোর লাগছে।

সিলভিয়ার কাছ থেকে প্রস্তাবটা পেয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য থ বনে গেছিলো সে। এতো দ্রুত এরকম একটি প্রস্তাব সে আমা করে নি। তবে মেয়েটাকে প্রথম দেখায়ই তার ভালো লেগেছিলো। এরকম একজনের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে ফিরিয়ে দেয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তারচেয়ে বড় কথা তার মতো অল্পবয়সিদের সাথে মেলামেশা করতে দারুণ লাগে। নিজেকে আরো বেশি তরুণ আর প্রাণশক্তিতে ভরপুর বলে মনে হয়।

প্রস্তাব পাবার পর আর দেরি করে নি। পরের দিনই তারা চলে যায় কক্সবাজার।

আজ নাকি সে-দিনটার এক বছর পূর্তি!

"অ্যাই, তুমি কি সত্যি সত্যি খুনটা করেছো?" সিগারেট টানতে টানতে বললো সিলভিয়া।

রুহিন মেয়েটার দিকে তাকালেও কিছু বললো না। এই ব্যাপারটা নিয়ে কেএস খান ছাড়া আর কারো সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করে না তার।

"নাকি তোমাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে? সত্যি করে বলো তো," এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে মুচকি হেসে বললো সে।

"তোমার কি মনে হয় আমি মানুষ খুন করতে পারি?"

রুহিনের দিকে তাকালো সিলভিয়া। চোখ দিয়ে পরখ করে নিচ্ছে তাকে। "দেখে তো মনে হয় না...কিন্তু করতেও পারো," আবারো সিগারেটে মনোযোগ দিলো সে। ছাদের দিকে মুখ করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললো, "কজ ইউ আর নট অ্যা ট্রাস্টঅরদি!"

এমন সময় বেডসাইড টেবিলের উপর রাখা রুহিন মালিকের ফোনটা ভাইব্রেট করে উঠলো। ডিসপ্লে'র দিকে তাকালো সে। মেজাজ বিগড়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। এখন রাত বাজে একটারও বেশি, এসময় আবার ফোন!

"কি হলো, ধরছো না কেন?" পাশে থেকে সিলভিয়া বললো। যেনো বুঝে গেছে ফোনটা কে করেছে।

বিরক্ত হয়ে অ্যাস্ট্রেতে সিগারেট রেখে কলটা রিসিভ করতে যাবে তখনই সিলভিয়া বলে উঠলো, "অ্যাই শালা, স্পিকার অন করে কথা বলবি। আমি জানি ঐ বিচটা ফোন করেছে।"

রুহিন একটু বিরক্ত হলো। সঙ্গম করার আগে একটু বেশিই মদ্যপান করেছে মেয়েটা। বার বার নিষেধ করা সত্ত্বেও চার পেগ খেয়েছে। এখন শুরু করেছে মাতলামি।

"হ্যা, কি খবর, এতো রাতে?" কলটা রিসিভ করে চাপাকণ্ঠে বললো রুহিন। অন্য হাতে সিলভিয়াকে চুপ থাকার ইশারা করলো। সিগারেটে টান দিচ্ছে আর মিটি হাসছে সে।

"না, সমস্যা কিসের। আজ একটু তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তো..."

"হি ইজ লায়িং, বিচ!" হেসে বললো সিলভিয়া।

রুহিন একহাতে মেয়েটার মুখ চাপা দিতে গিয়েও পারলো না। সরে গেলো।

"উই জাস্ট ফাক্ড...বিচ! অ্যান্ড ইট ওয়াজ অ্যা ফাক অব দি সেঞ্চুরি!"

সঙ্গে সঙ্গে লাইনটা কেটে দিলো রুহিন। কটমট চোখে তাকালো মেয়েটার দিকে। কিন্তু তার মধ্যে কোনো ভাবান্তর নেই। এখনও মাতলামি করে যাচ্ছে।

"ওয়েল, আই মাস্ট সে...হি ইজ অ্যা গ্রেট লাভার...!" তারপরই হি-হি করে হেসে উঠলো সিলভিয়া।

"এটা কি হলো?" রেগেমেগে বললো রুহিন মালিক।

"ফাক ইউ, বেবি!" বলেই বাম হাতের মধ্যমা উঁচিয়ে দেখালো। "ইউ নো, আই হেইট দ্যাট আগলি বিচ।"

দু'হাতে সিলভিয়াকে ধরে ঝাঁকুনি দিলো সে। "অ্যান্ড আই হেইট ইউ!"

সিলভিয়ার হাত থেকে সিগারেটটা পড়ে গেলো মেঝেতে। হা-হা-হা করে মাতালের হাসি দিলো আবার। "নো, বেবি...ইউ লাভ মি! ইউ জাস্ট..."

"আম গোনা কিল ইউ!" দাঁতে দাঁত পিষে বললো রুহিন।

ঢুলুঢুলু চোখে তাকালো সিলভিয়া। "ইউ ওয়ানা কিল মি অ্যাগেইন...উ-উম্?"

ব্যারিস্টার কিছু বললো না। কটমট চোখে চেয়ে রইলো মেয়েটার দিকে।

"ওকে, কিল মি, বেবি!"

কথাটা বলেই রুহিনের গলা জড়িয়ে ধরলো সিলভিয়া, তারপর দম বন্ধ করা গাঢ় চুম্বন।

অধ্যায় ২৫

বনানীর দশ নাম্বার রোডের তেরো নাম্বার বাড়িটা ছয় তলার একটি অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং। এই বিল্ডিংয়ের তিন তলার একটি ফ্ল্যাটে থাকেন রিটায়ার্ড পুলিশ সুপার আলী ইমাম। একটা ব্যাপার নিয়ে সকাল থেকে ভেবে যাচ্ছেন তিনি। গতকাল তার ছোটোবোনের হাজব্যান্ড এসেছিলো বেড়াতে। তো গাড়ি রাখার জন্য বাড়ির বাইরে জায়গা পাচ্ছিলো না ওখানে একটা গাড়ি পার্ক করা ছিলো বলে। এইসব অ্যাপার্টমেন্টের পার্কিংলটে আবার গেস্টদের গাড়ি রাখার কোনো ব্যবস্থা নেই। আজব এক নিয়ম। মেহমানদের গাড়ি নিজ দায়িত্বে বাইরে কোথাও রাখতে হবে। কারণ, শুধুমাত্র অ্যালোটিদের জন্যই অ্যাপার্টমেন্টের পার্কিংলট।

আজ সকালে তার আপন ছোটোভাই আসলে আবারো ঐ সমস্যায় পড়তে হয়। ঐ গাড়িটা ঠিক তাদের অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে পার্ক করা আছে, সুতরাং একটু দূরে ছোটোভায়ের গাড়িটা পার্ক করতে হয়েছিলো। এই ব্যাপারটা কারো চোখেই পড়ছে না, কিন্তু দীর্ঘদিন পুলিশ বাহিনীতে কাজ করার সুবাদে তার দৃষ্টিভঙ্গি অন্য সবার থেকে একটু আলাদা। সকাল থেকেই তার মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘাপলা আছে।

তাদের অ্যাপার্টমেন্টের সামনে যে গাড়িটা পার্ক করা আছে সেটা মোটেও স্বাভাবিক ঘটনা নয়। ইমাম সাহেব এক এক করে সব অ্যালোটিকে জিজ্ঞেস করে দেখেছেন, তাদের কোনো গেস্টের গাড়ি নয় ওটা। এ কাজটা করতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করেছেন, কিছু অ্যালোটি এমনভাবে তার দিকে তাকাচ্ছিলো যেনো তার মাথা নষ্ট হয়ে গেছে।

এ দেশে এই হলো এক সমস্যা। নাগরিক অধিকারের ব্যাপারে একেকজন যতোটা সচেতন দায়িত্বের বেলায় তার ছিটেফোটাও দেখা যায় না। যেনো নিজের বাড়িতে শক্ত গ্রিল, দরজায় দামি লক আর গেটে দারোয়ান রেখে দিলেই সব ল্যাঠা চুকে গেলো। আশেপাশের ব্যাপারটা

দেখতে হবে না? কোথায় কি হচ্ছে, সজাগ নজর রাখতে হবে না? একজন ভালো নাগরিক কি শুধু নিজের নিরাপত্তা নিয়ে শংকিত থাকবে সব সময়? যে সমাজে সে বসবাস করে তার প্রতি কোনো দায় থাকবে না?

যাক, কে কী ভাবলো সেসব নিয়ে পরোয়া করেন না তিনি। তার যা করার তাই করবেন। বালুতে মুখ গুঁজে থাকা উটপাখিদের দলে তিনি নন।

একটু আগে নীচে নেমে দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ঐ মুর্খ গবেটটা এমন ভাব করলো যেনো তার বয়স হয়ে গেছে। খেয়েদেয়ে কোনো কাজ নেই তাই এসব ফালতু বিষয় নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছেন।

এই রোডের দু'পাশে এরকম কতো গাড়িই তো পার্ক করা থাকে সব সময়। এটা কি খোঁজ নেবার মতো ঘটনা হলো?

আলী ইমাম সাহেব দারোয়ানের সাথে আর বেশি কথা বলেন নি। তিনি জানেন, এদের সাথে কথা বলে লাভও নেই। এরা হচ্ছে 'খাবে-দাবে -ঘুমাবে' কিসিমের লোকজন। এদের চোখে এসব সূক্ষ্ম জিনিস ধরা পড়বে না।

আরে, ঐ মূর্খ দারোয়ানকে আর দোষ দিয়ে কী লাভ, তার শিক্ষিত স্ত্রীও কি কম করলো? এতো বছর ধরে একজন পুলিশের সাথে সংসার করেও কিছু শিখতে পারলো না!

খুব আগ্রহ নিয়ে স্ত্রীর কাছে এটা বলেছিলেন আজ। সব শুনে তার বউ এমনভাবে তার দিকে তাকালো, যেনো দিন দিন বাতিকগ্রস্ত বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন।

কিন্তু এতো সহজে তিনি হাল ছেড়ে দেবেন না। কেউ ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি না নিক, তিনি এর শেষ দেখে ছাড়বেন।

মোবাইলফোনটা পকেটে নিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বের হয়ে গেলেন চুপচাপ। ঘরে বসে কাজটা করা যাবে না, তার স্ত্রী দেখলে এ নিয়ে খামোখাই গজগজ করা শুরু করে দেবে। সব ভালো লাগে কিন্তু বউয়ের গজগজানি শুনতে ভালো লাগে না।

অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে এসে বনানী থানায় ফোন করলেন তিনি। তার কাছে বনানী থানার ওসির নাম্বার আছে। ঐ ওসি তাকে খুব শ্রদ্ধাও করে। যখনই থানায় যান চা না খাইয়ে ছাড়ে না।

"হ্যালো, মোয়াজ্জেম?" লাইনটা কানেক্ট হতেই বললেন তিনি। ওপাশ

থেকে লম্বা সালাম পেয়ে চোখেমুখে হাসি ফুটে উঠলো তার। "ওয়ালাইকুম সালাম...বিজি নাকি?" না, খুব একটা ব্যস্ত না। "শোনো, একটা দরকারে ফোন দিয়েছি।" সরাসরি কাজের কথায় চলে এলেন। ভালো করেই জানেন, মুখে ব্যস্ত না বললেও আসলে পুলিশের কাজে কতো ব্যস্ততা থাকে।

যতোদূর সম্ভব সংক্ষেপে জানালেন তার বাড়ির সামনে একটা গাড়ি রহস্যজনকভাবে পার্ক করা আছে। সব শুনে ওসি মোয়াজেজ্জমও ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নিলো না। হয়তো আশেপাশে কোনো অ্যালোটির কাছে মেহমান এসেছে, তারই গাড়ি হবে। সেই মেহমান হয়তো দু'তিন দিন থাকবে।

"মোয়াজ্জেম, তুমি বুঝতে পারছো না," অধৈর্য নিয়ে বলে উঠলেন আলী ইমাম সাহেব। "ঐ গাড়িটা প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ওখানে আছে।"

এবার মনে হলো ওসি মোয়াজ্জেম সিরিয়াস হয়ে উঠলো। *এক সপ্তাহ!* ঠিক আছে, ব্যাপারটা সে খতিয়ে দেখার জন্য এক্ষুণি একজন এসআই পাঠিয়ে দিচ্ছে। ঘটনা আসলেই সন্দেহজনক।

অবশেষে, ধন্যবাদ জানিয়ে থানায় এসে চা খেয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালো ওসি।

সন্তুষ্ট চিত্তে ফোনটা রেখে হাসিহাসি মুখে রাস্তার উপর রাখা গাড়িটার দিকে তাকালেন অবসরে যাওয়া পুলিশ কর্মকর্তা আলী ইমাম।

আসলে পুলিশই পুলিশের কথা ভালো বোঝে। আর কেউ না!

অধ্যায় ২৬

ডাক্তার লুবনা নিজের চেম্বারে বসে বই পড়ছে। একটু আগে কিছু পেশেন্টকে দেখে ফিরে এসেছে। এখন আরাম করে কফি খাচ্ছে আর গল্পের বই পড়ছে। মেডিকেলে পড়ার সময় থেকেই গল্পের বই পড়ার অভ্যেস। আজ এতো বছর পরও সেটা ত্যাগ করতে পারে নি। সময় পেলেই বই নিয়ে বসে পড়ে যেখানে সেখানে। তার মেডিকেল ব্যাগে সব সময় কিছু না কিছু বই থাকে। এখন পড়ছে দুর্দান্ত একটি মার্ডার মিস্ট্রি। এরকম ক্রাইম-ফিকশন তার সবচাইতে প্রিয়। গতকাল রাতে এই বইটা পড়া শুরু করেছিলো, মাত্র অর্ধেক পড়তে পেরেছে। আজ সকাল থেকে কাজের চাপের কারণে বইটা ধরেও দেখতে পারে নি। এখন একটু সময় পাওয়া গেছে। তবে শেষটুকু বাসায় গিয়ে পড়তে হবে। এই হাসপাতালে একটানা বই পড়ার কোনো জো নেই।

একটা কাশির শব্দ শুনে দরজার দিকে তাকালো সে। চশমার উপর দিয়ে দেখতে পেলো কেএস খান দাঁড়িয়ে আছে।

"আরে, আপনি?" বইটা রেখে দিলো ডাক্তার লুবনা। "মিঃ ডেক্সট্রো কার্ডিয়া! আসুন আসুন।"

কেএসকে চওড়া একটা হাসি দিয়ে ডেস্কের সামনের চেয়ারে বসে পড়লো। এই ডাক্তার তাকে দেখলেই এ কথাটা বলে। *মিঃ ডেক্সট্রো কার্ডিয়া!*

"শরীর কি আবার খারাপ করেছে?" ডাক্তার জানতে চাইলো।

"না।" ছোট্ট করে বললো কেএসকে। মাসে একবার এই ডাক্তারের কাছে চেকআপ করাতে আসে সে। আগে অবশ্য অন্য এক ডাক্তারের কাছে যেতো কিন্তু ঐ ভদ্রলোক বিদেশে চলে যাবার পর তারই রেফারেন্সে ডাক্তার লুবনার কাছে নিয়মিত চেকআপ করাতে আসে। এক সপ্তাহ আগেই চেকআপ করে গেছে কিন্তু আজ এসেছে অন্য একটা কারণে। "শরীর

মোটামুটি ভালাই আছে।"

"দ্যাটস গুড।"

"আপনে কেমন আছেন?"

"ফাইন।"

লাজুক হাসি দিলো কেএসকে। ডাক্তার লুবনার কাছে এলেই তার ভালো লাগে। মহিলা খুব যে সুন্দরী তা নয়, কিন্তু কেমন জানি উচ্ছল আর প্রাণবন্ত থাকে সব সময়। বিশেষ করে চশমার পেছনে তার চোখ দুটো কৌতুহল আর প্রাণশক্তিতে ভরপুর। "আপনে তো সব সময়ই ফাইন থাকেন।"

"হুম," লুবনা হেসে বললো। "চেষ্টা করলে আপনিও এরকম থাকতে পারেন।"

"কী যে কন," মলিন হাসি দিলো কেএস খান। "আমার পক্ষে কি সেইটা সম্ভব।"

"অবশ্যই সম্ভব," জোর দিয়ে বললো ডাক্তার। "মনে জোর রাখবেন। এসব অসুখ-টসুখ কিচ্ছু না। পাত্তাই দেবেন না।"

"সেইটা আমার আছে, না থাকলে তো এতোদিনে শ্যাষ হইয়া যাইতাম।"

"গুড," বললো ডাক্তার।

"অসুখ-বিসুখরে কিন্তু আমি পাত্তা দেই না, ওরাই আমারে পাত্তা দেয়।"

"হা-হা-হা," হেসে ফেললো ডাক্তার লুবনা।

"সব সময়।"

হাসি থামিয়ে বললো ডাক্তার, "একতরফা প্রেমিকার মতো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো কেএসকে।

"ভালো বলেছেন।"

"বই পড়তাছিলেন নাকি?" ডেস্কের উপর উল্টে রাখা বইটার দিকে তাকিয়ে বললো সে।

"হুম।"

"ওহ্, তাইলে তো আপনারে ডিস্টার্ব কইরা ফালাইলাম।"

"আরে না," হেসে বললো ডাক্তার। "কিছু করার ছিলো না তাই

পড়ছিলাম।"

বইটার দিকে তাকালো সাবেক ইনভেস্টিগেটর। "ডিটেক্টিভ উপন্যাস নাকি?"

"হ্যা। আমি তো ওগুলোই বেশি পড়ি। ওরাই তো আমার হিরো।"

কেএসকে চেয়ে রইলো ডাক্তারের দিকে। "কারা?"

"ডিটেক্টিভ," মুখ টিপে হেসে বললো লুবনা। "আপনাদের মতো ডিটেক্টিভরা।"

কেএসকের কেমন জানি একটা অনুভূতি হলো। বিব্রত আর ভালো লাগার মিশ্রণে।

"জানেন এই বইয়ের ডিটেক্টিভটা আপনার মতোই রিটায়ার্ড।"

"তাই নাকি।"

"কিন্তু আপনার মতো অতো ইয়ং না...একটু বয়স্ক।"

"আমি আবার ইয়ং হইলাম কবে?" মুখে এটা বললেও কথাটা শুনে কেএসকের ভালোই লাগলো। এই ডাক্তার লুবনা বাদে বাকি সবাই কেন ত্রিশের ব্রাকেটে তারুণ্যকে বন্দী করে রাখে সে বোঝে না।

"আপনি ইয়ং না তো কি, বুড়ো?" চশমার উপর দিয়ে তাকালো আবার।

ডাক্তারের এই চাহ্‌নিটা কেএসকের হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দেয়। আজো তাই হলো। নতুন প্রেমে পড়া কিশোর-যুবকের মতো অনির্বচনীয় অনুভূতিতে আক্রান্ত হলো সে। টের পেলো বুকের ডান দিকে হৃদপিণ্ডটা রীতিমতো লাফাচ্ছে!

"আমার কিন্তু বিয়াল্লিশ চলতাছে," বললো কেএসকে।

"দ্যাট মিনস, ইউ আর ইয়ংগার দ্যান সালমান, আমির, শাহরুখ...টম ক্রুজ!"

কেএসকে লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠলো। সে জানে ডাক্তার লুবনা তাকে মানসিকভাবে চাঙ্গা করার জন্য এসব কথা বলছে। কিছু কিছু ডাক্তার আছে, যাদের সাথে কথা বললেই অসুখ অর্ধেক ভালো হয়ে যায়-এই মহিলা সেরকমই একজন। কিন্তু ডাক্তার লুবনার মিথ্যেগুলোও তার ভালো লাগছে।

সুইট লিটল লাই!

এ জীবনে সে সত্যকে খুঁজে চলেছে সব সময়, তার চেয়ে কে আর ভালো জানে, সত্য বেশিরভাগ সময়ই সুখ দিতে পারে না। কখনও কখনও মিথ্যেরও দরকার পড়ে। এজন্যেই হয়তো মিথ্যের অস্তিত্ব আছে। মিথ্যে ছাড়া সত্যের কি মূল্য থাকতো? থাকতো না। কষ্ট করে সত্যকে খুঁজে বের করার জন্য তাদের মতো ইনভেস্টিগেটরেরও দরকার পড়তো না।

"এই যে, মিঃ ডিটেক্টিভ, কি ভাবছেন?" ডাক্তার লুবনা ভুরু নাচিয়ে জানতে চাইলো।

সম্বিত ফিরে পেলো কেএসকে। মাথা থেকে এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললো সে, "কার সাথে কী যে তুলনা দেন।"

"সত্যি বলেছি।" হালকা গোলাপি লিপস্টিকের কারণে ডাক্তারের মৃদু হাসিটা আরো ব্যঞ্জনা তৈরি করলো। "কফি খাবেন?" প্রসঙ্গ পাল্টে ফেললো ভদ্রমহিলা।

"না, আমি একটু পরই চইলা যামু। আসছিলাম একটা কাজে..."

"কাজে?" অবাক হলো ডাক্তার। "আমার কাছে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো কেএসকে।

"বলুন, কি কাজ?"

একটু সময় নিলো কথাগুলো গুছিয়ে বলার জন্য। "একটা কেস নিয়া খুব সমস্যায় পড়ছি...মনে হইলো আপনে হেল্প করবার পারবেন।"

"ওয়াও, একটা কেসের ব্যাপারে আমার হেল্প চাচ্ছেন?" ডাক্তার লুবনার চোখ দুটো চঞ্চল হয়ে উঠলো।

মুচকি হেসে সায় দিলো কেএসকে।

"বলুন, বলুন। আমার তো তর সইছে না।"

"অ্যাপেনডিক্স সম্পর্কে কিছু বলেন তো।"

"অ্যাপেনডিক্স!" ডাক্তার খুবই অবাক হলো।

"হ।"

"ঘটনা কি?" লুবনা এখনও বুঝতে পারছে না।

"বলতাছি, তার আগে কন, এই জিনিসটার ফাংশন কি।"

একটু ভাবলো ডাক্তার। "এটার ফাংশন কি সেটা তো মেডিকেল সায়েন্স এখনও পরিস্কার করে জানে না। এটা একটা *রুডিমেন্টারি অর্গ্যান*। বাংলায় কি বলবেন...উমমম..."

"অবিকশিত প্রত্যঙ্গ?" একেবারে আক্ষরিক অনুবাদ করলো কেএসকে।

"হুম, সেটা বলতে পারেন।" একটু থেমে আবার বললো, "এটা একটা অপ্রয়োজনীয় জিনিস। কাজ করে না কিছুই কিন্তু সমস্যা দেখা দিলে কেটে ফেলে দিতে হয়। নইলে ভয়ঙ্কর বিপদ।"

অপ্রয়োজনীয় জিনিস? মনে মনে বলে উঠলো কেএসকে। *আচ্ছা!*

ডাক্তার বলতে লাগলো, "বিশেষ করে খাদ্যনালী থেকে খাবারের অংশ ঢুকে পড়লে ওটা ফুলে ওঠে, প্রচন্ড পেইন হয়। তখন অপারেশন করে কেটে ফেলে দিতে হয়। কখনও কখনও অবস্থা এমন সিরিয়াস হয়ে ওঠে যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অপারেশন না করলে ওটা ফেটে যায়, সেক্ষেত্রে রোগির মৃত্যুও হতে পারে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো কেএসকে।

"আচ্ছা, আপনার কেসটা কি নিয়ে?"

"একটা মার্ডার কেস।"

"মার্ডার কেস!" বিস্মিত হলো ডাক্তার লুবনা। তার এই বিস্মিত হবার ভঙ্গিটি দারুণ পছন্দ কেএসকের। "অ্যাপেনডিক্সের সাথে এর কী সম্পর্ক?"

"আছে আছে," একটু রহস্য করে বললো সে।

"আমাকে বলা যাবে না?"

"আরে যাইবো না কেন," হেসে বললো সাবেক ইনভেস্টিগেটর। "কেসটা নিয়া মাত্র কাজ শুরু করলাম। একটু আগাই তখন আপনেরে সব বলবো। এখন একেবারে প্রাইমারি স্টেজে আছে।"

"তার মানে এখন বলবেন না?"

"এখন বললে আপনে কোনো মজা পাইবেন না।"

হেসে ফেললো ডাক্তার লুবনা। "ওকে, আপনি আমাকে পরেই বোলেন। এখন বলুন, আর কি জানতে চান?" একটু সামনের দিকে ঝুঁকে এলো ডাক্তার।

চমৎকার একটি সুগন্ধী এসে লাগলো তার নাকে। অনেকটা বেলী ফুলের মতো ঘ্রাণ। সঙ্গে সঙ্গে মাথা থেকে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেললো।

"এই জিনিসটা অপারেশন করতে কি রোগিকে অ্যানেস্থেশিয়া দেওন লাগে?"

"হুম। তা তো লাগেই।"

"অপারেশনের পর রোগি কি হাটাচলা করবার পারে?"

"অপারেশনের ক'দিন পরের কথা জানতে চাচ্ছেন?"

"অপারেশনের পর পরই আর কি।"

"আরে না। সেটা কিভাবে সম্ভব। অ্যানেস্থেশিয়ার প্রভাব কাটতেই কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবার কথা। অপারেশনের দু'তিন দিন পর হয়তো রোগি একটু আধটু হাটতে পারবে।"

কেএসকে মাথা নেড়ে সায় দিলো। তার মানে মাহবুব সাহেবের পক্ষে অপারেশনের পরও হাসপাতাল থেকে বের হওয়া অসম্ভব ছিলো। তাহলে রুহিন মালিক যাকে দেখেছে সে কে?

"আর কিছু?"

"না, ঠিক আছে। আর কিছু না। আপনের সময় নষ্ট করলাম মনে হয়।"

চশমার উপর দিয়ে বাঁকা চোখে তাকালো ডাক্তার। "আমার সময় নষ্ট করলেন মানে?" কৃত্রিম অভিমানের সুরে বললো ডাক্তার। "অনেক বিনয় আপনার, তাই না? এসব আমার সাথে দেখাবেন না। ঠিক আছে?"

"আচ্ছা, দেখামু না।" হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালো কেএসকে।

"আরে, উঠলেন যে?" অবাক হয়ে জানতে চাইলো লুবনা।

"চইলা যাইতাছি।"

"উ হুঁ...আপনাকে তো এভাবে যেতে দেয়া হবে না," রহস্য করে বললো মহিলা।

কেএসকে বুঝতে পারলো না। "অ্যা?"

"শুয়ে পড়ুন।" আদেশের ভঙ্গিতে বললো ডাক্তার।

কেএসকে যেনো ভিরমি খেলো। ঢোক গিললো সে।

পাশের একটা বেডের মতো টেবিল আছে, সেটার দিকে ইঙ্গিত করলো ডাক্তার লুবনা। "শুয়ে পড়ুন। আমি আপনাকে একটু দেখবো।"

"গত সপ্তাহে তো চেকআপ করাইলাম—"

"হ্যা, সেটা তো জানি। এসেই যখন পড়েছেন আরেকবার চেকআপ করে দেখি, সমস্যা কি।" উঠে দাঁড়ালো ডাক্তার।

কেএসকে আর কথা না বলে টেবিলটার উপর শুয়ে পড়লো।

জাল

ডাক্তার লুবনা কাছে এসে কানে স্টেথিস্কোপটা লাগিয়ে কেএসকের বুকের বাম দিকে চেপে ধরলো। তারপর ফিক করে হেসে ভুরু নাচিয়ে বললো, "সরি, ভুলে গেছিলাম। আপনারটা তো ডান দিকে..." বলেই বুকের ডান দিকে স্টেথিস্কোপটা ধরলো।

কেএসকে জানে তার হৃদস্পন্দনটা অনেক বেড়ে গেছে, ডাক্তার লুবনা নিশ্চয় সেটা ধরতে পারছে এখন। একেবারে অল্পবয়সী ছেলেদের মতো ধুকপুকানি যাকে বলে।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, এজন্যে তার মধ্যে কোনো লজ্জাবোধ হলো না!

অধ্যায় ২৭

ডাক্তার লুবনার সাথে দেখা করার পরই কেএসকে সোজা চলে আসে ডিবি অফিসে। একটু আগে বাসায় যাবার পথে আমিনুল তাকে ফোন করে। নিহত ব্যবসায়ী রফিক হাওলাদারের প্রাইভেট কারটি অবশেষে ঘটনার এক সপ্তাহ পর পুলিশ উদ্ধার করতে পেরেছে বনানী থেকে।

স্থানীয় থানার পুলিশ মোয়াজ্জেম সাহেব প্রথমে বুঝতে পারে নি এটাই নিহত ব্যবসায়ীর গাড়ি, পরে তার এক এসআই তাকে জানায় ঠিক এই নাম্বারপ্লেটের গাড়ির খোঁজই করতে বলেছিলো ডিবি থেকে। কেএসকের কথামতো আমিনুল সারা দেশের সবগুলো থানায় রফিক হাওলাদারের গাড়ির নাম্বারটাসহ একটি অনুরোধ ফ্যাক্স করে দিয়েছিলো।

মোয়াজ্জেম সাহেব দেরি না করে আমিনুলকে জানিয়ে দিলে ডিবির লোকজন এসে গাড়িটা জব্দ করে নিয়ে এসেছে।

গাড়ির ভেতর থেকে একটা রুমাল ছাড়া তেমন কিছুই পাওয়া যায় নি। আমিনুল সেই রুমালটা এভিডেন্স হিসেবে নিজের কাছে রেখে দিয়েছে।

কেএসকে যখন আমিনুলের রুমে ঢুকলো তখন রুমালটা তার ডেস্কের উপর প্লাস্টিকের ব্যাগে রাখা।

"স্লামালেকুম, স্যার," উঠে দাঁড়িয়ে বললো আমিনুল।

"বসো বসো," বললো কেএস খান। তাকে আজ খুব প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে। "গাড়িটা পাওয়া গেলো তাইলে।"

"আমাদের কেসে মনে হচ্ছে ভালোই সাহায্য হবে।"

"হুম, আমারও সেইরকম মনে হইতাছে।" একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো সে। "গাড়ির ভেতর থেইকা কিছু পাইছো?"

"এই যে, এটা, স্যার," প্লাস্টিকের ব্যাগটা তুলে ধরলো আমিনুল। "একটা রুমাল।"

কেএসকের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। যেনো পাজলের আরেকটি টুকরো

মিলে গেছে।

আমিনুল অবশ্য বুঝতে পারলো না সামান্য একটা রুমাল দেখে তার টিচার এতো খুশি কেন।

প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে রুমালটা বের করে নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুকলো সে।

আমিনুলের গা গুলিয়ে উঠলো। অন্য মানুষের রুমাল কেউ এভাবে নাকে নিয়ে গন্ধ শুকে? এটা তো হাইজেনিক না। একেবারেই অস্বাস্থ্যকর। রুমাল দিয়ে মানুষ কি করে সেটা কি কেএস খান জানে না?

সাবেক ইনভেস্টিগেটরের মুখে হাসি ফুটে উঠলো আবার। আরেকটা পাজলের টুকরো মিলে যাবার ইঙ্গিত।

"কিছু বুঝতে পারলেন, স্যার?" কৌতুহলী হয়ে উঠেছে আমিনুল।

"আরে না, এতো সহজে কি কিছু বুঝা যায় নাকি," যথারীতি বললো সে। "আরেকটু টাইম লাগবো।"

মনে মনে হেসে ফেললো আমিনুল। এই প্রবাদপ্রতীম ইনভেস্টিগেটর সব সময় এ কথাই বলে কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় অভাবনীয় দ্রুততার সাথে জটিল জটিল সব কেস সমাধান করে ফেলে।

"গাড়িটা মোটামুটি ক্লিনই বলা যায়," আমিনুল বলতে শুরু করলো। "আমি নিজে চেক করে দেখেছি। এই রুমালটা ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় নি।"

হেসে ফেললো কেএস খান, তারপর জানতে চাইলো, "বনানী থেইকা পাওয়া গেছে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো আমিনুল। "জি, স্যার।"

"হুম।" যেনো মনে মনে আরেকটা পাজলের টুকরো মেলাচ্ছে।

"দশ নাম্বার রোডের একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনে...এক রিটায়ার্ড পুলিশ সুপার লোকাল থানায় ফোন করে গাড়িটার অবস্থানের কথা জানায়। উনি বলছেন, গাড়িটা নাকি সাতদিন ধরেই ওখানে পার্ক করা ছিলো কিন্তু কারো চোখে এটা ধরা পড়ে নি।"

"আচ্ছা," মাথা নেড়ে সায় দিলো কেএস খান।

"গাড়িটা যেখানে পাওয়া গেছে সেখান থেকে কিন্তু ঐ ব্যারিস্টারের চেম্বার আর বাসা খুব বেশি দূরে না..."

আমিনুলের দিকে চেয়ে রইলো কেএসকে। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে আবারো বললো, "হুম।"

"স্যার, চা খাবেন?"

"খাওন যায়।"

আমিনুল বেল টিপে একজনকে ডেকে দু'কাপ চায়ের কথা বললো।

"আমি কিন্তু ঐ মাহবুব সাহেবকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছি, স্যার," বললো কেএসকের ছাত্র।

"হুম, তা তো করবাই। উনার সঙ্গে কথা বইলা কি মনে হইলো?" গম্ভীরভাবে জানতে চাইলো সে।

"ভদ্রলোক আমাদের উপর খুব চটে আছেন। আমরা যে তাকে সন্দেহ করছি এটা তিনি মেনে নিতে পারছেন না।"

কেএসকে মাথা নেড়ে সায় দিলো কিন্তু আমিনুলের কাছে মনে হলো তার শিক্ষক অন্য কিছু ভাবছে।

"আমি কিন্তু নিশ্চিত, খুনটা মাহবুব সাহেব করেন নি।"

যেনো সম্বিত ফিরে পেলো কেএস খান। "কে করে নি?"

"মাহবুব সাহেব। সবকিছু বিবেচনায় নিলে এটা একদম স্পষ্ট, খুনটা তিনি করেন নি।"

"আচ্ছা," আর কিছু বললো না কেএসকে।

এমন সময় পিয়ন এসে দু'কাপ চা দিয়ে গেলো।

আমিনুল নিজের কাপে চুমুক দিয়ে বললো, "আবার এটাও মনে হচ্ছে না ঐ ব্যারিস্টারই খুনটা করেছে।"

চায়ে চুমুক দিতে দিতে মুচকি হেসে ফেললো সাবেক ইনভেস্টিগেটর। "তাইলে খুনটা করলো কে?"

আমিনুলের মধ্যে একটু দ্বিধা দেখা গেলো।

"বইলা ফালাও। মনে হইতাছে তুমি একটা হাইপোথিসিস দাঁড় করাইছো। দেখি, তোমার হাইপোটা কেমন।"

অভয় পেয়ে আমিনুলের মধ্য থেকে দ্বিধা চলে গেলো। "আমার মনে হচ্ছে খুনটা মাহবুব সাহেব অন্য কাউকে দিয়ে করিয়েছেন।"

"ইউ মিন, প্রফেশনাল কেউ?"

"জি, স্যার।"

"হুম।" ছোট্ট করে বললো কেএস খান।

আমিনুলের মনে হলো এই হাইপোথিসিসটা তার শিক্ষকের মনে ধরেছে। এটা নিয়েই হয়তো ভেবে যাচ্ছে সে।

"ব্যারিস্টারও ব্যাপারটা ধরতে পেরেছিলেন। আইনের মানুষ হিসেবে উনি জানেন, মাহবুব সাহেব যে অন্য একজনকে দিয়ে খুন করিয়েছেন এটা প্রমাণ করা খুব কঠিন হবে তাই সরাসরি ভদ্রলোককে জড়ানোর জন্যই ঘটনাটা একটু বদলে দিয়েছেন।"

আমিনুলের দিকে স্থিরচোখে চেয়ে রইলো কেএসকে।

"কিন্তু ব্যারিস্টারের কপাল খারাপ, কাকতালীয়ভাবে ঐদিন মাহবুব সাহেবের অ্যাপেনডিক্সের সমস্যা দেখা দিলে জরুরি ভিত্তিতে অপারেশন করা হয়।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মিঃ খান। সে অবশ্য এভাবে ভেবে দেখে নি। তার ছাত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক থেকে ব্যাপারটা দেখেছে।

"হাইপোথিসিস হিসেবে তোমারটা ঠিকই আছে," বললো কেএসকে। "এখন এইটার পক্ষে প্রমাণ আর যুক্তি দাঁড় করাইতে হইবো।"

"জি, স্যার।" আমিনুলের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

"তুমি তোমার মতো কইরা আগাইতে থাকো, আর আমি যদি কিছু পাই তোমারে জানামু।" চায়ের কাপটা রেখে উঠে দাঁড়ালো সে।

তার দেখাদেখি আমিনুলও উঠে দাঁড়ালো। "স্যার কি চলে যাচ্ছেন?"

"হ। পরে তোমার সাথে কথা বলবো। এখন যাই।" দরজার দিকে পা বাড়ালো কেএসকে।

ডেস্কের উপর রুমালটা পড়ে থাকতে দেখে আমিনুলের একটা কথা মনে পড়ে গেলো। "স্যার, রুমালের ব্যাপারটা তো বললেন না?"

দরজার কাছ থেকে ঘুরে দাঁড়ালো সাবেক ইনভেস্টিগেটর।

"রুমালটা ভিক্টিমের না। ওইটাতে ক্লোরোফর্ম মাখানো ছিলো। খুন করার আগে ভিক্টিম্‌রে কিডন্যাপ করা হইছিলো...বুঝলা।"

অবাক হলো আমিনুল। "তাই নাকি?"

মুচকি হাসলো মিঃ খান। "এইটা তোমার হাইপোথিসিসের পক্ষে যায় কিনা বুঝবার পারতাছি না।"

চওড়া হাসি দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো কেএসকে।

অধ্যায় ২৮

নিজের চেম্বারে বসে পুরনো কিছু কেসের কাগজপত্র দেখছে ব্যারিস্টার রুহিন। তার সামনে বসে আছে সায়েম নামের তরুণ এক আইনজীবি। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের উপর গ্র্যাজুয়েশন করেছে কয়েক মাস আগে। এখন রুহিনের সাথে প্র্যাকটিস করছে। বেশ ব্রাইট। রুহিনের ধারণা ভবিষ্যতে ভালো করবে এই ছেলেটা। তারা দু'জন একটু আগে লাঞ্চ করে কফির অর্ডার দিয়েছে।

"স্যার, আপনার কেসের খবর কি?" সায়েম জানতে চাইলো।

"ভালো," কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বললো ব্যারিস্টার। এ ক'দিনে ক্লায়েন্টদের কেসগুলো দেখার ফুরসত পায় নি, ব্যস্ত ছিলো নিজের কেসটা নিয়েই।

"আপনি নিজেই কি লড়বেন?"

এবার সায়েমের দিকে মুখ তুলে তাকালো। "হুম।"

"সেটাই ভালো হবে।"

"তুমিও থাকছো আমার সাথে।"

"থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার," হাসিহাসি মুখে বললো সায়েম।

"থ্যাঙ্কস দেবার কিছু নেই। কেসটা খুব জটিল। তোমার মতো ফ্রেশ আর ব্রাইটদের সাহায্য লাগবে। আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জিং কেস হবে এটা।"

"আপনি কোনো চিন্তা-" সায়েম থেমে গেলো।

ডেস্কের উপর রাখা রুহিনের ফোনটা বাজছে। বিরক্ত হয়ে ডিসপ্লের দিকে তাকালো। একটা অপরিচিত নাম্বার। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কলটা রিসিভ করলো সে।

"হ্যালো, ব্যারিস্টার রুহিন'স স্পিকিং..."

ওপাশ থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই।

জাল

"হ্যালো?" তাড়া দিলো ব্যারিস্টার। মুহূর্তে তার চোখমুখ কুচকে গেলো। ওপাশ থেকে কিছুক্ষণ শোনার পর উত্তেজিত হয়ে বললো সে, "কে বলছেন?...হ্যালো? হালো?"

লাইনটা কেটে দেয়া হলেও কয়েক সেকেন্ড ফোনটা কানে চেপে ধরে রাখলো সে।

"শূয়োরেরবাচ্চা!" দাঁতে দাঁত পিষে বললো রুহিন।

"স্যার, কি হয়েছে?" সায়েম উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইলো।

স্থিরদৃষ্টিতে সহকারী ছেলেটার দিকে চেয়ে থাকলেও তার চিন্তাভাবনা খেলে যাচ্ছে অন্য একটা বিষয় নিয়ে।

হুট করে উঠে দাঁড়ালো রুহিন। সায়েমও উঠে দাঁড়ালো। সে কিছু বুঝতে পারছে না।

"তুমি থাকো, আমি আসছি," সহকারীকে বললো সে।

ছেলেটা কিছু বলতে গিয়েও বললো না, তার বস্ দ্রুত চেম্বার থেকে বের হয়ে গেলো।

ডিবি অফিস থেকে বের হয়ে অনেকটা পথ হেটে চলে এলো কাকরাইলের মোড়ে। কোথায় যাবে ঠিক করতে পারছে না। দুপুরের খাওয়া হয় নি। কিছু খেয়ে নিলে ভালো হতো কিন্তু কী খাবে সে-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। এরকম প্রায়ই হয়। বিশেষ করে খাবারের বেলায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যায় কিন্তু কী খাবে ঠিক করতে পারে না। ছোটোবেলা থেকেই খাওয়া-দাওয়ার প্রতি তার নির্লিপ্ততা। এই বিষয়টা নিয়ে কখনও মাথা ঘামায় নি। এটা খেতে হবে ওটা খেতে হবে–আজকালকার টিনএজারদের মতো স্বভাব ছিলো না তার। তখন অবশ্য ফাস্টফুড আর পিজ্জা-পাস্তার আগ্রাসনও ছিলো না। তবে অনেক মুখরোচক খাবার ছিলো। পুরনো ঢাকার অলিগলিতে বিরানী, কাচ্চি, তেহারি, কাবাব, হালিম, লাচ্ছি এসবের কোনো কমতি ছিলো না।

এখনও ওগুলো আছে তবে নিত্যনতুন ব্র্যান্ডের ফাস্টফুডের সামনে কেমনজানি দীনহীন হয়ে পড়েছে। স্কুল-কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের কাছে ফাস্টফুডই স্মার্ট, আধুনিক। যদিও দেশী খাবারের

চেয়ে ওগুলো অনেক ব্যয়বহুল। তাতে কি, স্ট্যাটাস মেইনটেন করতে হবে না? খাওয়ার পর ভালো না লাগলেও বলতে হবে : অসাম টেস্ট!

কখন যে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে এসব ভেবে যাচ্ছে টেরই পায় নি, তার সম্বিত ফিরে এলো মোবাইলফোনের রিং বেজে ওঠায়।

এ সময়েই ফোন করার কথা, সব সময় তাই হয় কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে কলটা রিসিভ করলো।

"হ্যালো?" ম্রিয়মান কণ্ঠে বললো সে।

"ঘটনা কি?" সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝালো গলায় বললো। "আমার ফোন ধরছো না কেন? সমস্যাটা কি? তুমি কি আমাকে এভয়েড করতে চাইছো?"

কেএসকে কিছু বলার সুযোগই পেলো না। একনাগাড়ে বলে একটু থামলো ওপাশের কণ্ঠটা। তবে ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলার শব্দটা স্পষ্ট শুনতে পেলো সাবেক ইনভেস্টিগেটর।

"আরে কী যে কও না," কাচুমাচু ভঙ্গিতে বললো সে। "তোমারে এভয়েড করতে যামু কেন?...এই একটু ব্যস্ত ছিলাম–"

"মিথ্যে বলবে না," মাঝপথেই কাটাকাটাভাবে বলে উঠলো ওপাশ থেকে। "তুমি ভালো করেই জানো আমি তোমার মিথ্যে ধরে ফেলি।"

সত্যি! তার সামান্য মিথ্যেও সে ধরে ফেলে। এবারও তাই হয়েছে। কিন্তু কিভাবে যে ধরে ফেলে সেটা আজো বুঝতে পারে না। চুপ মেরে রইলো কেএসকে।

"তুমি কেন আমার ফোন ধরছো না সেটাও জানি...ভালো করেই জানি।"

নিশ্চুপ কেএস খান।

"ঐ যে আইনস্টাইন না কী যেনো একটা ছেলে আছে...ওকে চোর হিসেবে সন্দেহ করেছিলাম আমি, সেটা তোমার পছন্দ হয় নি। তাই না?"

একদম সত্যি। কিন্তু কেএসকের মুখে রা নেই।

"বয়স হচ্ছে কিন্তু ছেলেমানুষি দিন দিন বাড়ছে তোমার," ভৎর্সনার সুরে বললো। "ঐ সামান্য কথাতেই স্কুলবয়দের মতো গাল ফুলিয়ে বসে আছে। যত্তসব।"

"ফোনটা কিন্তু অয় চুরি করে নাই," আস্তে করে বললো সে। "এইটা আমি ভালা কইরাই জানি।"

"আ-চ্ছা," টেনে বললো। "তাহলে বলো কে চুরি করেছে?"

"সেইটা তো ইনভেস্টিগেশন কইরা বাইর করতে–"

"ইনভেস্টিগেশন!" আবারো তার কথা পুরোপুরি শেষ করতে দিলো না। "এটা ছাড়া তুমি আর কিছু ভাবতেও পারো না। সারাটা জীবন এ-ই করে গেলে...তাও বিনিময়ে যদি কিছু পেতে...শেষ পর্যন্ত তো ওখানেও থাকতে পারলে না...ওরা তোমাকে বের করে দিলো!"

"তুমি ভালা কইরাই জানো আমি নিজে চাকরিটা ছাইড়া দিছি...ওরা আমারে বাইর কইরা দেয় নাই।"

"হুম, বুঝেছি।"

একটু বিরতি দিলো। শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য? সম্ভবত।

"...এই ফোন চুরি নিয়েও ইনভেস্টিগেশন করছো এখন?"

নিশ্চুপ কেএসকে।

"দারুণ! এজন্যেই কথায় বলে ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে! তুমি কি দুনিয়ার সব ঘটনা নিয়ে ইনভেস্টিগেশন করবে?"

"না, তা না..."

"আমার তো তাই মনে হচ্ছে। তোমার ঘরে একটা চড়ুই পাখি ঢুকে পড়লেও সেটা নিয়ে ইনভেস্টিগেশন করা শুরু করে দেবে–এতো বাড়ি থাকতে এই চড়ুইটা আমার বাড়িতে কেন ঢুকলো? তার মতলব কি? এটা কিসের আলামত..."

কথাটা শুনে কেএসকের হাসি পেয়ে গেলো, একটু শব্দও বের হয়ে গেলো হয়তো।

"তুমি হাসছো কেন?"

খাইছে! "কই হাসছি?" হেসেই বললো সে।

"আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তুমি মিটিমিটি হাসছো।"

বাপ্‌রে! দেখতেও পায়? "কী যে কও না..."

"অসহ্য!" বিরক্ত হয়ে বললো ওপাশ থেকে।

"আরে বাদ দাও তো এইসব কথা।"

"হ্যা, বাদই দিবো...আমি আর তোমার ব্যাপারে নাক গলাবো না। তোমার যা খুশি তাই করো...কাজের ছেলেকে চোর বলেছি বলে গাল ফুলিয়ে বসে আছো। আমার ফোন ধরো না..."

"কী শুরু করলা," ওপাশের জনকে প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে বললো সে। "সামান্য একটা বিষয় নিয়া..." এবার নিজে থেকেই থেমে গেলো কেএসকে। কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

"ঠিক আছে, রাখি। জুবায়ের ডাকছে। পরে কথা হবে।"

"আচ্ছা," ছোট্ট করে বললো। ফোন রাখতে হলে সব সময় জুবায়েরের কথা বলে কেন? ভেবে পেলো না কেএসকে।

"ভালো কথা, তুমি কি বাড়ির বাইরে?"

"হ।"

"দুপুরে খেয়েছো?"

"না, টাইম পাইলাম কই।"

"আশ্চর্য, তোমার না গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম আছে...এতো দেরি করে খেলে হবে?"

মনে মনে হাসলো সে। না, হবে না।

"এখন ক'টা বাজে জানো?" কেএসকে কিছু বলার আগেই আবার বলতে লাগলো, "জলদি খেয়ে নাও।"

"আচ্ছা।"

ওপাশ থেকে ফোনটা রেখে দিলে মনে মনে হাসলো সে। পরক্ষণেই টের পেলো তার বুক জ্বালাপোড়া করছে।

গ্যাস্ট্রিক!

খাবারের চিন্তাটা ফিরে এলেও সিদ্ধান্তহীনতা থেকে বের হতে পারলো না। ফোনটা পকেটে রেখে রাস্তা পার হতে যাবে অমনি রিং হলো আবার। ফোনটা কানে চাপলো।

"এক্কেবারে ঠিক সময় ফোন দিছেন।"

ওপাশে থাকা ব্যারিস্টার রুহিন মালিক বুঝতে পারলো না।

"কী খামু এইটা নিয়া বিরাট সমস্যার মইধ্যে পইড়া গেছি...হা-হা-হা," হেসে ফেললো কেএসকে। "আপনে তো আবার এইসব ব্যাপারে ওস্তাদ।"

ব্যারিস্টার অবাক, সে এখনও লাঞ্চ করে নি!

"আরে না, টাইমই পাই নাই। এখন করুম।"

ওপাশ থেকে উদ্বিগ্ন ব্যারিস্টারের কথা শুনে গেলো কেএস খান।

"ও...তাইলে আমি কি আপনের চেম্বারে আসুম?..."

না, তার আসার দরকার নেই। রুহিন এখন পুরনো ঢাকায় তার বাসার দিকে যাবার জন্য বের হয়েছিলো। কাকরাইলের খুব কাছেই আছে। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করলেই চলে আসতে পারবে। কেএসকে তাকে জানিয়ে দিলো এখন সে কোথায় আছে।

"ঠিক আছে, তাইলে আমি এইখানেই থাকি। আপনে আসেন।"

ফোনটা রেখে উদাস হয়ে গেলো কেএসকে।

লোকটা পাগল নাকি?

অধ্যায় ২৯

নিহত ব্যবসায়ি রফিক হাওলাদারের অফিসে দ্বিতীয়বারের মতো এসেছে আমিনুল। প্রথমবার যে কাজটা করা উচিত ছিলো সেটা করতে ভুলে গেছিলো। তার শিক্ষক ভুলটা ধরিয়ে দিলে নিজের কাছেই খারাপ লেগেছিলো। এই সহজ ব্যাপারটা মিস করা ঠিক হয় নি। কোনো ইনভেস্টিগেশনে নামার পর এরকম ভুল করাটা একদম আনাড়িপনার লক্ষণ। কিন্তু সে তো আনাড়ি কেউ নয়। ডিবির উদীয়মান কর্মকর্তাদের একজন। বড় বড় কেসগুলো তাকেই দেয়া হয়।

রফিক হাওলাদারের অফিসের লোকজন তাকে আবার দেখতে পেয়ে তটস্থ হয়ে গেছে। প্রথমবার যখন এসেছিলো তখন একা আসে নি আমিনুল। রীতিমতো পাঁচ-ছয়জনের একটি টিম নিয়ে এসেছিলো। সমস্ত কর্মকর্তা আর কর্মচারিদের এক জায়গায় জড়ো করে কঠিন জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। নিরীহগোছের এসব লোকজন নার্ভাস হয়ে সহজ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়েও গুলিয়ে ফেলেছিলো।

আমিনুল জানে তার জায়গায় মি: খান হলে ভিন্ন আচরণ করতেন। তার এই শিক্ষক একেবারেই অন্যরকম একজন মানুষ। জাঁদরেল ডিবি অফিসার হলেও হাবভাবে সেটা কখনও প্রকাশ পেতো না। প্রিয় শিক্ষকের অনেক কিছু অনুসরণ করলেও এই একটা দিক আত্মস্থ করা এখনও সম্ভব হয় নি—পুলিশি দাপট না দেখানো।

আমিনুল মনে করে এটা দেখানোর দরকার আছে। সন্দেহভাজন যদি পুলিশকে ভয়ই না পেলো তাহলে কি চলে? কেএসকের মতো তীক্ষ্ণ মেধা নেই তার। একটু দাপট না দেখালে তার চলে না।

সে এখন বসে আছে রফিক হাওলাদারের ম্যানেজারের রুমে। ভদ্রলোক একটু আগে রুম থেকে বের হয়ে গেছে একজনকে ডেকে আনতে। ইন্টারকম চেপে বলে দিলেই হতো, কিন্তু না, নিজেই ডেস্ক ছেড়ে

উঠে গেছে। আমিনুলের ধারণা তার মুখোমুখি বসে থাকতে ভদ্রলোক অস্বস্তি বোধ করছে হয়তো। কিংবা কে জানে, কর্মচারিকে ডেকে আনতে গিয়ে টয়লেটেও যেতে পারে।

একটু কাশির শব্দ শুনে দরজার দিকে তাকালো আমিনুল। হ্যাংলা মতোন এক ছেলে চায়ের ট্রে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"আসো," আস্তে করে বললো সে।

ছেলেটা চুপচাপ চায়ের কাপ রেখে ঘর থেকে চলে গেলো।

চায়ের গন্ধ প্রলুব্ধ করতেই কাপটা তুলে নিয়ে এক চুমুক দিলো। *বাহ্! এরা তো ভালো চা বানায়।* তাদের ডিবি অফিসে যে চা বানানো হয় সেটা আসলে গরম পানির শরবত। চা নামের কলঙ্ক।

"ও, চা দিয়েছে তাহলে..." দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বললো ম্যানেজার। "ভালো, ভালো।"

আমিনুল কিছু বললো না। পায়ের উপর পা তুলে চায়ে চুমুক দিলো আবার।

নিজের ডেস্কে বসে পড়লো ম্যানেজার। হাসিহাসি মুখ করে রেখেছে। "স্যার মারা যাবার পর থেকে পুরো অফিসটা আমাকেই সামলাতে হচ্ছে...খুবই কঠিন অবস্থা।"

"উনি তো মারা যান নি...খুন হয়েছেন," চায়ে চুমুক দিয়েই বললো আমিনুল।

থতমত খেয়ে গেলো ভদ্রলোক। "জি, জি...তা তো ঠিকই..." আর কথা খুঁজে পেলো না।

"আপনার নিজের তো যাওয়ার দরকার ছিলো না...কাউকে পাঠালেও হতো।"

আমিনুলের এ কথায় কৃত্রিম হাসি এঁটে বললো ম্যানেজার, "আমি নিজে না গেলে এমন রিকোয়েস্ট ওরা রাখতো না। সিকিউরিটির ব্যাপারটা এই ভবনের সবগুলো ফার্ম জয়েন্টলি করে থাকে। সেজন্যেই বিষয়টা ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হয়েছে...ওই ছেলেটা বললো পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যেই খুঁজে বের করে নিয়ে আসতে পারবে।"

আমিনুল কিছু না বলে আবারো চায়ে মনোযোগ দিলো।

"কিছু ধরতে পারলেন?" ম্যানেজার যেনো নিছক কথা বলার জন্যই

জিজ্ঞেস করলো।

"না, এখন তো মাত্র তদন্ত শুরু করলাম, সময় লাগবে। এতো সহজে রেজাল্ট পাওয়া যায় নাকি," কথাটা বলেই মনে মনে হেসে ফেললো সে। একেবারে কেএস খানের মতো বলে ফেলেছে!

"তা তো ঠিকই, আস্তে ধীরে করাটাই ভালো।"

"আমি তো বলি নি আস্তে-ধীরে তদন্ত করছি," শান্তকণ্ঠে বললো আমিনুল। ম্যানেজার ভড়কে গেলো কিছুটা। "তদন্ত আমরা পূর্ণগতিতেই করছি। কিন্তু রেজাল্ট পেতে একটু সময় লাগবে। কেসটা খুব জটিল।"

কথা বলার আগেই মাথা নেড়ে সায় দিলো ভদ্রলোক। "জি, জি, তা তো ঠিকই। কেসটা আসলেই জটিল।"

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আয়েশী ভঙ্গিতে বললো ডিবির ইনভেস্টিগেটর, "রফিক সাহেবের সাকসেসর কে হচ্ছেন? মানে তার তো কোনো সন্তান নেই। ডিভোর্সি ছিলেন। সমস্ত সম্পত্তি আর এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কে পাচ্ছে?"

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ম্যানেজারের ভেতর থেকে। "কে আর পাবে...তার দুই ভাই ছাড়া তো দাবি করার মতো কেউ নেই।"

"ও," খালি চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখলো আমিনুল।

"একটা মানসিক প্রতিবন্ধী টাইপের...অন্যজন বাড়ি ভাড়া দিয়ে চলে। জীবনে ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা চাকরি-বাকরি কিছুই করে নি। বুঝুন এবার। এরা হবে এসব সম্পত্তির মালিক।"

"মানসিক প্রতিবন্ধী হলে কি সম্পত্তির ভাগ পাবে?" কৌতুহল নিয়ে জানতে চাইলো সে। "আমি অবশ্য সাকসেশন ল'টা অতো ভালো জানি না..."

"পুরোপুরি প্রতিবন্ধী না তো...ওই রকম আর কি," ঠোঁট উল্টে বললো ভদ্রলোক। "একটু হাবাগোবা টাইপের।"

"আচ্ছা," মাথা নেড়ে সায় দিলো আমিনুল।

এমন সময় দরজায় টোকা দেবার শব্দ হলো।

"ভেতরে আসো," ম্যানেজার বললো।

ভুড়িওয়ালা নাদুসনুদুস এক যুবক ঢুকলো ঘরে। তার হাতে একটা এনভেলপ। তাদের দু'জনকে সালাম দিয়ে চুপচাপ ডেস্কের সামনে এসে

দাঁড়িয়ে রইলো সে।

"উনাকে দাও," ম্যানেজার বললো ছেলেটাকে।

নাদুসনুদুস আমিনুলের দিকে ছোটোখাটো একটা এনভেলপ বাড়িয়ে দিলো।

আমিনুল এনভেলপটা খুলে দেখতে পেলো একটা সিডি। "কতোক্ষণের ফুটেজ আছে?"

নাদুসনুদুস সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো, "সাড়ে সাতান্ন মিনিট।"

ডিবির ইনভেস্টিগেটর ভুরু কুচকে তাকালো। "এতো কম?"

ম্যানেজারও সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো সিকিউরিটির দায়িত্বে থাকা ছেলেটির দিকে।

"ঐদিনের চব্বিশ ঘণ্টার ফুটেজ লাগবে আমার," বললো আমিনুল।

মটকুটা যেনো খুব মজা পেয়েছে। তার মুখে নীরব হাসি। "পুরা চব্বিশ ঘণ্টার ফুটেজই আছে এখানে।"

"তুমি না বললে সাতান্ন মিনিটের ফুটেজ?"

"হ্যা, তাই তো," আমিনুলের সাথে তাল মেলালো ম্যানেজার। "সাতান্ন মিনিটই বলেছো।"

নাদুসনুদুসের হাসি এতোটাই প্রসারিত হলো যে তার কুতকুতে চোখ দুটো স্ফীতগালের চোটে ঢাকা পড়ে গেলো।

প্রতিটি কর্মক্ষেত্রের নিজস্ব কিছু ব্যাপার থাকে, অন্য কেউ যখন সে-সব বুঝতে পারে না তখন এক ধরণের আত্মপ্রসাদ হয়। নাদুসনুদুসেরও তাই হলো।

"আমাদের সিসি ক্যাম প্রতি সেকেন্ডের জন্য পঁচিশটা ফ্রেম টেক করে না, বুঝলেন?"

তাদের দু'জনের কেউই বুঝলো না।

"আমাদের ক্যামগুলো টাইম ল্যাপ্স করে–"

"কি ল্যাপ্স করে?" বুঝতে না পেরে ম্যানেজার কথার মাঝখানে বলে উঠলো।

"টাইম ল্যাপ্স, স্যার," দম নিয়ে আবার বললো নাদুসনুদুস, "প্রতি সেকেন্ডে এইসব ক্যামেরা একটা করে ফ্রেম টেক করে...মিনিটে টেক করে ষাটটা। এক মিনিটের ফুটেজ দেখা যাবে মাত্র আড়াই সেকেন্ডের মধ্যে।

তাহলে বুঝেন, এক ঘন্টার ফুটেজ দেখতে লাগবে, এই ধরেন..."

আমিনুল হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলো। সে বুঝতে পেরেছে। এই মটকুর কাছ থেকে গণিতের ঐকিক নিয়ম শোনার ইচ্ছে তার নেই। "ঠিক আছে। বুঝতে পেরেছি।"

ম্যানেজারের চেহারা দেখে অবশ্য মনে হলো না সে বুঝতে পেরেছে। তারপরও আমিনুলের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বুঝে নিয়ে ইশারা করে মটকুকে রুম থেকে চলে যেতে বললো।

উঠে দাঁড়ালো আমিনুল। "থ্যাঙ্কস মিঃ–" ম্যানেজারের নামটা ভুলে গেছে সে।

"পাটোয়ারি, আনোয়ার হোসেন পাটোয়ারি," নিজের ডেস্ক থেকে উঠে গদগদ হয়ে বললো ভদ্রলোক।

হাত বাড়িয়ে দিলো আমিনুল। "থ্যাঙ্কস মিঃ পাটোয়ারি, ফর ইউর কো-অপারেশন।"

"ইটস মাই প্লেজার," সৌজন্যবশত বললো সে। মুখে এখনও কৃত্রিম হাসি লেগে রয়েছে।

ভদ্রলোকের হাতটা ঘেমে ভিজে আছে। হাতটা ছেড়ে দিয়ে মুচকি হেসে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো ডিবির ইনভেস্টিগেটর।

পুলিশের সামনে সবাই নার্ভাস হয়ে যায়।

অধ্যায় ৩০

তারা দু'জন বসে আছে সেগুনবাগিচার একটি রেস্টুরেন্টে। ব্যারিস্টার রুহিন অবশ্য অন্য কোথাও যেতে চেয়েছিলো, তার ভাষায় 'আরো ভালো কোনো জায়গায়।'

কেএসকের খুব অস্বস্তি হচ্ছে কারণ সে একাই খাচ্ছে। তার সামনে পরোটা আর মুরগির ঝালফ্রাই। রুহিন মালিক তার বিপরীতে বসে থাকলেও কিছু খাচ্ছে না। এখানে আসার আগেই লাঞ্চ করেছে নিজের চেম্বারে। সাবেক ইনভেস্টিগেটরের মনে হচ্ছে ব্যারিস্টার তার খাওয়ার ধরণ দেখছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। বাস্তবিক সেটা সত্যি নাও হতে পারে। হয়তো তার কাছেই শুধু এটা মনে হচ্ছে। সম্ভবত টেলিফোন কলটা নিয়েই ভেবে যাচ্ছে সে।

খাওয়ার সময় কথা বলতে ভালো লাগে না কেএসকের, তারপরও কথা বললো।

"আপনি শিওর হইলেন কেমনে ওইটা মিঃ মাহবুবই করছেন?" পরোটার ছোট্ট একটা টুকরো ঝোলে ভিজিয়ে মুখে দিতে দিতে বললো সে।

"এ মুহূর্তে আমার সাথে আর কেউ তো গেম খেলছে না, মিঃ খান," শান্তকণ্ঠেই বললো ব্যারিস্টার। "তাছাড়া ওর গলার স্বরটা পুরোপুরি ধরতে না পারলেও বলার ভঙ্গিটা কিন্তু ধরতে পেরেছি।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো কেএসকে। "খালি এইটাই কইলো?"

"হুম।"

"আচ্ছা, তাইলে ঠিক আছে।"

"কি ঠিক আছে?" অবাক হলো রুহিন মালিক।

"ওই যে, গেম খেলবার চাইতাছে...খেলুক। নো প্রবলেম," এক টুকরো মুরগির মাংস তুলে নিলো এবার।

"এটা কি চিন্তার বিষয় না?"

"না।" ছোট্ট করেই জবাব দিলো। তার মুখে এখন খাবার। "ব্যাপারটা আমিনুল্‌রে জানানো উচিত। কেসটা কিন্তু ও-ই ইনভেস্টিগেট করতাছে।"

ব্যারিস্টার চুপচাপ শুনে গেলো।

"ডিবির কাছে এমন ডিভাইস আছে যা দিয়া ফোনকল চেক করা যায়। কলটা কে করছে, কইত্থেকা করছে সেইটা বের করা দরকার।"

"আপনার স্টুডেন্ট তো বিশ্বাসই করবে না কলটা মাহবুব করেছে," বললো রুহিন। "ফোনে এই একটা কথা শুনে আমি কী করে শিওর হলাম...এটা নিয়ে প্রশ্ন করবে।"

নিঃশব্দে হাসলো কেএসকে। "তা তো করবোই...এইটা নিয়া ভাইবেন না," খেতে খেতে বললো মিঃ খান।

"কলটা যদি মাহবুব সাহেব করেও থাকে তাহলে সেটা ট্র্যাকডাউন করে কোনো ফায়দা হবে না। লোকটার মাথায় সমস্যা থাকলেও এতো কাঁচা কাজ করবে না সে।"

সাবেক ইনভেস্টিগেটর চেয়ে রইলো, কিছু বললো না।

"আপনার কি ধারণা মাহবুব সাহেব এতো কাঁচা কাজ করবে?" জবাবের অপেক্ষা না করেই আবার বললো, "যে লোক অপারেশন টেবিলে থেকে একটা মার্ডার করতে পারে সে এতো বড় ভুল করবে না।"

"ভুল সবতেই করে। টু এরর ইজ হিউম্যান। শেক্সপিয়ার সাহেব বহু আগেই বইলা গেছেন।"

"আমি একটা ব্যাপারে ভয় পাচ্ছি," বললো তরুণ ব্যারিস্টার।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো কেএসকে। আয়েশ করে খাবার চিবোচ্ছে সে।

"ঐ সাইকোটা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারে হয়তো।"

মাথা দুলিয়ে বাতিল করে দিলো কেএস খান। "কিচ্ছু করবো না। যে করে সে টেলিফোন কইরা এইসব সিনেমা-মার্কা ডায়লগ দিবো না।"

"কিন্তু লোকটা তো স্বাভাবিক না...বদ্ধ উন্মাদ। আপনি বুঝতে পারছেন না, সে কি করবে কেউ জানে না।"

সাবেক ইনভেস্টিগেটর কিছু বললো না। সে জানে, নিজের ব্যাপারেই মানুষ শতভাগ গ্যারান্টি দিতে পারে না, অন্যের ব্যাপারে দেয়ার তো প্রশ্নই আসে না। করলেও করতে পারে। হাজার হোক, লোকটা একেবারে ক্ষ্যাপা টাইপের।

"বললাম তো সমস্যা নাই...আমি আমিনুল্‌রে জানাইতাছি। এই কেসের সব ধরণের আপগ্রেড ওরে জানানো দরকার।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাথা নেড়ে সায় দিলো ব্যারিস্টার।

"আপনেও চলেন আমার সাথে..." পানির গ্লাসটা তুলে নিলো কেএসকে। "দুইজনে একসাথে যাই।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাথা নেড়ে সম্মতি দিলো রুহিন, তারপর "ওয়েটার," বলে ডাক দিলো সে।

সাবেক ইনভেস্টিগেটর মনে করলো রুহিন হয়তো চা-টায়ের অর্ডার দেবে। কিংবা কোল্ড ড্রিঙ্কসের।

"জি, স্যার," ওয়েটার ছেলেটা কাছে এসে বললো।

"বিল কতো হয়েছে?"

"আরে, রাখেন," সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো কেএসকে। "আপনে কেন দিবেন। রাখেন তো..."

ভুরু কুচকে তাকালো রুহিন। "কেন, আমি দিলে সমস্যা আছে?"

"সমস্যা আছে না," হেসে বললো মিঃ খান। "খাইতাছি আমি আর বিল দিবেন আপনে...এইটা হয়?"

"কেন হয় না?"

"প্লিজ, এইটা নিয়া আর কথা বাড়ায়েন না।"

কেএসকের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে ওয়েটারকে চলে যেতে বললো ব্যারিস্টার। সে জানে, এই লোকের সাথে জোড়াজুরি করা ঠিক হবে না।

খাওয়া শেষে বিল মিটিয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে বের হবার পর গাড়িতে উঠেই রুহিন মালিক বললো, "আমার কেসে আপনি কাজ করছেন। সময় দিচ্ছেন, এরজন্য কিছুই নেবেন না, ঠিক আছে। আমি আর এটা নিয়ে কথা বলবো না। কিন্তু যাতায়াত কিংবা খাওয়া-দাওয়ার জন্যেও তো কিছু খরচ হচ্ছে...সেটা যদি আমি দেই তাহলেও কি সমস্যা আছে?"

হাসলো কেএসকে। "অবশ্যই সমস্যা আছে।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো ব্যারিস্টার।

"কারণ আমার পকেটে তো ট্যাকা আছে, না থাকলে একটা কথা আছিলো।"

দু'হাত তুলে আত্মসমপর্নের ভঙ্গি করলো রুহিন। "কি জানি। মনে হচ্ছে টাকা-পয়সার ব্যাপারে আপনার অন্যরকম ফিলোসফি রয়েছে।"

"আরে ওইসব কিছু না, জিনিসটা খুব সিম্পল। ট্যাকা-পয়সা হইলো সবচে' দরকারি ক্ষতিকর জিনিস। এইটা না হইলেও আমাগো চলে না। তাই চেষ্টা করি যতোদূর সম্ভব এড়ায়া যাইতে।"

"টাকা-পয়সাকে?" গাড়ির স্টিয়ারিঙের উপর হাত রেখে বললো ব্যারিস্টার।

মাথা নেড়ে সায় দিলো কেএস খান। "শুনেন, আলেকজান্ডারের সময় গ্রিসে ডায়োজিনিস নামের এক ফিলোসফার আছিলো...খুবই সাদামাটা জীবনযাপন করতো। মানে, যতোদূর সম্ভব আর কি...তো, আলেকজান্ডার সাহেব বিশ্বজয় কইরা দেশে ফিরা আইলো...দেখা করলো ওর শিক্ষক অ্যারিস্টটলের সাথে। অনেক কথা বলার পর কইলো, 'গুরু, আপনের জন্য আমি কি করতে পারি, বলেন?' অ্যারিস্টটল গম্ভীর হইয়া কইলো, 'আমার জন্য কিছু করন লাগবো না। তুমি ডায়োজিনিসের সাথে দেখা করো। তার জন্য কিছু একটা করো।"

একটু চুপ মেরে গেলো কেএসকে। দেখতে পেলো রুহিন তার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনে যাচ্ছে।

"আলেকজান্ডার কি ঐ ফিলোসফারের সাথে দেখা করেছিলো?" বললো সে।

"হুম। আলেকজান্ডার তার দলবল নিয়া গেলো তার কাছে। গিয়া দেখে একটা চাদর পইরা রোদে বইসা আছে ডায়োজিনিস। একটা থালা আর চাদর ছাড়া ওর কিছু ছিলোও না। থাকতো মাটির গর্তে..." ঢেকুর তুললো মিঃ খান। "...তো আলেকজান্ডার দি গ্রেট কইলো, 'হে মহান ডায়োজিনিস, আপনি আমার কাছ থেকে কি চান? যা চাইবেন তা-ই পাবেন।' " কেএসকের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। "ডায়োজিনিস কি চাইলো জানেন?"

রুহিন মালিক জানে না, তবে সে আন্দাজ করতে পারলো। "একটা স্কুল বানিয়ে দিতে বললো? গরীব এতিমদের জন্য কিছু করতে বললো?"

মাথা দোলালো সাবেক ইনভেস্টিগেটর। "হে কইলো, 'সইরা খাড়ান।' এইটা শুইনা তো আলেকজান্ডার টাস্কি খায়া গেলো। 'আপনের কারণে

তো আমি রোদ পোহাইতে পারতাছি না, কইলো দার্শনিক।' ”

রুহিন মুচকি হেসে ফেললো। “শুধু এটাই চাইলো?”

মাথা নেড়ে সায় দিলো কেএসকে। “হ, খালি এইটাই চাইলো। আর কিছু না।”

ভুরু তুললো তরুণ ব্যারিস্টার।

“আমি জানি, এই যুগে ওনার মতোন থাকা অসম্ভব...কিন্তু এখনকার দিনে মানুষ যেইভাবে জীবনটারে দেখে...যেইভাবে জীবনযাপন করে...সেইটাও ঠিক মনে হয় না।”

রুহিন ইগনিশনে চাবি ঢোকালো। “তাহলে তাদের কিভাবে লাইফ-লিড করা উচিত?”

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো কেএসকে। “মানুষ আসলে লাইফ লিড করে...কিন্তু তার উচিত লাইফটা সেলিব্রেট করা।”

ইগনিশনে চাবিটা ঘোরাতে গিয়ে থেমে গেলো রুহিন। “পার্থক্যটা কি?”

“একটা করে না বুইঝা...আন্দাধুন্দা...মানে জীবন আর জগত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না নিয়া...আরেকটা হইলো বুইঝা-শুইনা করা। আপনে যখন কোনো কিছু সেলিব্রেট করেন তখন কিন্তু জানেন ক্যান করতাছেন...কি করতাছেন।”

একটু ভেবে মাথা নেড়ে সায় দিলো ব্যারিস্টার। “আপনি কি তাহলে লাইফ সেলিব্রেট করেন?”

“হ,” একটু থেমে আবার বললো, “আমার মতো কইরা আর কি...”

রুহিন স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো।

ফাঁকা দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে বলতে লাগলো সে, “সব সময়ই আমার কোনো না কোনো অসুখ লাইগা থাকে...একা মানুষ...ভাবতে পারেন আমি সুখি না,” বলেই ফিরে তাকালো ব্যারিস্টারের দিকে। “কিন্তু বিশ্বাস করেন...আমি পুরা সুখি একজন মানুষ।”

আস্তে করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো রুহিন। “সুখ! কিভাবে এটা পাওয়া যায়!” প্রশ্নের মতো নয়, অনেকটা আক্ষেপের মতো শোনালো।

“তুচ্ছ...ইনসিগফিকেন্ট বিষয়গুলাই হলো সুখের খনি...কিন্তু আমরা বিরাট বিরাট ব্যাপার নিয়া মাইতা থাকি...বিরাট ব্যাপারগুলা আপনের

ইগোরে সন্তুষ্ট করে...আর কিছু না। এই ইগোরে খুশি করতে করতে সুখ কারে কয় ভুইলা যাই আমরা।"

"আপনি বলতে চাচ্ছেন, গাড়ি-বাড়ি, ধন-দৌলত, আরাম-আয়েশ এগুলো কিছু না?"

একটু চুপ থাকলো কেএসকে। "এগুলা আপনেরে সাচ্ছন্দ্য আইনা দিতে পারবো...সুবিধা দিবার পারবো কিন্তু সুখ দিবার পারবো কিনা সেই ব্যাপারে কোনো গ্যারান্টি নাই।"

রুহিন চুপ মেরে থাকলো কয়েক মুহূর্ত।

"একটা কথা কি জানেন?" জবাবের অপেক্ষা না করেই সাবেক ইনভেস্টিগেটর বললো, "সুখি হওয়া এতোটাই সহজ যে শেষ পর্যন্ত কাজটা কঠিন হইয়া যায়!"

কয়েক মুহূর্ত পাশের যাত্রির দিকে চেয়ে রইলো রুহিন। তারপর ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইগনিশনে চাবিটা ঘোরালো। শব্দ করে জেগে উঠলো ইঞ্জিন। গাড়িটা চলতে শুরু করলে তার মনে একটা প্রশ্নের উদয় হলো : সে কি তার জীবনটা এখন পর্যন্ত সেলিব্রেট করতে পেরেছে?

অধ্যায় ৩১

কিছুক্ষণ আগে ফুটেজ নিয়ে রফিক হাওলাদারের অফিস থেকে ফিরে এসেছে আমিনুল। ভিডিওটা দেখারও সুযোগ পায় নি, তার আগেই ব্যারিস্টার রুহিন মালিক আর কেএস খান এসে হাজির।

প্রথমে সে একটু ঘাবড়ে গেছিলো। হয়তো বিরাট কোনো ঘটনা ঘটে গেছে কিন্তু সব শুনে চুপ মেরে যায়। এটা এমন কোনো ব্যাপার না। অনেক কেসেই আসামীপক্ষ বাদীপক্ষকে টেলিফোনে হুমকি-ধামকি দিয়ে থাকে। অবশ্য ভয়-ভীতি দেখানোর চেষ্টা করে। এব্যাপারটা একটু অন্যরকম। এখানে আসামীপক্ষ দাবি করছে তাকে নাকি মাহবুব সাহেব ফোন করে হুমকি দিয়েছে। ঠিক হুমকিও না। বলেছে, তার সাথে একটা গেম খেলতে চায়।

তারা তিনজন এখন বসে আছে আমিনুলের অফিসে। কেএসকে নিষেধ করার পরও চা দেয়া হয়েছে তাদের জন্য। ব্যারিস্টার অবশ্য চায়ে এখনও চুমুক দেয় নি। তার কাছ থেকে চেম্বারের ল্যান্ডফোনের নাম্বারটা নিয়ে আমিনুল চেক করতে বলেছে জুনিয়র এক ছেলেকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জানা যাবে কোত্থেকে কলটা করা হয়েছে। হয়তো, কে করেছে সেটাও জানা যাবে তখন।

"স্যার, রফিক হাওলাদারের অফিসের সিসি-ক্যামের ফুটেজ কালেক্ট করেছি," বললো আমিনুল।

"গুড," চায়ে চুমুক দিয়ে বললো কেএস খান।

"সারাদিনের ফুটেজ...মাত্র সাতান্ন মিনিটের..."

মাথা নেড়ে সায় দিলো সাবেক ইনভেস্টিগেটর।

আমিনুল একটু অবাক হলো। সে ভেবেছিলো সাতান্ন মিনিটের ফুটেজের কথা শুনে অবাক হবে কেএসকে।

"কিসে কইরা নিয়া আসছো?" জানতে চাইলো সাবেক

ইনভেস্টিগেটর।

"একটা সিডি'তে আছে।"

"আমারে একটা কপি কইরা দাও।"

"দিচ্ছি, স্যার," বলেই ডেস্কটপ কম্পিউটারে একটা ব্লাঙ্ক সিডি ঢুকিয়ে রাইট করতে শুরু করলো সে।

এমন সময় তার ঘরে চলে এলো এক তরুণ।

কম্পিউটার থেকে ফিরে তাকালো আমিনুল। "হ্যা, বলো...কি পেলে?"

"স্যার, ফোনটা করা হয়েছে অন্য একটা ল্যান্ডফোন থেকে...এই যে, দেখুন," বলেই এক টুকরো কাগজ বাড়িয়ে দিলো সে।

আমিনুল কাগজটা হাতে নিয়ে পড়লো। "ঠিক আছে, তুমি যাও।"

ছেলেটা ঘর থেকে চলে গেলে কেএসকে আর ব্যারিস্টার আগ্রহী হয়ে উঠলো।

"ল্যান্ডফোন থেইকা করছে?!" বিস্মিত হলো কেএস খান। "তাইলে তো বিরাট বোকামি কইরা ফালাইছে। লোকেশনটা বাইর করা খুব সহজ হইবো এখন।"

"তাই তো মনে হচ্ছে, স্যার," আমিনুল বললো। কাগজের দিকে তাকালো আবার, "বনানীর একটি নাম্বার..."

"কি!" চমকে উঠলো রুহিন। তার বাড়িও বনানীতে।

"৯৮৪৭৫২৩৫..."

"হোয়াট!" ব্যারিস্টার যেনো নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারলো না।

আমিনুল আর কেএসকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো তার দিকে।

"এটা তো আমার বাসার ল্যান্ডফোনের নাম্বার!"

অধ্যায় ৩২

গোসল করে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো মাহবুব। নিজের চেহারাটা ভালো করে দেখে নিলো। একদম ঠিক আছে। সন্তুষ্ট হয়ে মুচকি হাসলো সে। পাশ ফিরে তাকালো।

বিছানার উপর চুপচাপ বসে আছে শায়লা। তার দিকে তাকাচ্ছে না। কী যেনো ভেবে যাচ্ছে।

"কি ভাবছো?" মাহবুব কাছে এসে বললো। তবে বেশি কাছে এলো না। সে জানে, ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করলেই শায়লা চলে যাবে।

মুখ তুলে তাকালো মেয়েটি। শুধু মাথা দোলালো। কিছু ভাবছে না।

"মন খারাপ?"

আবারো মাথা দোলালো সে।

মাহবুব গন্ধ খুঁজে বেড়ালো। পেলো না। তবে কি আজ পারফিউম ব্যবহার করে নি? সেজন্যেই কি তার মুড অফ?

কথা না বলে চুপচাপ ড্রেসিং টেবিলের কাছে ফিরে গেলো আবার। ড্রয়ার থেকে দামি একটা পারফিউম এনে সারা ঘরে স্প্রে করলো। শায়লার চারপাশ পারফিউম দিয়ে ভরিয়ে দিলেও মেয়েটার গায়ে স্প্রে করলো না। করলে কী হবে সে জানে না। তবে তার আশংকা, শায়লা চলে যাবে।

এবার মুখ তুলে তাকালো শায়লা। তার চোখেমুখে অন্যরকম এক অভিব্যক্তি। এই চাহনির সাথে মাহবুব পরিচিত।

শায়লার মুড ভালো হয়ে গেছে।

"আমি একটু তোমার পাশে বসি?" কাচুমাচু ভঙ্গিতে বললো সে।

শায়লা শুধু মুচকি হাসলো।

আস্তে করে শায়লার পাশে বসে পড়লো মাহবুব। তবে সচেতনভাবেই দূরত্ব বজায় রাখলো।

"তুমি কি আমাকে কখনও স্পর্শ করতে দেবে না?" কাতর হয়ে বললো

শায়লার স্বামী।

চুপ মেরে রইলো মেয়েটি।

"কতোদিন তোমাকে স্পর্শ করি না!" কাঁপা কণ্ঠে বলে উঠলো সে। "আমার অনেক ইচ্ছে করে...!"

নীরবতা।

"ঠিক আগের মতো...রাতে অফিস থেকে ফিরে আসার পর...ছুটির দিনে ঘুম থেকে উঠে...কিচেনে ঢুকে তোমাকে...ছাদে...গাড়িতে...সি-বিচে...কক্সবাজারে...তোমার প্রিয় জায়গায়..." অস্থির হয়ে উঠলো মাহবুব।

শায়লা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো। তার দু'চোখে মমত্ব।

"আমি তোমাকে স্পর্শ করতে চাই!" চিৎকার করে বললো সে। "আগের মতো!" দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললো এবার। "আগের মতো!"

ব্যারিস্টার রুহিন মালিক যতোটা বিস্মিত তারচেয়ে কোনো অংশে কম বিস্মিত হয় নি ডিবির তদন্তকারী কর্মকর্তা আমিনুল আর কেএসকে।

রুহিন মালিককে তার বাসা থেকেই ফোন করে একরকম প্রচ্ছন্ন হুমকি দেয়া হয়েছে! আর কাজটা নাকি করেছে ঐ মাহবুব সাহেব!

এটা তো অবিশ্বাস্য বললেও কম বলা হবে।

আমিনুলের কাছে মনে হচ্ছে ব্যারিস্টারের কথাবার্তায় ঘাপলা আছে। পুরো কেসটা জটিল করে ফেলার কোনো ষড়যন্ত্রও হতে পারে। ইনভেস্টিগেশনের প্রক্রিয়াটাকে কানাগলিতে ঢুকিয়ে দেবার অপচেষ্টা।

কিন্তু কেএসকে এরকম কিছু ভাবছে না। সে জানে, ব্যাপারটা অন্য কিছু হবে। তবে এরকম অভিনব ঘটনার কথা সে কখনও শোনে নি।

ডিবি অফিস থেকে বের হয়েই কেএসকে জানালো সে এখন বনানীতে যেতে চায়, ব্যারিস্টারের বাড়িতে। রুহিন কোনো প্রশ্ন করে নি। ঘটনার ধাক্কা এখনও সামলে উঠতে পারে নি। চুপচাপ সাবেক ইনভেস্টিগেটরকে নিয়ে রওনা দিলো বনানীর উদ্দেশ্যে। গাড়ি চালাচ্ছে ব্যারিস্টার। তার মধ্যে হতবিহ্বলতা আর উদ্বেগ একসাথে জট পাকাচ্ছে।

"এটা কিভাবে সম্ভব হলো, মিঃ খান?"

রুহিনের প্রশ্নের জবাব তার জানা নেই। সেও ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে যাচ্ছে। "কিভাবে সম্ভব হলো তা তো জানি না, তবে সম্ভব তো হইছেই, নাকি?"

"আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না," আক্ষেপে মাথা দোলালো তরুণ ব্যারিস্টার।

ডিবি অফিস থেকে বের হবার আগেই নিজের বাসায় ফোন করে কাজের ছেলে রানাকে জিজ্ঞেস করেছিলো অন্য কেউ তার ফ্ল্যাটে ঢুকেছিলো কিনা। ছেলেটা জবাব দেবার আগেই সে জানতো, কেউ ঢোকে নি। এটা প্রায় অসম্ভব। রানা এতো বড় ভুল করবে না। কোনো অপরিচিত লোককে কেন সে ফ্ল্যাটে ঢুকতে দেবে? রানা তার প্রশ্নটা শুনে দারুণ অবাক হয়েছিলো। এটা কি কখনও ঘটেছে–রুহিন বাসায় নেই আর তার ফ্ল্যাটে অচেনা কাউকে ঢুকতে দিয়েছে সে? অচেনা কেউ তাদের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকতে হলে তাকে কিছু প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়–নীচে দারোয়ানের প্রশ্নের জবাব দেয়া। দারোয়ান সন্তুষ্ট হলে ইন্টারকমের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটের সাথে যোগাযোগ করে জেনে নেয়া সত্যি সত্যি এ রকম কোনো লোকের আসার কথা কিনা, তারপর গেস্টবুকে সই করে ভেতরে ঢোকার অনুমতি মেলে।

"আমার ফ্ল্যাটে না ঢুকে আমার ফোন কিভাবে ব্যবহার করলো?" আপন মনেই বললো রুহিন।

মাথাটা নীচু করে চুপ মেরে বসে আছে কেএসকে। যেনো গভীর কোনো ভাবনায় ডুবে আছে এখন। পাশ ফিরে চকিতে দেখে নিলো ব্যারিস্টার।

"আপনার ঐ স্টুডেন্ট নিশ্চয় আমার কথাবার্তায় সন্দেহ করা শুরু করে দিয়েছে।"

মুখ তুলে তাকালো সে। "সেটাই তো স্বাভাবিক।"

অবাক হলো ব্যারিস্টার। "স্বাভাবিক?"

"হ, এইরকম ঘটনা ঘটলে সন্দেহ তো করবোই।"

ব্যারিস্টার আশাহত হলেও কথাটা মেনে নিলো। আমিনুলকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। পুরো ঘটনাটা রুহিনকে শুধু ভড়কেই দেয় নি, সন্দেহের মধ্যেও ফেলে দিয়েছে।

“আপনিও কি আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করে দিয়েছেন নাকি?” রাস্তার দিকে চোখ রেখেই বললো রুহিন।

“আরে না,” হেসে বললো কেএসকে।

“যাক, অন্তত আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন না।” কিছুক্ষণ চুপ মেরে থাকলো রুহিন। “আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না...” অনেকটা আপন মনে বললো ব্যারিস্টার। “...আমার ফ্ল্যাটে না ঢুকে আমার ল্যান্ডফোন কিভাবে ব্যবহার করলো ঐ বাস্টার্ডটা!”

এ কথাতেও কেএসকে'র ধ্যান ভাঙলো না। একমনে কী যেনো ভেবে যাচ্ছে সে।

রুহিন আর কোনো কথা বলে তার মনোযোগে ব্যঘাত ঘটাতে চাইলো না। তার অ্যাপার্টমেন্টের খুব কাছে এসে পড়েছে। বাকিটা পথ চুপ মেরেই রইলো।

রুহিনের গাড়িটা অ্যাপার্টমেন্টের পার্কিংলটের নির্দিষ্ট জায়গায় এসে থামতেই কেএসকে দরজা খুলে বের হয়ে গেলো। কেমন জানি ভাবালুতার মধ্যে আছে সে। তাকে অনুসরণ করলো রুহিন। অবাক হয়ে দেখলো সাবেক ইনভেস্টিগেটর মেইন গেটের দিকে যাচ্ছে!

রুহিন কিছু না বলে চুপচাপ অনুসরণ করলো তাকে।

একটু আগে রুহিনের গাড়িটা ঢোকার সময় গেটটা খুলে দেবার পর বন্ধ করে মেইনগেটের সামনে সেন্ট্রিবক্সের ভেতরে মাত্র বসেছে দারোয়ান, তাদেরকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়ালো সে।

“স্লামালেকুম, স্যার।”

মাথা নেড়ে সালামের জবাব নিলো কেএসকে। দারোয়ানের সামনে এসে দাঁড়ালো। তার পেছনে রুহিন।

“এই অ্যাপার্টমেন্টের টেলিফোন লাইনের বক্সটা কই?”

দারোয়ান প্রথমে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো। প্রশ্নকারীকে কখনও এই অ্যাপার্টমেন্টে দেখে নি। নিশ্চিতভাবেই সে ব্যারিস্টার সাহেবের গেস্ট। সে কেন এটা জানতে চাচ্ছে?

“কি হলো, বলো?” তাড়া দিলো রুহিন।

“এই তো এইহানে,” সম্বিত ফিরে পেয়ে বললো দারোয়ান। সেন্ট্রিবক্সের পাশে একটা স্টিলের বক্স দেখিয়ে বললো সে।

"আচ্ছা," একটু ভেবে আবার বললো সাবেক ইনভেস্টিগেটর, "টেলিফোন কোম্পানির কোনো লাইনম্যান আসছিলো আজ?"

"হ," অবাক হয়েই বললো দারোয়ান।

"কখন?"

"এই তো..." মনে করার চেষ্টা করলো বেচারা। "...দুই ঘণ্টা আগে হইবো?"

রুহিন অবাক হয়ে চেয়ে রইলো।

"ওই লোক তখন বক্সটা খুইলা চেক করছে?"

"হ, স্যার। এই ফ্ল্যাটের কিছু ফোন নাকি নষ্ট হয়া গেছে..."

"আর কি করছে?"

কেএসকের কথা একটু চিন্তা পড়ে গেলো দারোয়ান। কাচুমাচু হয়ে বললো, "আমি তো...মাইনে...অতোটা খেয়াল করি নাই।"

"ওই লোকটারে তো এর আগে তুমি দেখো নাই, তাই না?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। "জি, স্যার। আগে কখনও দেখি নাই।"

প্রায়ই টেলিফোন নষ্ট হয়ে গেলে লাইনম্যান এসে ঠিক করে দিয়ে যায়, এটা নিয়ে কে মাথা ঘামাতে যাবে। সব সময় তো একজন লাইনম্যান আসে না। একেক সময় এককজন।

একটু ভেবে বললো কেএস খান, "লোকটা দেখতে কেমন ছিলো?"

"বুড়া...দাড়ি আছে...মাথায় টুপি...চশমাও পরে..."

"ঠিক আছে," দারোয়ানকে বলেই পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা রুহিনের দিকে ফিরলো মি: খান।

থ বনে গেছে ব্যারিস্টার। "তার মানে মাহবুবই এসেছিলো...এখানে!"

"চলেন, আপনের ফ্ল্যাটে যাই, কথা আছে," তাড়া দিলো কেএসকে।

রুহিন মালিক তাকে নিয়ে চুপচাপ লিফটের দিকে পা বাড়ালো। তার বিস্ময়ের ঘোর এখনও কাটে নি।

অধ্যায় ৩৩

"লাইনম্যান সেজে কাজটা করতে পারে সেটা কিভাবে মনে হলো আপনার?" রুহিন মালিক জিজ্ঞেস করলো ডিবির সাবেক ইনভেস্টিগেটরকে। "আমার কাছে তো এটা দুর্বোধ্য আর রহস্যময়ই মনে হচ্ছিলো।"

তারা এখন বসে আছে ব্যারিস্টারের ড্রইংরুমে। রুহিন একটা ঠাণ্ডা বিয়ারে চুমুক দিচ্ছে। কেএসকে'র জন্য অবশ্য এক কাপ গরম চা দেয়া হয়েছে একটু আগে।

"দেখেন দুনিয়াতে রহস্য-টহস্য বইলা আসলে কিছু নাই," চায়ে চুমুক দিলো সে। "সবই হইলো অভিনবত্ব...ক্রিয়েটিভিটি...অমীমাংসিত ব্যাপার-স্যাপার...এইগুলারেই আমরা রহস্য মনে কইরা বইসা থাকি।"

ব্যারিস্টার বিয়ারে চুমুক দিয়ে আল্‌তো করে মাথা নাড়লো।

"যে কাজটা হইছে সেইটা এক্কেবারে ক্রিয়েটিভিটির ব্যাপার। মনে রাখবেন, শিল্পী-সাহিত্যিক আর টেকনোলজিস্টরাই খালি ক্রিয়েটিভ হয় না, ক্রিমিনালরাও হয়। মাঝেমইধ্যে তো আমার মনে হয় ওরাই বুঝি বেশি ক্রিয়েটিভ," কথাটা বলে একটু হেসে ফেললো কেএসকে।

"মাহবুব বানচোতের মাথা নষ্ট হতে পারে কিন্তু ওর ক্রিয়েটিভিটি নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই," বললো ব্যারিস্টার।

"আমি ধইরা নিছি কাজটা করা হইছে বাস্তবসম্মত কোনো উপায়েই...এর মধ্যে কোনো রহস্য নাই, তয় অভিনবত্ব থাকবার পারে...প্রথমে ভাবছিলাম আপনের ঘরে ঢুইকা কাজটা করা হইছে কিনা...কিন্তু কাজের ছেলেটা যখন কইলো কেউ আপনের ঘরে ঢুকে নাই তখন বুঝলাম অন্যভাবে করা হইছে। তখন ভাবলাম, কাজটা আমি করলে কেমনে করতাম। অনেক ভাইবা দেখলাম, একটা উপায়ই আছে...লাইনম্যান সাইজাও কাজটা করা যাইতে পারে। আমি অনেক

লাইনম্যানরে এইভাবে অন্যের ফোন থেইকা কল করতে দেখছি।"

"চিন্তা করেন, লোকটা কতো বড় সাইকো," রুহিন বললো।

"যান, আপনের ল্যাপটপটা নিয়া আসেন, একটা জিনিস দেখতে হইবো," তাকে তাড়া দিয়ে বললো কেএসকে।

বিয়ার হাতে নিয়ে ড্রইংরুম থেকে চলে গেলো তরুণ ব্যারিস্টার।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে একটা বিষয় তার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগলো–মজার ব্যাপার হলো, মাহবুব সাহেবের কর্মকাণ্ড কিংবা রফিক হত্যাকাণ্ড নিয়ে নয় সেটি–নিজের ঘর থেকে মোবাইলফোনটা কিভাবে চুরি হলো সেই পুরনো অমীমাংসিত ব্যাপারটি। যে এ কাজ করেছে তার সৃজনশীলতাও কম নয়। মাহবুব সাহেবের চেয়ে ঐ চোরব্যাটার সৃষ্টিশীলতা আরো অভিনব। এখন পর্যন্ত এ ঘটনার কোনো সুরাহা করতে পারে নি।

ব্যারিস্টার ল্যাপটপ নিয়ে ফিরে এলো ড্রইংরুমে। সাবেক ইনভেস্টিগেটরের সামনে রেখে ওটা ওপেন করে দিলো।

"এইটা প্লে করেন," সিডিটা ব্যারিস্টারের হাতে দিয়ে বললো কেএসকে।

রফিক হাওলাদার যেদিন খুন হয় সেদিন তার অফিসের পার্কিংলটের সিসি-ক্যামের ফুটেজ ভেসে উঠলো ল্যাপটপের পর্দায়।

সাতান্ন মিনিটের মধ্যে মাত্র কয়েক মিনিটের ফুটেজই দেখা হলো। দুপুর ২টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত–এই এই তিন ঘণ্টার ফুটেজের দৈর্ঘ প্রায় সাত মিনিটের মতো হবে। বার বার এই সাত মিনিটই দেখে গেলো কেএসকে। বিকেল ৪টা ১২ মিনিটে রফিক হাওলাদারের গাড়িটা পার্কিংলট থেকে বের হতে দেখা গেলো। সিসি ক্যামটা এমন জায়গায় বসানো যে পার্কিংলটের ভেতরে খুব কম জায়গাই দেখা যায়। ফুটেজটা দেখে নিরাশ হয়ে গেলো সাবেক ইনভেস্টিগেটর।

"না, তেমন কাজ হইলো না," ল্যাপটপ থেকে চোখ সরিয়ে নিলো সে। "আমি ভাবছিলাম কিছু একটা পাওয়া যাইবো..."

বিয়ারের ক্যানটা রেখে দিলো ব্যারিস্টার। "৪টা ১২ মিনিটে রফিকের গাড়িটা অফিস থেকে বের হয়ে যায়...এটা ছাড়া আর কিছু জানা গেলো না," বললো সে।

"তাই তো দেখতাছি।"

"আপনি কি এক্সপেক্ট করছিলেন?"

"আমি মনে করছিলাম পার্কিংলটের ভিতরের দৃশ্য দেখতে পারুম...তা না হইলেও গাড়িটা বাইর হওনের সময় ড্রাইভিং সিটে যে থাকবো তার মুখটা দেখা যাইবো। ধুর...কিছুই দেখা গেলো না।"

কিছুক্ষণ চুপ থেকে রুহিন বললো, "তাহলে এখন কি করবেন?"

একটু ভেবে নিলো কেএসকে। ঘর থেকে মোবাইলফোন চুরির ঘটনা নিয়ে যতো বেশি চিন্তা ব্যয় করেছে সে-তুলনায় ব্যারিস্টারের কেসটা নিয়ে কমই করেছে। এটা ঠিক হয় নি। তার উচিত ছিলো আরেকটু সিরিয়াস হওয়া–হাজার হোক, এর সাথে জড়িয়ে আছে একজন মানুষের জীবন।

উঠে দাঁড়ালো সে। "বাসায় যাই। শরীরটা ম্যাজম্যাজ করতাছে...জ্বর আসবো মনে হইতাছে। কাইল কথা হইবো।"

"কি বলেন, শরীর খারাপ লাগছে?" উতলা হয়ে উঠলো ব্যারিস্টার। "বেশি খারাপ মনে হচ্ছে?"

হেসে ফেললো কেএসকে। "আরে এইটা কোনো ব্যাপারই না। এইসব তো আমার জন্য ডাইলভাত। একটু রেস্ট নিলে সব ঠিক হইয়া যাইবো।"

"আপনি ইচ্ছে করলে আমার এখানেও রেস্ট নিতে পারেন?"

"আরে না..."

"সমস্যা কি? আমি তো ফ্যামিলি নিয়ে থাকি না, একা থাকি।"

নিজের ঘর ছাড়া কেএসকের একটুও ঘুম আসে না। অবশ্য এ কথাটা না বলে অন্য কথা বললো। "আপনের গার্লফ্রেন্ডরা আইসা পড়লে কিন্তু বিপদে পড়বেন," বলেই হেসে ফেললো সে।

গাল চুলকে মুচকি হাসলো ব্যারিস্টার। এরকম কিছুর সম্ভাবনা সত্যি আছে।

"বাসায় যাইতে হইবো। আইনস্টাইন একলা আছে," এবার আসল কারণটা বললো কেএসকে।

ব্যারিস্টার আর কিছু বললো না। "চলেন তাহলে, আপনাকে ড্রপ করে দিয়ে আসি।"

"তার দরকার নাই, আপনি খামোখা এতোদূর যাইবেন কেন, আমি একটা সিএনজি নিয়া আরামে চইলা যাইতে পারুম।" উঠে দাঁড়ালো সে।

ব্যারিস্টারও উঠে দাঁড়ালো। "সব সময় আপনার কথাই মেনে নেবো এতো বড় ভদ্রলোক আমি কোনো কালেই ছিলাম না। চলেন তো...আর কোনো কথা বলবেন না।"

নীরবে হেসে ফেললো কেএসকে। "চলেন তাইলে।"

তাকে যখন কেউ শাসন করে তখন অন্যরকম ভালো লাগার একটি অনুভূতি তৈরি হয়, সেটা যে-ই করুক না কেন। তাকে শাসন করার মতো তো তেমন কেউ ছিলো না বেশি দিন।

অধ্যায় ৩৪

রাতে খাওয়ার আগেই সারা গা কাঁপিয়ে জ্বর শুরু হয়ে গেলো। প্যারাসিটামল ট্যাবলেট খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো কেএসকে। ভাত খেতে ইচ্ছে করছে না। আইনস্টাইন এসে তাগাদা দিয়ে গেছে একবার, অনেক রাত হয়েছে, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়া উচিত। কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে না। ঘরের বাতি বন্ধ করে কাথায় শরীরটা মুড়িয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করছে সে।

টের পেলো জ্বরের ঘোরে চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। একটু খুশিই হলো! জ্বরের ঘোরটা তার কাছে ভালো লাগে। লোকে শুনলে হয়তো অবাক হবে কিন্তু এটাই সত্যি। এরকম ঘোরের মধ্যে পড়ে থেকে কতো জটিল কেসের সূত্র বের করতে পেরেছে। কতো বিক্ষিপ্ত ক্লু জোড়া লাগিয়ে সমাধান করতে পেরেছে সে। শুধু তা-ই না, অনেক জটিল চিন্তা-ভাবনা করতে পারে এরকম পরিস্থিতিতে।

পদার্থবিজ্ঞানের উপর কোনো বই পড়তে গিয়ে হয়তো একটা বিষয় মাথায় ঢুকছে না, অনেক চেষ্টা করেও মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না, দেখা গেলো জ্বরের ঘোরে সেটাই তার কাছে বোধগম্য হয়ে উঠলো।

আজকেও এরকম কিছুর আশা করলো। হয়তো আজও সে-রকম কিছু ঘটবে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, মোবাইলফোন চুরির বিষয়টাই প্রাধান্য পাচ্ছে তার কাছে। বার বার ওই অমীমাংসিত ঘটনাটি চলে আসছে। জোর করে মাথা থেকে চিন্তাটা বাদ দেবার চেষ্টা করলো। তার পনেরো বছরের কর্মজীবনে কোনো অমীমাংসিত কেস নেই। রিটায়ার করার পরও যে-সব কেসে সাহায্য করেছে তার মধ্যে কোনো বিফলতা নেই। অথচ নিজের ঘর থেকে মোবাইলফোন চুরির কেসটা...

আপন মনে হেসে ফেললো সে। এটাই হলো নিয়তির পরিহাস।

জাল

মাথা থেকে জোর করে চিন্তাটা বাদ দেবার জন্য রুহিন মালিকের কেসটা নিয়ে ভাবতে শুরু করলো এবার।

মাহবুব সাহেব যদি খুনটা করে থাকে, তাহলে কিভাবে সেটা করলো? সে-সময় তো ভদ্রলোক অপারেশন টেবিলে ছিলো! অপারেশনটা ভুয়া ছিলো না। ঐদিন তার অ্যাপেন্ডিক্স অপসারিত করা হয়েছে। এ নিয়ে কোনো সন্দেহ করা যাবে না। তাহলে?

এভাবে ভাবতে লাগলো সে। অন্ধকার ঘর। চারপাশ সুনসান। শুধু পাশের ঘর থেকে মৃদু শব্দ আসছে। নিষেধ করা সত্ত্বেও আইনস্টাইন ভলিউম কমিয়ে টিভি দেখছে রাত জেগে।

মাহবুব সাহেবের কোনো জমজ আছে?

আপন মনে হেসে ফেললো সে। এটা একেবারেই গাজাখুরি চিন্তা। কিন্তু কোনো অপশনই বাদ রাখা ঠিক হবে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সবথেকে অযৌক্তিক চিন্তাটাই, অসম্ভব হাইপোথিসিসটাই সত্যি বলে প্রমাণ হয়।

না। ওই লোকের কোনো জমজ নেই। থাকলে সেটা এতোদিন গোপন থাকতো না।

বডি ডাবল?

বিরল হলেও এরকম তো হয়। শোনা যায়, ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের বডি ডাবল ছিলো। আর তার কুলাঙ্গার ছেলে উদের বডি ডাবল তো এখনও বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। আত্মজীবনী লিখে, ডকুমেন্টারি করে বেশ পরিচিতও হয়ে উঠেছে। এ নিয়ে সিনেমাও বানানো হয়েছে হলিউডে।

আবারো হেসে ফেললো সে, এতোক্ষণ ধরে পক্ষপাতদুষ্ট চিন্তা করছে বলে। তার উচিত ব্যারিস্টার রুহিন মালিককেও সন্দেহের বাইরে না রাখা। তাকেই বা কেন ছাড় দিচ্ছে? তার কথাই যে সত্য তার কি নিশ্চয়তা আছে?

ব্যারিস্টার ইচ্ছে করে কিছু না করলেও তার তো ভুল হতেই পারে। ওরকম স্বল্প আলোতে মদ্যপ অবস্থায় একটু হেলুসিনেশান হওয়াটা অসম্ভব কিছু না।

হঠাৎ বেডসাইড টেবিলের উপর রাখা মোবাইলফোনটা বেজে উঠলে

এসব চিন্তায় ব্যঘাত ঘটলো। মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো তার। সুন্দরভাবে ধাপে ধাপে চিন্তা করে এগোচ্ছিলো এতোক্ষণ। জ্বরের ঘোরটাও গাঢ় হচ্ছিলো...

ধুর!

কাথার নীচ থেকে হাত বের করলো অনিচ্ছা সত্ত্বেও। কল রিসিভ না করে মোবাইলফোনটা সাইলেন্ট করে দিতে চাইলো কিন্তু ডিসপ্লের দিকে চোখ যেতেই অবাক হলো সে। সঙ্গে সঙ্গে কলটা রিসিভ করলো কেএসকে।

"আপনে?"

"এতো রাতে ডিস্টার্ব করলাম না তো?" ডাক্তার লুবনা মিষ্টি করে বললো ফোনের ওপাশ থেকে।

"না, না, ঠিক আছে," বিগলিত হয়ে বললো সে। তার বিস্ময় এখনও কাটে নি। এই মহিলা এতো রাতে তাকে কেন ফোন করেছে?

"কি করছিলেন?"

"কিছু না...এমনি শুইয়া ছিলাম।"

"এতো তাড়াতাড়ি? এখন তো রাত দশটার কিছু বেশি বাজে...আপনি কি এ সময় ঘুমান নাকি?"

"না, না। ঘুমাই নাই। এমনি শুইয়া আছি।"

"শরীর খারাপ?"

কয়েক মুহূর্তের জন্য একটা দ্বন্দ্বে পড়ে গেলো সে। জ্বরের কথা বলবে নাকি বলবে না। "না, শরীর ঠিকই আছে।" মিথ্যেই বললো অবশেষে।

"আমি ফোন করাতে কি আপনি অবাক হয়েছেন?" ডাক্তার জানতে চাইলো।

অবশ্যই অবাক হয়েছে কিন্তু মুখে বললো, "না, না। অবাক হমু ক্যান।"

"একটা বই পড়ছিলাম, ভালো লাগছিলো না। তিনশ' পৃষ্ঠার বই কিন্তু পঞ্চাশ পৃষ্ঠা পড়ার পরই বুঝে গেছি খুনটা কে করেছে।"

"ডিটেক্টিভ বই?"

"হ্যা। রাইটারটা ভালো না। নীলক্ষেতের পুরনো বইয়ের দোকান

থেকে কিনেছিলাম। এর আগে নামটাও কোথাও শুনি নি।"

"নাম কি?"

"নিক কার্টার।"

"ও। সি-গ্রেডের রাইটার...বছরে দশ-বারোটা বই লিখতো।"

"আপনি চেনেন?" অবাক হলো ডাক্তার।

"এক সময় প্রচুর পড়ছি...বাংলাও পড়তাম। পরে দেখি সবগুলাই ইউরোপ-আমেরিকার বিখ্যাত লেখকদের কাহিনী চুরি কইরা লেখা। একটাও অরিজিনাল না। এরপর থেইকা ইংরেজিগুলাই পড়ি।"

"একজন ডিটেক্টিভ হয়ে আপনি এখনও এসব বই পড়েন?" কৃত্রিম বিস্ময়মাখা কণ্ঠে বললো ডাক্তার।

"এখন কি আমারে ডিটেক্টিভ বলা যায়? গত বছর চাকরি ছাইড়া দিছি না?"

"তাতে কি হয়েছে? ওয়ান্স অ্যা ডিটেক্টিভ অলয়েজ অ্যা ডিটেক্টিভ।"

কেএসকে নীরবে হাসলো। "আপনি কি সব সময় ইংরেজি বই-ই পড়েন?"

"না। শুধু ক্রাইম-ফিকশন আর ডিটেক্টিভ বইগুলো ইংরেজি...বাংলা বইও পড়ি তবে কম।"

"আমাগো দেশে কোনো ক্রাইমফিকশন বের হয় না?"

"বাংলায়?"

"হুম।"

"কী যে বলেন...এখানে কেউ এসব বিষয় নিয়ে লেখে নাকি," বললো ডাক্তার লুবনা।

"আমি অবশ্য জানতাম না।"

"আচ্ছা, আমি আপনাকে ডিস্টার্ব করছি না তো?"

"আরে কী যে কন...ডিস্টার্ব করবেন ক্যান..." বিগলিত হয়ে বললো সাবেক ইনভেস্টিগেটর।

সঙ্গে সঙ্গে মৃদু বিপ্ শুনে ফোনটা কান থেকে সরিয়ে ডিসপ্লের দিকে তাকিয়ে দেখলো অন্য আরেকটা ইনকামিং কল ঢুকেছে তার মোবাইলে। সে জানে, তাকে লাইনে বিজি পেয়ে মহাখাপ্পা হয়ে যাবে কলার। আবারো

কানে চেপে ধরলো ফোনটা।

"আমার আবার বেশি কথা বলার অভ্যেস...একবার শুরু হলে সহজে থামি না," বলে গেলো ডাক্তার।

"থামার দরকার নাই...চালায়া যান। লাইক অ্যা মিডনাইট এক্সপ্রেস।"

হি-হি-হি করে হেসে উঠলো ডাক্তার। "ভালোই বলেছেন।" তারপর একটু থেমে আবার বললো, "দেখেন, যার জন্যে ফোন করেছি সে-কথাই বলতে ভুলে গেছি।"

"কি কথা?" উৎসুক হয়ে উঠলো কেএস খান।

"আরে তেমন সিরিয়াস কিছু না। ঐ বইটা পড়তে ভালো লাগছিলো না বলে ভাবলাম আপনার কাছ থেকে বরং একটা গল্প শুনি।"

"গল্প? আমার কাছ থেইকা?" অবাক হলো সে।

"হ্যা। ভুলে যাচ্ছেন কেন, আমি আপনার কাছ থেকে একটা গল্প পাওনা আছি।"

বুঝতে পারলো না কেএসকে।

"অ্যাপেন্ডিক্সের ব্যাপারে জানতে চাইলেন না ঐদিন? একটা কেসের ব্যাপারে? তখন বলেছিলেন পরে একদিন বলবেন।"

"ও," টেনে বললো কেএসকে। "ওইটার কথা কইতাছেন..."

"হ্যা।"

"ওই কেসটা তো এখনও কূলকিণারা করতে পারি নাই।"

"তাই নাকি?" অবাক হলো লুবনা।

"হুম...খুব জটিল কেস। আপনে শুনলে মনে করবেন হিচককের সিনেমার গল্প।"

"ওয়াও!" চপলতায় আক্রান্ত হলো ডাক্তার। "তাহলে বলুন না, আমার খুব শুনতে ইচ্ছে করছে।"

বিছানা থেকে উঠে বসলো কেএসকে। হেডবেডে হেলান দিয়ে ব্যারিস্টার রুহিন মালিকের কেসটা বলে গেলো বিস্তারিত। টেরই পেলো না তার শরীর থেকে আপাতত জ্বর পালিয়েছে।

"আচ্ছা, তাহলে এই ঘটনা..." সব শুনে বললো ডাক্তার লুবনা।

"হুম।"

"আমার কাছে তো রহস্যগল্পই মনে হচ্ছে।"

"একদম ঠিক বলছেন।"

"আপনি শিওর, অপারেশনটা ফেইক ছিলো না?"

"পুরা শিওর," জোর দিয়ে বললো কেএসকে। "অপারেশন নিয়া মনে হয় না কোনো সন্দেহ থাকা উচিত।"

"তাহলে ঐ লোক কিভাবে খুন করবে? আপনি বললেন, ঠিক ঐ সময়েই খুনটা হয়েছে। এটা তো অ্যাবসার্ড!"

"পুরাই অ্যাবসার্ড," সায় দিলো কেএসকে। "এর আগে আমি এইরকম কেস পাই নাই।"

"আপনি ভেবেছিলেন অ্যাপেন্ডিক্সের অপারেশটা খুনি অ্যালিবাই হিসেবে ব্যবহার করেছে?"

"প্রথমে ঐরকমই ভাবছিলাম...কিন্তু এখন মনে হইতাছে সেইটা সম্ভব না।"

"হুম।" একটু চুপ করে থাকলো ডাক্তার লুবনা। "আপনাকে একটা কথা দিতে হবে..."

"কি দিতে হইবো?" বুঝতে না পেরে বললো কেএসকে।

হেসে ফেললো লুবনা। "একটা কথা। এই কেসটা সল্‌ভ করার পর আমাকে পুরো ঘটনাটা বলবেন...আই মিন কিভাবে সল্‌ভ করলেন সেটা। বিনিময়ে আমি আপনাকে কফি খাওয়াবো। কফি খেতে খেতে গল্পটা শুনবো আপনার কাছ থেকে।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে," বুঝতে পারলো সে।.একটু হেসে বললো, "ডিটেক্টিভ বই পইড়া মনে হয় আর মজা পাইতাছেন না...রিয়েল কিছু চাইতাছেন।"

"এই রিয়েল ওয়ার্ল্ডে কতোক্ষণ আর ভার্চুয়াল জিনিস নিয়ে পড়ে থাকা যায়, বলেন?" ডাক্তার বললো। "শেষ পর্যন্ত রিয়েল কিছু না হলে কি চলে?"

চুপ মেরে রইলো কেএসকে। তার মনে হলো কথাটার মধ্যে কেমন একটা ব্যাপার আছে।

"ঠিক আছে, আজ রাখি। পরে কথা হবে," অনেকটা তড়িঘড়ি করেই

যেনো বললো ওপাশ থেকে।

"আচ্ছা," কেএসকে শুধু এটুকুই বলতে পরলো।

"বা-ই," মিষ্টি করে টেনে টেনে বললো ডাক্তার লুবনা।

কেএস খান আস্তে করে বললো, "বাই।" ফোনালাপ শেষে 'বাই' বলার অভ্যেস তার নেই, তাই কেমনজানি লজ্জা লাগলো।

ফোনটা রেখে ঘরের চারপাশে তাকালো সে। এখন গাঢ় অন্ধকার। পাশের ঘর থেকে মৃদু আওয়াজটা আর আসছে না। আইনস্টাইন টিভি বন্ধ করে দিয়েছে। গভীর করে দম নিয়ে গায়ে কাথা জড়িয়ে শুয়ে পড়লো আবার। এতোক্ষণ টেরই পায় নি তার জ্বর ছিলো। চোখ বন্ধ করে চিন্তার রাজ্যে ডুবে গেলো ডিবির সাবেক ইনভেস্টিগেটর কেএস খান।

অধ্যায় ৩৫

ফোনের রিংটা বেজে উঠতেই বুক ধরফর করে উঠলো তার। চোখ খুলে তাকালো। জানালার পর্দা ভেদ করে ঢুকে পড়েছে সকালের নরম রোদ। পিটপিট করে তাকালো দূরের দেয়ালে ঝুলে থাকা ঘড়িটার দিকে। সাড়ে আটটা বেজে গেছে।

এতো সকালে তাকে ফোন করবে কে? মেজাজ একটু খারাপ হয়ে গেলো। গতকাল মাঝরাতের পর থেকে জ্বরের প্রকোপ বেড়ে গেছিলো। সারারাত এপাশওপাশ করেছে। তবে ঘুম ভেঙে যাবার পর মনে হচ্ছে জ্বরটা এখন আর নেই।

বেডসাইড টেবিল থেকে মোবাইলফোনটা তুলে নিলো। রুহিন মালিক ফোন করছে।

"হ্যা, বলেন?" আস্তে করে বললো কেএসকে।

"শরীর কেমন? জ্বর হয়েছিলো নাকি?"

"এই তো..." হাই তুললো একটা। "...রাইতে একটু জ্বর ছিলো, এখন ঠিক আছি।"

"আজকে আপনার ক্লাস নেই?"

"না," আরেকটা হাই তুলে আবার বললো, "বলেন কি জন্যে ফোন দিছেন...এতো সকালে যখন ফোন করছেন মনে হয় কোনো ঘটনা আছে।"

"আপনি কি জানেন, অ্যাপেন্ডিক্স শরীরের একটি অপ্রয়োজনীয় অরগ্যান?"

"০রুডিমেন্টারি অরগ্যান...অবিকশিত প্রত্যঙ্গ..."

"রাইট, রাইট।" একটু দম নিয়ে নিলো ব্যারিস্টার। উত্তেজনায় আক্রান্ত সে। "কাল রাতে এক ডাক্তার বন্ধুর সাথে আমার কেসটা নিয়ে কথা হচ্ছিলো...আমার কাছ থেকে সব শুনে এটা বললো সে।"

"হুম, বুঝলাম। তাতে কি হইছে?"

"সে আমাকে আরেকটা কথা বলেছে...ওটা নিয়েই আমি ভেবে যাচ্ছিলাম সারা রাত।"

কেএসকের ভুরু কুচকে গেলো। "কি বলছে?"

"আমার ঐ ডাক্তার বন্ধুর এক বড় ভাই আছে...একটু বোহেমিয়ান টাইপের। সে একজন মাউন্টেইনার...কয়েক বছর আগে ঐ ভাই নাকি এমনিতেই তার অ্যাপেন্ডিক্সটা অপারেশন করে ফেলে দিয়েছে।"

"ক্যান?" অবাক হলো সাবেক ইনভেস্টিগেটর।

"কতো প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে পাহাড় বাইতে হয় তাকে...সেখানে যদি অ্যাপেন্ডিক্সের প্রবলেম দেখা দেয় তাহলে সমস্যা না?...ডাক্তার পাবে কোথায়?...সেজন্যে ঝামেলা এড়াতে আগে থেকেই ওটা ফেলে দিয়েছে...হ্যাভিং উইদাউট এনি কম্প্লিকেশন্স। বুঝলেন?"

"আচ্ছা।" কেএসকেও এটা নিয়ে ভেবেছে যখন ডাক্তার লুবনা তাকে বলেছিলো এটা একেবারেই অপ্রয়োজনীয় একটি প্রত্যঙ্গ।

"আমার ধারণা মাহবুবও একই কাজ করেছে...ইচ্ছে করেই অ্যাপেন্ডিক্সটা অপারেশন করে ফেলে দিয়েছে...আই মিন, অপারেশনের ব্যাপারটাকে অ্যালিবাই হিসেবে ব্যবহার করেছে সে।"

চুপ মেরে রইলো কেএসকে। অনেক আগেই এটা সে বাতিল করে দিয়েছে কারণ এভাবে এই কেসের হিসেব মেলানো যায় নি।

"আপনি বুঝতে পারছেন?" ওপাশ থেকে তাড়া দিলো রুহিন। প্রবল উত্তেজনা তার মধ্যে।

"হুম, বুঝলাম...আপনে বলতাছেন অপারেশনটার কজ ভুয়া ছিলো...ঠিক আছে, মানলাম আপনের কথা...কিন্তু অপারেশনটা তো আর ভুয়া ছিলো না। ঐ সময়টাতে মাহবুব সাহেবের অপারেশন হইতাছিলো। সে ইচ্ছা কইরা করুক আর যেমনেই করুক অপারেশনটা তো সত্যি হইছে।"

মনে হলো ব্যারিস্টারের উত্তেজনায় পানি ঢেলে দেয়া হয়েছে। "হ্যা, তা তো সত্যি," আস্তে করে বললো সে।

"তারচায়াও বড় কথা, ঠিক একই সময় খুনটা হইছে।"

ফোনের ওপাশে নীরবতা নেমে এলো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো কেএসকে। "এই কেসে আরো কিছু ব্যাপার আছে, বুঝলেন?"

"জি," আস্তে করে বললো রুহিন মালিক। আর কিছু বলতে পারলো না সে।

"আপনে টেনশন কইরেন না...আমি দেখতাছি," আশ্বস্ত করলো খুনের মামলার আসামীকে। "ঠিক আছে, এখন রাখি...পরে কথা হইবো।"

"ওকে," ম্রিয়মান কণ্ঠে বলেই লাইনটা কেটে দিলো ব্যারিস্টার।

কয়েক মুহূর্ত কানের কাছে ফোনটা চেপে রাখলো কেএসকে। বেচারা। ডাক্তার বন্ধুর কাছ থেকে অ্যাপেন্ডিক্সের গল্প শুনে ভেবেছিলো একটা দুর্দান্ত ক্লু পেয়ে গেছে। তার মতো অভিজ্ঞ ইনভেস্টিগেটর যেখানে সুবিধা করতে পারছে না সেখানে...

তার ভাবনায় ছেদ পড়লো আইনস্টাইনের আগমনে।

ছেলেটা ঘরে ঢুকে চুপচাপ দেয়ালঘড়ির দিকে চলে গেলো। ঘড়িটা দেয়াল থেকে নামিয়ে কী যেনো করে আবার আগের জায়গায় ঝুলিয়ে রাখলো সে।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো কেএসকে। রাতে ঘুমানোর আগে শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছিলো। এটা অবশ্য প্রায়ই হয়ে থাকে।

তার দিকে চোখ পড়তেই হেসে ফেললো ছেলেটা। খোলা দরজা দিয়ে চলে যেতে যেতে বললো, "টাইমটা ঠিক কইরা দিলাম...এক ঘণ্টা সোলো আছিলো...কাইলকা দুপুরে নতুন ব্যাটারি লাগানোর সময় টাইম অ্যাডজাস্ট করতে ভুইলা গেছিলাম।"

এবার বুঝতে পারলো সে।

দরজার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো আইনস্টাইন। "তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুইয়া নেন। আমি নাস্তা দিতাছি...সাড়ে নয়টা কিন্তু বাইজা গেছে..."

মাথা নেড়ে সায় দিলো কেএসকে। ঘর থেকে ছেলেটা বের হয়ে যাবার পর ঘড়ির দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। তার মাথা দ্রুত কাজ করছে। হঠাৎ গা থেকে কাথাটা সরিয়ে দিয়ে উঠে বসলো সে।

এটা তার অনেক আগেই খেয়াল করা দরকার ছিলো। আসলে যতোই

অভিজ্ঞতা থাকুক, প্রতিভা থাকুক, প্রতিটি দিনই নতুন। প্রতিটি কেসই আলাদা। প্রতিদিনই শেখার মতো অনেক কিছু থাকে। তার ঘরের মোবাইলফোন চুরির ব্যাপারটার কথাই ধরা যাক না–এতোদিনেও সেটার কূলকিণারা করতে পারলো না। সমান্য একটা ক্লুও বের করতে সমর্থ হয় নি এখন পর্যন্ত।

সম্ভবত সেজন্যেই ব্যারিস্টারের কেসটা নিয়ে যতোটা মনোযোগ দেবার দরকার ছিলো ততোটা দিতে পারে নি। সত্যি বলতে, তার মাথায় চিরস্থায়ী মাইগ্রেনের ব্যথার মতো মোবাইলফোন চুরির ঘটনাটা ঝুলে আছে।

হুট করে নিজের মধ্যে এক ধরণের প্রাণশক্তি টের পেলো কেএসকে। দ্রুত একটা নাম্বার ডায়াল করলো সে।

“হ্যালো, আমিনুল...”

অধ্যায় ৩৬

হাসপাতাল থেকে বের হয়ে এলো আমিনুল। ঘণ্টাখানেক আগে তার স্যার কেএস খান তাকে একটা কাজ দিয়েছিলো সেজন্যেই এখানে আসা। এই হাসপাতালেই মাহবুব আনাম নামের একজনের অপারেশন হয়েছিলো। স্বনামখ্যাত ব্যারিস্টার রুহিন মালিকের মতে ঐ লোক নাকি ব্যবসায়ি রফিক হাওলাদারকে খুন করেছে।

দারুণ গল্প ফেঁদেছে ব্যারিস্টার। তদন্তে নেমে আমিনুল বুঝতে পেরেছে খুনটা আর যে-ই করে থাকুক মাহবুব সাহেব করে নি। আর ব্যারিস্টারের কথাবার্তায় যে অসঙ্গতি রয়েছে সেটা যে কেউ বুঝবে। সমস্যা হলো, তার স্যার, মিঃ খানকে এই ব্যারিস্টার ভালোমতোই প্রভাবিত করতে পেরেছে। আসল সন্দেহভাজনকে রেখে ঐ মাথা নষ্ট মাহবুবের পেছনে লেগে রয়েছে এখনও।

এই তো, গতকাল এসে অভিযোগ করলো, মাহবুব সাহেব নাকি তাকে টেলিফোন করে হুমকি দিয়েছে। ইনকামিং কলটা ট্র্যাকডাউন করে জানা গেলো ব্যারিস্টারের বাসার নাম্বার থেকেই ওটা করা হয়েছে। এরপরও তার স্যার বুঝতে পারছে না ঘটনা কি।

যাইহোক, কেএস খান শুধু তার শিক্ষকই নয়, আদর্শও বটে। তারচেয়েও বড় কথা, কোনো কেসে সুবিধা করতে না পারলে তার কাছে ছুটে যাওয়া যায়। দারুণ সাহায্য পাওয়া যায়। এসব ব্যাপারে ভদ্রলোক একেবারেই উদার।

তো একটু আগে অফিসে আসার পর যখন ফোন করে এ কাজটা করতে বললো তখন আর দেরি করে নি। সঙ্গে সঙ্গে বাইকটা নিয়ে চলে আসে এই হাসপাতালে। কাজটা করতে বিশ মিনিটের বেশি লাগে নি। হাসপাতালের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার তার কথা শুনে সুবোধ বালকের মতো দাবি মিটিয়েছে।

হাসপাতালের বাইরে বাইকের কাছে এসে মোবাইলফোনটা বের করলো আমিনুল। ডায়াল করলো একটা নাম্বারে।

"স্যার, ওটা কালেক্ট করেছি..." ওপাশ থেকে শুনে গেলো। "জি, স্যার। কালকে তো আমাদের ক্লাশ আছে তখন সঙ্গে করে নিয়ে আসবো..." ওপাশ থেকে কিছুক্ষণ শুনে গেলো সে। তারপর বললো, "ঠিক আছে, আমি এক্ষুণি আসছি...না, না, কোনো সমস্যা নেই। আমার সাথে বাইক আছে...ওকে, স্যার।"

ফোনটা রেখে বাইকে উঠে বসলো সে। ফুটেজটা দেখার জন্য তার শিক্ষক কেএস খানের আর তর সইছে না।

আমিনুলের বাইকটা হাসপাতালের মেইনগেট দিয়ে বের হয়ে যেতেই জানালার সামনে থেকে সরে দাঁড়ালো ডাক্তার মামুন। হাসপাতালের তিনতলায় নিজের রুমে আছে সে। একটু ভাবনায় পড়ে গেছে ডাক্তার। হঠাৎ করে এই লোক এখানে কেন এলো? নিশ্চয় কোনো ঘাপলা হয়েছে। অজানা আশংকা জেঁকে বসলো তার মধ্যে। আর যদি এলোই তার কাছে কেন এলো না? তাহলে কর কাছে এসেছিলো? কেন এসেছিলো?

প্রশ্নগুলো তার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগলো।

অধ্যায় ৩৭

মাত্র পাঁচ ঘণ্টার ফুটেজ কিন্তু দৈর্ঘে এক সেকেন্ডও কম নয়। কাটায় কাটায় পাঁচ ঘণ্টা!

মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেলো কেএসকের। রফিক হাওলাদারের অফিসের সিসি-ক্যামের ফুটেজগুলোর মতো টাইম ল্যাপ্‌স ব্যবহার করা হয় নি এখানে। পাঁচ ঘণ্টার বিরক্তিকর ফুটেজ দেখাটা মোটেও আনন্দের কোনো কাজ নয়। তবে রুহিন মালিক বাটনে ক্লিক করে প্লেয়ারের গতি একটু বাড়িয়ে দেয়াতে সময়টা কমে অর্ধেকে নেমে এসেছে। তার মানে আড়াই ঘণ্টার ফুটেজ দেখতে হবে এখন। একটা হলিউডি এপিক সিনেমার দৈর্ঘ! কিন্তু এটা কোনো সিনেমা নয়। নানা রকম গাড়ি আর লোকজনের আসা-যাওয়ার বিরক্তিকর ফুটেজ।

রুহিন মালিকের চেম্বারে বসে আছে কেএসকে। তার সামনে একটা ল্যাপটপ। রিডিংগ্লাস পরে গভীর মনোযোগের সাথে দেখে যাচ্ছে নিবিষ্টমনে। তার বিপরীতে নিজের ডেস্কে বসে আছে ব্যারিস্টার। একটু আগে আমিনুল এসে এই ফুটেজগুলো দিয়ে গেছে।

রুহিন চুপচাপ মোবাইলফোনে কার সাথে যেনো মেসেজ চালাচালি করছে। একটু পর পর বিপ্‌ দিয়ে ইনকামিং মেসেজ আসছে, আর তার হাতের আঙুলগুলো বাচ্চা-ইঁদুরের মতো খুটখাট শব্দ করে মেসেজ টাইপ করে যাচ্ছে।

সাবেক ইনভেস্টিগেটর ল্যাপটপের পর্দা থেকে চোখ সরিয়ে প্লেবয় ব্যারিস্টারকে দেখে নিলো এক ঝলক। তার ঠোঁটে ফুটে উঠলো হাসি।

"এইসব ফুটেজ দেখাটা খুবই বিরক্তির কাজ, তাই না?" স্মার্টফোন থেকে চোখ না তুলেই বললো রুহিন।

"হুম," ল্যাপটপের পর্দায় চোখ রেখেই জবাব দিলো কেএসকে।

"মাহবুব কখন হাসপাতালে অ্যাডমিট হলো সেটা খতিয়ে দেখতে

চাইছেন?”

ল্যাপটপের পর্দা থেকে চোখ সরালো না সাবেক ইনভেস্টিগেটর, রুহিনের প্রশ্নের জবাবও দিলো না।

মুখ তুলে তাকালো ব্যারিস্টার।

কেএসকের দৃষ্টি যেনো আটকে আছে ল্যাপটপের পর্দায়। চোখের পলক পর্যন্ত পড়ছে না। তাকে বিরক্ত না করে ফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো সে।

নতুন একটা মেসেজ পেয়ে মুখ টিপে হাসলো ব্যারিস্টার। পালাক্রমে তিনজনের সাথে এসএমএস চালাচালি করছে সে। এদের মধ্যে একজনের বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই, অন্য একজন মাত্র উনিশ বছরের!

সেই উনিশ বছর ঢুকে পড়লো এবার : *আর ইউ বিজি?*

অবাক হলো রুহিন। *বাপ্‌রে! পিচ্চি দেখি টের পেয়ে গেছে!*

তাকে রিপ্লাই দিতেই তার এক ক্লায়েন্ট-কাম বান্ধবীর এসএমসএস চলে এলো। বত্রিশ বছরের টিনএজার আব্দার করছে : *গিভ মি অ্যা লিটল ডেথ।*

রুহিন সাথে সাথে রিপ্লাই দিলো : *আ’ম গোনা কিল ইউ টুনাইট।*

সাথে সাথে জবাব পেলো : *হাউ মেনি টাইম্‌স?*

অবাক হলো রুহিন। এতো দ্রুত কিভাবে রিপ্লাই দিতে পারলো? মেয়েটার আঙুল তো দেখি মেশিনের মতো চলে!

মেসেজটার জবাব দেবার আগে আস্তে করে চোখ তুলে কেএসকের দিকে তাকালো। সাবেক ইনভেস্টিগেটর চশমার উপর দিয়ে তার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে।

“হাসছেন কেন?” জানতে চাইলো রুহিন।

“মনে হইতাছে না খুনখারাবি করা আপনের কাজ!”

অধ্যায় ৩৭

নিজের ঘরেই ক্লিনশেভ করে পরিপাটি জামা পরে নিলো ডাক্তার মামুন। আজ তার মেজাজ খুব ভালো। শিষ বাজিয়ে একটা গান গাওয়ার চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। অনেকদিন শিষ বাজায় নি, তাই কেমন জানি বেসুরো শোনালো।

ঘর থেকে বের হবার আগে টয়লেটের আয়নার নিজের মুখটা আরেকবার দেখে নিলো। তার ঘরে কোনো ড্রেসিং টেবিল নেই। আসবাব বলতে একটা বেড, ওয়াড্রব আর এক জোড়া সোফা।

মাথার চুলে জেল দেবে কিনা সিদ্ধান্ত নিতে পারলো না। যার সাথে এখন দেখা করতে যাবে সে অবশ্য চুলে জেল দেয়াটা পছন্দই করে। অনেকদিন পর আজ তাদের মধ্যে আবার দেখা হতে যাচ্ছে। এই পুণর্মিলনীটা এতো সহজে সম্ভব হয় নি।

শেষ পর্যন্ত জেল না দিয়েই বের হয়ে গেলো সে। অ্যাপার্টমেন্টের মেইন দরজাটা লক করে যে-ই না ঘুরতে যাবে সঙ্গে সঙ্গে চমকে গেলো মামুন।

তার ঠিক পেছনেই দু'জন লোক এসে দাঁড়িয়েছে। এদেরকে সে চেনে। একজনের সাথে তার কথা হয়েছে, অন্যজনকে টিভি আর পত্রপত্রিকায় মাঝেমধ্যেই দেখা যায়। মানুষজনকে আইনী পরামর্শ দেয়। জটিল জটিল সব আইনের সহজ সুন্দর ব্যাখ্যা দেয়। *হারামির বাচ্চা!*

"আপনি?" অবাক হয়েই জানতে চাইলো সে।

কেএসকে আর ব্যারিস্টার রুহিন দাঁড়িয়ে আছে ডাক্তারের অ্যাপার্টমেন্টের দরজার সামনে।

"কেমন আছেন, ডাক্তার সাহেব?"

সাবেক ইনভেস্টিগেটররের দিকে বিস্ময়ে চেয়ে রইলো ডা: মামুন। ব্যারিস্টার রুহিন মালিককে দেখেও না চেনার ভান করলো। "আপনি? এখানে?"

“একটা দরকারে আসতেই হইলো,” বললো কেএসকে।

এবার রুহিনের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালো ডাক্তার।

“উনারে মনে হয় আপনে চিনেন...ব্যারিস্টার রুহিন মালিক।”

ব্যারিস্টারের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিলো মামুন।

“আশা করি উনার নাম আপনি শুনছেন,” হেসে বললো কেএস খান।

রুহিন হাত বাড়িয়ে দিলে ডাক্তার মামুন অনিচ্ছা সত্ত্বেও করমর্দন করলো।

“আপনারা এখানে কেন এসেছেন?”

“আপনার সাথে একটু কথা ছিলো,” গুরুগম্ভীরভাবেই বললো কেএসকে।

“কি ব্যাপারে?”

“বলতাছি। আগে চলেন আপনার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়া বসি।”

কেএসকের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো ডাক্তার।

“এইটা তো আপনারই অ্যাপার্টমেন্ট, তাই না?”

“আমার মানে...আমি এখানে ভাড়া থাকি...” অপ্রস্তত হয়ে বললো ডাঃ মামুন।

“যাইহোক, ঘটনা একই,” বলেই রুহিনের দিকে তাকালো কেএসকে।

“আপনারা আমার কাছে কী চান, বলেন তো?”

“আপনার অ্যাপার্টমেন্টে বইসা কথা বললে ভালো হইতো না? ব্যাপারটা খুবই জরুরি।”

“আমি একটা কাজে বাইরে যাচ্ছি...”

“আমরা বেশি সময় নেবো না,” বললো রুহিন মালিক। “কিছু জরুরি কথা সেরেই চলে যাবো।”

ডাঃ মামুন একটু ভেবে চুপচাপ দরজা খুলে তাদেরকে ভেতরে ঢুকতে দিলো। তারা সবাই বসলো ড্রইংরুমে। এক জোড়া সোফা ছাড়া সেখানে আর কিছু নেই। কেএসকে চারপাশটা ভালো করে দেখে নিলো।

“যা বলার তাড়াতাড়ি বলবেন...আমি আপনাদেরকে বেশি সময় দিতে পারবো না,,” একটা সিঙ্গেল সোফায় বসে বললো ডাক্তার মামুন।

“তাইলে সরাসরি আসল কথায় চইলা আসি,” একটু থেমে আবার বললো কেএসকে। “মাহবুব সাহেবের সাথে আপনের সম্পর্কটা কি?”

ডাক্তার ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

"ডাক্তার আর রুগির বাইরেও আপনাগো একটা রিলেশন্স আছে, তাই না?"

মামুন একবার রুহিনের দিকে, একবার কেএসকের দিকে তাকালো। ব্যারিস্টার অবশ্য কিছু বলছে না। চুপচাপ ডাক্তারকে দেখে যাচ্ছে।

"রোগি যদি পূর্বপরিচিত হয়, আত্মীয় হয় তাহলে কি ডাক্তারের জন্য সেটা অপরাধ?"

"আরে না, কী যে কন। অপরাধ হইতে যাইবো কেন?" হেসে রুহিনের দিকে তাকালো সাবেক ইনভেস্টিগেটর।

"মাহবুব ভাই আমার বড় ভায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন," বললো ডাক্তার মামুন। "আমার ঐ ভাই এখন আমেরিকায় থাকে।"

"আচ্ছা," বললো কেএস খান। "এই কথাটা আপনে আমারে আগে বলেন নি ক্যান?"

"দরকার মনে করি নি তাই বলি নি। এটা বলার মতো কোনো কথা? কতো রোগিই তো আমার পরিচিত থাকে..." একটু থেমে অনেকটা রেগেই বললো ডাক্তার, "আপনি কে যে আপনাকে এতোসব কথা বলবো? এই কেসটা তো আর আপনি ইনভেস্টিগেশন করছেন না।"

"যারা ইনভেস্টিগেশন করছে সেই পুলিশকেও তো আপনি এটা বলেন নি," এবার মুখ খুললো রুহিন।

ডাক্তার তার দিকে তাকিয়ে চোখ কুচকে বললো, "পুলিশকে আমি কি বলেছি না বলেছি সেটা কি আপনাকে বলতে হবে?"

"আরে, আপনে দেখি রাইগা গেছেন," শান্তকণ্ঠে বললো কেএসকে। "আপনেরে তো আগেই বলছি, আমি এই কেসটা তদন্ত করতাছি না। আমারে আপনে ইনভেস্টিগেটিভ কনসালটেন্ট বলতে পারেন।"

ভুরু তুললো ডাক্তার। "ইনভেস্টিগেটিভ কনসালটেন্ট?...শার্লোক হোমস?" ব্যঙ্গ করেই বললো সে।

"কী যে বলেন, শার্লোক হোমস হইতে যামু কোন্ দুঃখে," শান্ত হয়েই বললো কেএস খান। "যদি তাই হইতাম তাইলে তো আপনেরে প্রথম দিন দেইখাই সব পই পই কইরা বইলা দিতাম...আপনের অ্যানগেজমেন্টটা ভাইঙ্গা গেছে...সম্ভভত, মাইয়াপক্ষ থেইকা এইটা হইছে..."

ডাক্তার বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলো। তার দৃষ্টি যেনো আটকে আছে সাবেক ইনভেস্টিগেটরের উপর।

"...তারা হয়তো ঢাকা শহরে নিজের বাড়ি নাই এইরকম কোনো ছেলের সাথে মাইয়া বিয়া দিতে চায় না ।"

ডাক্তার চমকে উঠলো কিছুটা ।

"ব্যাপারটা যেকোনো পুরুষ মানুষের জন্যই অপমানজনক...তাই না?" একটু থেমে জবাবের অপেক্ষা না করেই আবার বললো, "আপনেরও অনেক খারাপ লাগছে...সেইটাই স্বাভাবিক ।"

"আপনি কি আমাকে এসব কথা বলতে এখানে এসেছেন?" ডাক্তার যেনো অধৈর্য হয়ে উঠলো ।

"আরে না...এইটাও তো আপনের হাসপাতালের কলিগেরাও জানে । আমরা একটা জরুরি বিষয় নিয়া কথা বলতে আসছি ।"

"তাহলে দয়া করে সেটা বলুন...আমাকে বের হতে হবে ।"

একটু চুপ করে থেকে ড্রইংরুমের চারপাশে চোখ বুলিয়ে বললো সাবেক ইনভেস্টিগেটর, "কাজটা তাইলে এই অ্যাপার্টমেন্টের বদলে কইরা দিছেন?"

চোখেমুখে বিস্ময় নিয়ে বললো ডাক্তার, "কি!" তার নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে গেলো । "কাজটা মানে? কিসের কথা বলছেন?"

পাশে বসা রুহিনের দিকে চকিতে চেয়ে নিলো কেএসকে । "মাহবুব সাহেবের কাজটা..."

"হোয়াট রাবিশ?" তেতে উঠলো ডাক্তার মামুন । "মাহবুব সাহেবের কিসের কাজ?"

"উনার অপারেশনের কথা বলতাছি..."

"আজব কথা!" ডাক্তারের মুখে বাঁকা হাসি । "মাহবুব ভায়ের অ্যাপেন্ডিক্সের অপারেশনটা মানে? এরকম একটা সামান্য অপারেশনের জন্য কেউ এতো দামি অ্যাপার্টমেন্ট দেবে? পাগল!"

"তা দিবো না," শান্তকণ্ঠে বললো কেএসকে । "কিন্তু অপারেশনটা যদি আট-দশটা অপারেশনের মতো না হয়, তাইলে?"

"আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, উনার অপারেশনটা হয় নি?"

"ধুর, এই কথা কওনের উপায় আছে?" জোর দিয়ে বললো কেএস খান । "প্রথমে আমিও ভাবছিলাম অপারেশনটা ভুয়া । কিন্তু পরে দেখলাম এইটা সত্যি সত্যি হইছে । ওইটা ভুয়া হইলে এই কেসটা এক্কেবারে পানির মতো সহজ হইয়া যাইতো ।"

ডাক্তার মামুন ভুরু কুচকে চেয়ে থাকলো।

"কিন্তু এতো কাঁচা কাজ তো মাহবুব সাহেব করেন নাই। অপারেশনটা উনি ঠিকঠাকমতোই করাইছেন।"

"তাহলে এসব আজেবাজে কথা বলছেন কেন?"

"কারণ অপারেশনটা ছাড়াও আরো কিছু ব্যাপার আছে এইখানে।"

একবার রুহিন আরেকবার কেএসকের দিকে তাকালো ডাক্তার। "কি-কি ব্যাপার আছে?" একটু তোতলালো সে। "কি-কিসের কথা বলছেন?"

"সবাই যেটা জানে না সেইটার কথা বলতাছি।"

"আপনি কী বলতে চাচ্ছেন স্পষ্ট করে বলুন," দ্রুত নিজেকে ফিরে পেলো ডাক্তার। "আমার বাড়িতে এসে আমার সাথে তামাশা করে যাচ্ছেন...সঙ্গে করে আবার নিয়ে এসেছেন খুনের মামলার আসামিকে।" ডাক্তারের ফর্সা মুখটা লাল হয়ে গেছে। রাগে ফুঁসছে রীতিমতো। "যে লোক হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে ছিলো তাকে খুনি বানানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আজব! আপনাদের এসব গাজাখুরি গল্প কেউ বিশ্বাস করবে?"

"না, কেউ বিশ্বাস করবো না," বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই বললো সে। "শক্ত প্রমাণ ছাড়া এসব কথা কে বিশ্বাস করতে যাইবো?"

"তাহলে দয়া করে আগে শক্ত প্রমাণ জোগার করুন। যার তার বাড়িতে এসে এসব ফালতু গল্প বলে সময় নষ্ট করবেন না।"

"আচ্ছা, তাইলে এইটা আপনের বাড়ি?" হেসে বললো কেএসকে। তাকে খুব রিল্যাক্স দেখাচ্ছে।

"হ্যা, আমার বাড়ি, আপনার কোনো সমস্যা আছে?" রেগেমেগে বললো ডাক্তার।

রুহিনের দিকে ফিরলো কেএস খান। সে ভুরু কুচকে চেয়ে আছে ডাক্তারের দিকে। "দেখেন তো কী মুশকিল...আমার কেন সমস্যা হইবো..." ডাক্তারের দিকে ফিরলো এবার। "কেউ যদি নিজের অ্যাপার্টমেন্ট অন্য কাউরে দান কইরা দেয় তাতে আমার কী?"

উঠে দাঁড়ালো মামুন। "প্লিজ, আপনারা এখন আসুন...আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে।"

মুচকি হাসলো কেএসকে। "বসেন, মাথা গরম কইরেন না। আপনেরে একটা জিনিস দেখাইয়া চইলা যাবো।" এরপর ব্যারিস্টারের দিকে তাকিয়ে

ইশারা করতেই সে ব্যাগ থেকে ল্যাপটপটা বের করে চালু করে দিলো।

ডাক্তার মামুন কিছু বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে থাকলো চুপচাপ।

রুহিন মালিক একটা ভিডিও ফুটেজ ওপেন করে ল্যাপটপটা ডাক্তারের দিকে ঘুরিয়ে দিলো।

"বসেন," শান্তকণ্ঠে বললো কেএসকে। "ভিডিওটা ভালা কইরা দেখেন..."

ল্যাপটপের পর্দায় দেখা গেলো লো-রেজুলুশনের একটা সিসি-ক্যামের ফুটেজ।

"আপনে যে হাসপাতালে কাজ করেন সেইখানকার পার্কিংলটের সিসি-ক্যাম," বললো কেএসকে।

অবশ্য এটা ডাক্তার মামুনকে না বললেও চলতো। ফুটেজ দেখেই সে চিনতে পেরেছে।

এখন যে ফুটেজটা দেখানো হচ্ছে সেটা বিকেল ৪: ৪৩ মিনিটের।

একটা প্রাইভেটকার হাসপাতালে ঢুকছে।

"এই গাড়িটা ব্যবসায়ি রফিক হাওলাদারের...উনি কয়েকদিন আগে খুন হইছেন...দুই দিন আগে গাড়িটা পুলিশ উদ্ধার করতে পারছে..."

কেএসকের দিকে ভুরু কুচকে তাকালো ডাক্তার। "এসব আমাকে দেখাচ্ছেন কেন?"

"আহ্, একটু ধৈর্য ধরেন না...পরেরটা দেখেন।"

মাথা দোলালো ডা: মামুন।

ব্যারিস্টার রুহিন ভিডিওটা একটু ফার্স্টফরোয়ার্ড করে দিলো।

এবার দেখা গেলো ৬:৪০ মিনিটের ফুটেজ।

ঐ একই প্রাইভেটকারটি হাসপাতাল থেকে বের হয়ে যাচ্ছে।

"হাসপাতালগুলার এই একটা জায়গায় সিকিউরিটি বেশ ভালো," মন্তব্য করলো সাবেক ইনভেস্টিগেটর। "পেমেন্ট না দিয়া কোনো রোগি যাতে বাইর হইয়া যাইতে না পারে সেইজন্যে কর্তৃপক্ষ বেশ সজাগ থাকে।"

অস্থির হয়ে উঠলো ডাক্তার। "আমি আবারো বলছি, আসল কথায় আসুন, প্লিজ।"

"আসল কথা হইলো আপনে একটা হত্যাকাণ্ডে সাহায্য করছেন, ডাক্তার। খুবই গুরুতর অভিযোগ।"

তাচ্ছিল্যভরে হাসলো ডাক্তার মামুন। "এই ভিডিও'তে সেটাই

দেখালেন এতোক্ষণ?"

কেএসকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। তার অন্তর্ভেদি দৃষ্টি যেনো ডাক্তারের ভেতরটা দেখতে পাচ্ছে। "আপনি রফিক হাওলাদারকে খুন করার কাজে মাহবুব সাহেব্রে সাহায্য করছেন।"

"এইসব ভিডিও দেখিয়ে আপনি এটা প্রমাণ করলেন?" বাঁকা হাসি হাসলো। "ফাইন। পুলিশের কাছে গিয়ে এসব বলুন। আমার কাছে কেন এসেছেন?"

"আপনি অস্বীকার করছেন তাহলে?" ব্যারিস্টার রুহিন বলে উঠলো।

"অবশ্যই। পার্কিংলটে কোন্ গাড়ি বের হলো কোন্ গাড়ি ঢুকলো সেটা দিয়ে আপনারা কী বোঝাতে চাইছেন? এই একটা ভিডিও দেখিয়ে এমন ভাব করছেন যেনো বিরাট কোনো প্রমাণ পেয়ে গেছেন। পুরোটাই হাস্যকর।"

"আপনি যদি ভাইবা থাকেন আমার কাছে শুধুমাত্র এই একটা প্রমাণই আছে তাইলে ভুল করছেন।"

হাতঘড়ি দেখলো ডাঃ মামুন। "আমাকে যেতে হবে। আপনাদের আর সময় দেয়া সম্ভব নয়।"

"প্লিজ...আরেকটা জিনিস দেখেন," কথাটা বলেই রুহিনের দিকে ফিরলো। "নেক্সট।"

ব্যারিস্টার ভিডিওটা আবারো ফার্স্টফরোয়ার্ড করে দিলো।

ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে অন্য আরেকটা গাড়ি বের হয়ে যাচ্ছে রাত সাড়ে আটটার দিকে। ডাঃ মামুনের চোখমুখ কুচকে গেলো।

"পার্কিংলট থেইকা শুধু পেশেন্টদের গাড়িই বের্ হয় না...হাসপাতালের ডাক্তার-কর্মচারিদের গাড়িও বাইর হয়। এই গাড়িটা নিশ্চয় আপনে চিনতে পারতাছেন?"

ডাঃ মামুন যেনো ভাবনায় পড়ে গেছে। মুখে কিছু বললো না।

"ঠিক এই গাড়িটাই এই অ্যাপার্টমেন্টের নীচে পার্ক করা আছে। আমরা আসার সময় সেইটা দেখছি। খুব সম্ভবত আপনার নামেই লাইসেন্স করা। অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।"

"আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?" ডাক্তারের কণ্ঠটা দুর্বল শোনালো।

রুহিনের দিকে চকিতে চেয়ে বললো কেএসকে, "আপনে আমারে বলছিলেন মাহবুব সাহেবের অপারেশনটা হইছিলো সন্ধ্যা সাতটা

বাজে...ঠিক?"

"হ্যা।" ছোট্ট করে বললো ডাক্তার।

"অপারেশন শেষে সোজা চইলা যান নিউমার্কেটে। কিছু কেনাকাটা করতে..."

ডাক্তার চুপ।

"অথচ আপনি হাসপাতাল থেইকা বাইর হইছেন সাড়ে আটটা বাজে। এই ভিডিওতে সেইটা স্পষ্ট বোঝা যাইতাছে। তাইলে আপনে এতোক্ষণ হাসপাতালে কি করছেন?"

"কি করছিলাম মানে?...আপনারা কি বলতে চাচ্ছেন?" ডাক্তার মামুন যেনো জোর করে নিজেকে ধরে রাখার চেষ্টা করলো।

"সেইটা তো আমার চায়া আপনেই ভালো বলতে পারবেন," তারপর একটু থেমে ব্যারিস্টারের দিকে তাকালো। "অবশ্য আমিও জানি কি করতাছিলেন।"

ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো ডাক্তার।

মাথা নেড়ে তাকে আশ্বস্ত করলো কেএসকে। "অপারেশন থিয়েটারেই ছিলেন, জরুরি একটা অপারেশন করতে। খুবই ঘনিষ্ঠ একজনের হঠাৎ কইরা অ্যাপেন্ডিসাইটিসের সমস্যা দেখা দেয়...তাই না?"

"এটা সবাই জানে...পুরো হাসপাতাল জানে।"

"কিন্তু সবাই যেটা জানে না সেইটা হইলো...আটটার অপারেশন ৭টায় রেকর্ড করা! খুব সহজেই এইটা আপনি করতে পারছেন। ছোটোখাটো জালিয়াতি। কাজটা করতে কোনো সমস্যাই হয় নাই। কে আর খেয়াল রাখতে যাইবো, কোন্ অপারেশন কয়টা বাজে হইলো?...দারুণ! ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া!" মুচকি হেসে আবার বললো, "এইটা কি আপনের আইডিয়া ছিলো নাকি মাহবুব সাহেবের?"

স্থিরচোখে চেয়ে রইলো ডাক্তার। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে। অনেকটা জোর করে শক্তি সঞ্চয় করে নিয়ে বললো, "রাবিশ!"

"আপনে হয়তো খেয়াল করেন নাই...ঐদিন আপনাগো হাসপাতালে সন্ধ্যা ৭টায় আরেকটা অপারেশন হইছিলো...অন্য এক ডাক্তার সেইটা করছে...অন্য এক রোগির। এইটাও রেকর্ডে আছে।"

ডাক্তার কিছুই বললো না। তার দৃষ্টি যেনো আটকে আছে কেএসকের

উপরে।

"আমি আপনাগো অপারেশন থিয়েটারটা দেখছি...আমার মনে হয় না ওইখানে একসাথে দু' দুইটা অপারেশন করা সম্ভব। তাইলে দুইটা অপারেশন একই টাইমে রেকর্ড হইলো কেমনে?"

ডাক্তার মামুন রেগেমেগে উঠে দাঁড়ালো আবার। "এক্ষুণি আমার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হয়ে যান। এক্ষুণি!"

অ্যাপার্টমেন্টটার চারপাশে তাকালো কেএসকে। তার ভাবভঙ্গি একদম স্বাভাবিক। ডাক্তারের হুঙ্কার একটুও আমলে নিলো না।

"এই অ্যাপার্টমেন্টটার জন্যই আপনে এতোবড় ঝুঁকি নিছেন...ভেরি স্যাড!"

"গেট লস!" চিৎকার করে বললো ডাক্তার। রাগে থর থর করে কাঁপছে সে।

রুহিন মালিক উঠে দু'হাতে ডাক্তারের কাঁধটা শক্ত করে ধরে কটমট চোখে তাকালো। প্লেবয় ব্যারিস্টারের পৌরুষ যেনো ঠিকরে বের হচ্ছে এখন।

কেএসকে কিছু বললো না। যেনো সে জানে রুহিন কি করবে।

হতভম্ব ডাক্তার চেয়ে রইলো রুহিনের দিকে। আস্তে করে ঢোক গিললো সে।

"বসুন!" ধমকের সুরে বললো ব্যারিস্টার। তারপর ডাক্তারের কাঁধে চাপ দিয়ে তাকে সোফায় বসিয়ে দিলো। "আর কোনো চালাকি করবেন না।"

ব্যারিস্টারের এমন আচরণে কেএসকে খুব মজা পেলো। তার মুখে ফুটে উঠলো হাসি।

"আমাগো সাথে কো-অপারেট না করলে আপনের ভালো হইবো না। বিরাট বিপদে পইড়া যাইবেন।"

ডাক্তার মামুন আতঙ্কে জমে গেলো।

অধ্যায় ৩৮

মানসিক হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর মাহবুব একেবারে অন্তরালে চলে যায়। নিজের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, কারো সাথেই দেখা করতো না। অনেকটা নিভৃত্যে জীবনযাপন করতে শুরু করে সে। নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যে আর ফিরে যায় নি সে।

তার ব্যবসায়িক পার্টনারের কাছে নিজের অংশ বিক্রি করে দেয়। সেই টাকার বিরাট একটি অংশ নিজের নামে ব্যাঙ্কে ডিপোজিট করে রাখে। মাসে মাসে সেখান থেকে যে পরিমাণ ইন্টারেস্ট পায় তা দিয়ে চলতে থাকে তার দিনকাল।

আগে থেকেই মাহবুব আনামের দুটো ফ্ল্যাট ছিলো, একটি স্ত্রীর নামে অন্যটি তার। এছাড়াও পৈতৃকসূত্রে পাওয়া ঢাকা শহরে তার একটি বাড়ি আছে। পুরনো ঐ বাড়িটা ভেঙে ডেভেলপ করার কথা থাকলেও মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার পর থেকে ওটার কাজ আর এগোয় নি।

মানসিক হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর কয়েক মাস নিজেকে গুটিয়ে রাখার পর এক সময় একটু আধটু বাইরে বেরোতে শুরু করে সে। ঠিক তখনই ডা: মামুনের সাথে দেখা হয়ে যায় পথে। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুমনের ছোটো ভাই। যেদিন তাদের দেখা হয় সেদিনটা ডাক্তারের জন্য মোটেও ভালো কোনো দিন ছিলো না।

মাহবুবও সেটা ধরতে পেরেছিলো। সে-কথা জিজ্ঞেস করতেই মামুন জানায়, তার অ্যানগেজমেন্টটা ভেঙে গেছে কারণ পাত্রিপক্ষ জেনে গেছে ঢাকা শহরে তার নিজস্ব কোনো বাড়ি নেই। এর আগে তার প্রেমিকা শীলার সাথে পরামর্শ করেই এতোবড় মিথ্যেটা বলেছিলো। শীলা জানিয়েছিলো ওর পরিবার যদি জানে পাত্রের নিজের কোনো বাড়ি কিংবা ফ্ল্যাট নেই তাহলে কোনোভাবেই বিয়ে দিতে চাইবে না।

যে ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকতো সেটাকেই নিজের বলে চালিয়ে দিয়েছিলো মামুন। ভালোয় ভালোয় অ্যানগেজমেন্টও হয়ে যায় কিন্তু তিনদিন আগে শীলার এক আত্মীয় জানায় ডাক্তার মিথ্যে বলেছে। সে ভাড়া থাকে। তার নিজের কোনো ফ্ল্যাট নেই। কাকতালীয়ভাবে ঐ ফ্ল্যাটের মালিক আর শীলার আত্মীয় পূর্বপরিচিত, ঘনিষ্ঠ।

এতো বড় একটা জালিয়াতি আর মিথ্যে বলার অপরাধে অ্যানগেজমেন্টটা ভেঙে যায়। মামুনের কিছুই করার ছিলো না। অপমান আর হীনমন্যতায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে সে।

তো ঐদিন ডাক্তারের সাথে দেখা হবার পর বাড়ি ফিরে আসে মাহবুব। সারাটা রাত তার মাথায় একটা চিন্তাই ঘুরপাক খেতে শুরু করে।

মামুনের দরকার নিজের একটা ফ্ল্যাট। তার দরকার একটু সাহায্য।

ডাক্তারের সাথে দেখা হবার তিনদিন পরই এই প্রস্তাবটা দেয় মাহবুব। প্রথমে ফোন করে দেখা করে, তারপর নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া বিয়োগান্তক ঘটনাটা খুলে বলে বন্ধুর ছোটো ভায়ের কাছে। শায়লার খুন, রফিকের বেকসুর খালাস, মানসিক হাসপাতালের সময়গুলো, সব।

তার কথা শুনে ডাক্তারেরও সহানুভূতি তৈরি হয় কিন্তু মাহবুবের প্রস্তাবটা শুনে প্রথমে ভড়কে যায় সে। পরে ভেবে দেখে একটু ঝুঁকি থাকলেও কাজটা তেমন কঠিনও হবে না তার জন্য। খুনটা তো আর সে নিজে করতে যাচ্ছে না।

অবশেষে বারো শ' স্কয়ার ফুটের একটি ফ্ল্যাটের বিনিময়ে মাহবুবের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায় ডাক্তার মামুন।

তবে মাহবুব এখানেও চালাকির আশ্রয় নেয়। সে কাজটা কিভাবে করবে সে-ব্যাপারে মামুনকেও খুলে বলে না। ডাক্তার শুধু জানতো, অ্যাপেন্ডিক্সের অপারেশনটাকে অ্যালিবাই করে রফিক হাওলাদারকে খুন করা হবে। ব্যারিস্টারকে ফাঁসিয়ে দেয়া, কিংবা রফিক হাওলাদারকে অপহরণ করে তারই গাড়িতে করে হাসপাতালে নিয়ে আসা, এসবের কিছুই জানতো না মামুন। জানলে হয়তো এরকম কোনো কাজের সাথে নিজেকে জড়াতো না।

ঘটনার পর পর টিভি আর পত্রপত্রিকার মাধ্যমে সব জানতে পারে

মামুন। এ নিয়ে মাহবুবের সাথে তার কথাও হয়। কিন্তু কোনো সদুত্তর পায় নি। ডাক্তার বুঝতে পারে, ইচ্ছে করেই মাহবুব তার পুরো পরিকল্পনাটি না বলে তাকে ব্যবহার করেছে। সব বুঝতে পারলেও ডাক্তারের আর কিছু করার থাকে না। সে এরইমধ্যে মাহবুবের জালে জড়িয়ে পড়েছে।

রফিক হাওলাদারের খুনের ঘটনাটি তদন্ত শুরু হবার পর মাহবুবের সাথে তার নিয়মিত যোগাযোগ হতে থাকে। কখন কি হচ্ছে, কে আসছে, কি ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছে সব জানিয়ে দিয়েছে তাকে।

"এখন উনি কোথায় আছেন?" এতোক্ষণ ধরে ডাক্তারের কাছ থেকে সব শোনার পর জিজ্ঞেস করলো কেএসকে।

মামুন স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। রুহিন এখনও তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে প্রহরীর মতো। একটু আগে ডাক্তারের মোবাইলফোনটা নিয়ে নিয়েছে সে।

"মাহবুব সাহেব কোথায় আছে সেইটা নিশ্চয় আপনে জানেন?"

মাথা দোলালো ডাক্তার। সে জানে না।

"আজ সকালেই মাহবুব সাহেবের সাথে উনার কথা হয়েছে," বললো রুহিন। এরইমধ্যে ডাক্তারের কললিস্ট চেক করে দেখেছে সে।

"কথা হয়েছে কিন্তু...মানে, আমি জানি না মাহবুব ভাই এখন কোথায় থাকে। শুনেছি দু'তিন আগে তার অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে," ম্রিয়মান কণ্ঠে বললো মামুন।

"আপনাগো মইধ্যে শ্যাষ কি কথা হইছে?"

কেএসকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো ডাক্তার।

অন্তর্ভেদী চোখে চেয়ে রইলো সাবেক ইনভেস্টিগেটর। "মাহবুব সাহেব্রে সব জানায়া দিছেন, না?"

ঢোক গিললো সার্জন মামুন। জবাব দেবার আগে একটু ভেবে নিলো। "আজ আমাদের হাসপাতালে ডিবির এক লোক গেছিলো...আমি সেটা তাকে জানিয়েছি.."

চোখ কুচকে চেয়ে রইলো কেএসকে। "হাসপাতালের সিসি-ক্যামের ফুটেজের কথা?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ডাক্তার।

রুহিনের দিকে তাকালো কেএসকে। তারপর মোবাইলফোনটা পকেট থেকে বের করে একটা নাম্বারে কল দিলো। কেএস খানের চোখেমুখে বিব্রত হবার লক্ষণ দেখা গেলো সঙ্গে সঙ্গে।

"আমার তো দেখি ব্যালান্স নাই," ফোনটা নামিয়ে বললো সে। "আপনের ফোনটা একটু দেন তো, ব্যারিস্টার সাহেব।"

রুহিন তার ফোনটা কেএসকের দিকে বাড়িয়ে দিতেই একটা কণ্ঠ বলে উঠলো, "স্যার।"

ঘরের সবাই দেখতে পেলো আমিনুল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

"আপনাদের দেরি দেখে আর থাকতে পারলাম না।"

ডাক্তার মামুন ভয়ে ঢোক গিললো।

"কিছু বের করতে পারলেন?"

আমিনুলের প্রশ্নে কেএসকে শুধু হাসলো। এ হাসি সন্তুষ্টির।

অধ্যায় ৩৯

তার মধ্যে কোনো উদ্বেগই নেই। এখন যদি তার পাল্‌স মাপা হয় দেখা যাবে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকই আছে।

যদিও তার ধারণা সব কিছু প্রকাশ হয়ে পড়বে খুব জলদি। যে সূক্ষ্ম পরিকল্পনা করেছিলো, যেভাবে বাস্তবায়ন করেছিলো তাতে করে মনে হয় নি এতো দ্রুত সব উন্মোচিত হয়ে যাবে।

শালার কেএস খান! একটা গালি দিলো সাবেক ইনভেস্টিগেটরকে। এরইমধ্যে সে জেনে গেছে রুহিনকে সাহায্য করছে এই ভদ্রলোক। ডাক্তার মামুন তাকে সব জানিয়েছে। তারপর সে নিজেও কিছু খোঁজখবর করে জেনে নিয়েছে বাকিটা।

আজ ঐ হাসপাতালে ডিবির এক কর্মকর্তা এসেছিলো। না, ডাক্তারের সাথে দেখা করে নি। হাসপাতালের সিসি-ক্যামের ফুটেজ সংগ্রহ করে নিয়ে গেছে সে।

ডাক্তারের কাছ থেকে কথাটা শুনে প্রথমে বুঝতে পারে নি–এ নিয়ে এতো চিন্তার কী আছে? সিসি-ক্যামের ফুটেজ ঘেঁটে কোন্ বালটা আবিষ্কার করবে?

কিন্তু ডাক্তার মামুন যখন তাকে বুঝিয়ে বললো, সিসি-ক্যামের ফুটেজ থেকে অনেক কিছু জেনে যেতে পারে তদন্তকারী কর্মকর্তা। তাছাড়া হাসপাতালের রেকর্ড আবারো চেক করে দেখেছে ডিবির লোকজন। তারা কেন দ্বিতীয়বার এটা করলো? নিশ্চয় তাদের মধ্যে সন্দেহ ঢুকেছে–তখন মাহবুব চুপ মেরে যায়।

এই ব্যাপারটা তার মাথায়ই ছিলো না। ভেবেছিলো তার পরিকল্পনাটা একেবারে নিঁখুত। এর মধ্যে কোনো ফাঁকফোকর নেই। পুলিশের কাছ থেকে কেসটা যখন ডিবির কাছে হস্তান্তর করা হলো তখনও সে চিন্তার

কোনো কারণ খুঁজে পায় নি। ডাক্তার মামুনের কাছ থেকে কেএস খানের জড়িত হবার কথা শোনার পরও সে নিশ্চিত ছিলো, তার সূক্ষ্ম জাল ছিন্ন করা ঐ ভদ্রলোকের পক্ষেও সম্ভব হবে না। তবে একটু খোঁজখবর নিয়ে জেনেছে, এই ভদ্রলোক নাকি খুবই জাঁদরেল একজন ইনভেস্টিগেটর ছিলো। চাকরি জীবনে তার কোনো অমীমাংসিত কেস নেই। অসুস্থতার কারণে অকালে রিটায়ার করেছে, এখন ডিবির তদন্তকারী কর্মকর্তাদেরকে ট্রেইনিং দিয়ে থাকে। কিন্তু ঢেঁকি যেমন স্বর্গে গিয়েও ধান ভাঙে এই বানচোতটা তেমনি অবসরে গেলেও পুরনো অভ্যেস ছাড়তে পারে নি। তার সাবেক কলিগ আর ছাত্ররা কোনো কেসে সুবিধা করতে না পারলে সে এগিয়ে আসে তাদেরকে উদ্ধার করতে।

এখন ঐ বেশ্যাতুল্য ব্যারিস্টারকে উদ্ধার করার কাজে নেমে পড়েছে। *শূয়োরেরবাচ্চা!*

টের পেলো খুব ক্ষিদে পেয়েছে। সে থাকে একা। রান্নাবান্নার ধারেকাছে দিয়েও যায় না। সপ্তাহে দু'একদিন হোটেল-রেস্তোরাঁয় গিয়ে ভাত খেয়ে আসে। কতোদিন আর পাউরুটি, জেলি, স্যান্ডউইচ, পরোটা, ভাজি খাওয়া যায়। তার ঘরে ফ্রিজ আর মাইক্রোওভেন আছে। দু'তিন দিন আগে নিজের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে এখানে চলে আসে সে। ভেবেছিলো এ ঘরের ফ্রিজ আর ওভেনটা বুঝি ব্যবহার না করার কারণে নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু তা হয় নি। ফলে বাজার থেকে ড্রাইফুড কিনে এনে রেখে দিয়েছে। খিদে লাগলে ওভেনে একটু গরম করে খেয়ে নেয়। অবশ্য খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে কোনোকালেই তার আগ্রহ ছিলো না, এখনও নেই। শুধুমাত্র শায়লা যতোদিন বেঁচে ছিলো...

তার মনে পড়ে গেলো অসংখ্য স্মৃতি। মেয়েটা খুব খাদ্যরসিক ছিলো। খুব যে বেশি খেতো তা নয় কিন্তু নিত্য-নতুন খাবারের স্বাদ নিতো সে। এ শহরে নতুন কোনো খাবারের দোকান চালু হলেই সেখানে তাকে নিয়ে যেতে হতো। খাবারের মধ্যে ঝাল না থাকলে শায়লার ভালো লাগতো না। ঝাল মানে কড়া ঝাল। উফ, এতো ঝাল খেতে পারতো ও!

হেসে ফেললো সে। না। আরো একটা জিনিস পছন্দ করতো। আইসক্রিম। এমনকি শীতকালেও তার আইসক্রিম খাওয়া চাই। সে অবাক

হয়ে দেখতো কনকনে শীতেও আইসক্রিম খাচ্ছে শায়লা।

কথাটা মনে পড়তেই ফ্রিজ খুলে এক বাক্স আইসক্রিম বের করে রাখলো বিছানার পাশে ছোট্ট টেবিলটার উপর। সে নিজে আইসক্রিম না খেলেও গতকাল আইসক্রিম এনে রেখেছে। তার আশা, শায়লা হয়তো আইসক্রিমের লোভে আবার চলে আসবে! এখানে আসার পর একদিনের জন্যেও শায়লা আর আসে নি!

ডাক্তার মামুন দর দর করে ঘামছে। প্রেসার মাপার যন্ত্র ছাড়াই সে বলে দিতে পারে এখন তার প্রেসার কতো উপরে। পাগলের সাথে কাজ করার বিপদ হাঁড়ে হাঁড়ে টের পাচ্ছে। ভয়ে তার হৃদস্পন্দন বেড়ে হাতুড়ি পেটার মতো ধপধপ করছে এখন।

চারপাশে ফ্যালফ্যাল করে তাকালো সে। ডিবির ইনভেস্টিগেটর আমিনুল চোখমুখ শক্ত করে বসে আছে। একটু আগে হত্যাকাণ্ডে সহযোগীতা করার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে।

কেএস খান আর ব্যারিস্টার রুহিনও আছে ঘরে। তারা চুপচাপ বসে আছে।

এর আগে কখনও ডিবি অফিস তো দূরের কথা, কোনো থানায়ও যায় নি ডাক্তার। বুঝতে পারছে তার নার্ভ পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে।

তাকে কি রিমান্ডে নেয়া হবে? প্রশ্নটা খুব ভাবাচ্ছে। পুলিশ রিমান্ড কেমন হয় সে অভিজ্ঞতা তার নেই, তবে লোকমুখে যেরকম বর্ণনা শুনেছে সেটা রীতিমতো গা শিউরে ওঠার মতোই। নানা রকম নির্যাতনের কৌশল নাকি জানে এরা। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হলো পাছা দিয়ে আস্ত সেদ্ধ ডিম...

আর ভাবতে পারলো না। কেমন একটা শিরশিরে অনুভূতিতে আক্রান্ত হলো সে। *না*, মনে মনে বললো মামুন। আদালতে হাজির করে রিমান্ড আবেদন করা হয়। তাকে তো এখন পর্যন্ত সেখানে হাজির করা হয় নি। আর যাই হোক, এ মুহূর্তে তাকে রিমান্ডে দেয়া হবে না। খুকখুক করে কাশির শব্দ হলে সম্বিত ফিরে পেলো সে।

কেএস খান পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ চাপা দিয়ে আরো কয়েকটি কাশি দিলো।

"আপনি তাহলে সত্যি জানেন না মাহবুব সাহেব কোথায় আছে?" আমিনুল একেবারে পুলিশি কায়দায় জিজ্ঞেস করলো। এরইমধ্যে মাহবুব সাহেবের বাসায় স্থানীয় থানার পুলিশ রেইড দিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। মাথানষ্ট লোকটা সেখানে নেই। সটকে পড়েছে।

"বললাম তো, উনি এখন কোথায় আছে আমি জানি না," দুর্বল কণ্ঠে জবাব দিলো ডাক্তার। "হাসপাতাল থেকে রিলিজ হবার পর উনার সাথে আমার শুধু ফোনে যোগাযোগ হতো।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো আমিনুল। কিছু একটা ভেবে বললো, "আচ্ছা। ঠিক আছে।" একটু থেমে চোখমুখ আরো শক্ত করে ফেললো সে। "আমরা জানি কিভাবে সব জানতে হয়।"

ঢোক গিললো ডাক্তার মামুন। এরা কি এখন টর্চার করবে তাকে?

অধ্যায় ৪০

প্রচণ্ড রাগে পানির গ্লাসটা ছুঁড়ে মারলো ঘরের এককোণে। শব্দ করে ওটা অসংখ্য টুকরোয় ভেঙে গেলো। তার সারা শরীর রীতিমতো কাঁপছে। আবারো মাথাটা এলোমেলো হয়ে গেছে তার। চারপাশের সব কিছু ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করছে এখন। বিছানার উপর ধপ্ করে বসে পড়লো।

একটু আগে ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা পানি গ্লাসে ঢেলে যখন খেতে যাবে তখনই ফোনটা বেজে ওঠে। বিছানা থেকে ফোনটা তুলে ডিসপ্লের দিকে তাকিয়ে দেখে ডাক্তার মামুন ফোন করেছে। হয়তো নতুন কোনো ঘটনা ঘটে গেছে আবার। কিন্তু কলটা রিসিভ করার পর বুঝতে পারে সে-রকম কিছু না। তাকে অবাক করে দিয়ে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলতে শুরু করে ডাক্তার। তার কথাবার্তায় কেমন জানি নার্ভাসনেস ছিলো। যেনো গলা দিয়ে শব্দ বের হতে চাচ্ছে না। একেবারে জরুরি প্রয়োজন না পড়লে ডাক্তার তাকে ফোন দেয় না।

মাহবুব অবশ্য তখন পর্যন্ত অবাক হয় নি। কয়েকদিন ধরেই ডাক্তার এই ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তিত। তার আশংকা, পুরো ঘটনা জানাজানি হয়ে যাবে। মাহবুব বার বার তাকে আশ্বস্ত করে যাচ্ছে–এরকম কিচ্ছু হবে না। সে নিশ্চিন্তে থাকতে পারে।

সামান্য একটু সাহায্যের বিনিময়ে আস্ত একটা ফ্ল্যাট পেয়েছে সে, তার তো খুশিতে নাচার কথা। না, তা না করে হিজড়াদের মতো ভয়ে কুকড়ে আছে। আরে, পুরুষ মানুষকে এতো ভয় পেলে চলে? তুমি এতো দামি একটা ফ্ল্যাট পাবে আর তার জন্যে একটু ঝুঁকি নেবে না?

কিছুটা বিরক্ত হলেও মাহবুব তার কথা শুনে যায় ফোনে। ঐ একই কথা। সাবধানে থাকতে হবে। আর কোনো বাড়াবাড়ি যেনো না করে। পুলিশ কিন্তু বুঝে যেতে পারে। বুঝে গেলে বিরাট সমস্যায় পড়ে যাবে তারা দু'জনেই।

ডাক্তারকে যথারীতি আশ্বস্ত করেছে সে। এইসব ঘ্যানঘ্যানানি আর

কতো শুনতে ইচ্ছে করে!

ডাক্তারের সাথে কথা শেষ করে ফোনটা রেখে দেবার পর থেকেই তার মাথায় একটা বিষয় ঘুরপাক খেতে থাকে।

কথা বলার এক পর্যায়ে ডাক্তারের ব্যাকগ্রাউন্ডে খুক করে কাশির শব্দ শুনেছে। সে একদম নিশ্চিত, তার কোনো ভুল হয় নি। প্রথমবার কাশিটা হতেই জোর করে সেটা চেপে রাখার চেষ্টা করা হয়।

কাশলো কে?

তার মানে ঘরে অন্য কেউ ছিলো? কিন্তু তার সাথে কথা বলার সময় ডাক্তারের আশেপাশে কেউ থাকার কথা নয়। অসম্ভব। নিশ্চয় কিছু একটা ঘাপলা হয়েছে।

একটা আশংকা মনের মধ্যে উঁকি দিতেই তার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। পানির গ্লাসটা ছুঁড়ে মারে প্রচণ্ড আক্রোশে।

এখন ঘরময় পায়চারি করছে উদভ্রান্তের মতো। ডাক্তার সম্ভবত পুলিশের কাছে ধরা পড়ে গেছে। থমকে দাঁড়ালো সে।

তার এই বাড়িটার খবর ডাক্তার জানে না। ডিবির লোকজন দেখা করতে এসেছিলো তার অ্যাপার্টমেন্টে। ওরা নিশ্চয় সবার আগে ওখানেই যাবে। তারপর না পেয়ে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াবে। এক সময় নিশ্চয় এখানকার খবরও জানতে পারবে তারা।

একটু আগেও মামুন তাকে জিজ্ঞেস করেছিলো সে এখন কোথায়, বরাবরের মতোই বলেছে বাড়িতে আছে।

এক ধরণের অস্থিরতায় আক্রান্ত হলো সে। তার মন বলছে এখানে থাকাটা ঠিক হবে না। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো অন্য কোথাও চলে যাবে। যতো দ্রুত সম্ভব।

এমন সময় টের পেলো খুব ক্ষিদে পেয়েছে। এক গ্লাস দুধ ছাড়া সকাল থেকে আর কিছু খায় নি। কেন জানি খেতে ইচ্ছে করছিলো না। কিন্তু এখন না খেলেই নয়।

ফ্রিজ খুলে তিন-চারটা স্যান্ডউইচ বের করে ওভেনে ঢুকিয়ে দিলো মাহবুব। শায়লার যেমন ঝাল আর ঠাণ্ডা প্রিয় তেমনি তার গরম গরম খাবার না হলে চলে না। ঠাণ্ডা খাবার একদম খেতে পারে না সে।

ওভেনের পাশে একটা জানালা আছে, সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো সে।

দোতলা এই বাড়িটা বহু পুরনো। তার বাবা এটা কিনেছিলো তার জন্মের পর পরই। তখন উত্তরার এ দিকটা একেবারেই বিরাণ ছিলো, জনবসতি গড়ে ওঠে নি। তার আত্মীয়স্বজনেরা খুব অবাক হয়েছিলো এরকম একটি জায়গায় বাড়ি কেনার কথা শুনে। তার বাবা অবশ্য এসব কথা গায়ে মাখে নি। নিরিবিলি জায়গায় দশ কাঠার এই প্লটে চমৎকার একটি দোতলা বাড়ি বানিয়ে ফেলে। মাঝেমধ্যেই শহর থেকে দূরে এ বাড়িতে এসে সপরিবারে তারা থেকে যেতো দুয়েকটা দিন।

মানসিক হাসপাতালে থাকার সময় এ বাড়িতে তাদের এক দূরসম্পর্কের আত্মীয় কেয়ারটেকার হিসেবে থাকতো। কয়েক মাস আগে রিলিজ পাবার পর সেই লোকটাকে বিদায় করে দিয়েছে মাহবুব।

হঠাৎ কিছু একটা চোখে পড়তেই তার চিন্তায় ব্যঘাত ঘটলো। চমকে উঠে ডান দিকে তাকালো সে। আস্তে করে এক পা পিছু হটে বাড়ির সামনে দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে সেদিকে তাকিয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত।

বরফের মতো জমে গেলো সে। তারপরই দৌড়ে বিছানার নীচ থেকে পিস্তলটা তুলে কোমরে গুঁজে নিয়ে অনেকটা দৌড়ে বের হয়ে হয়ে গেলো ঘর থেকে। ভালো করেই জানে বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

ডিবির মাইক্রোবাসটা দোতলা বাড়ির সামনে এসে থামতেই পেছন পেছন চলে এলো ব্যারিস্টার রুহিন মালিকের প্রাইভেটকারটি।

মাইক্রো থেকে আমিনুলসহ আরো দু'জন সাদা পোশাকের ডিবির লোক নেমে এলো। বাড়িটার দিকে তাকালো আমিনুল।

হলুদ রঙের মলিন একটি দোতলা বাড়ি। সম্ভবত ত্রিশ-চল্লিশ বছরের পুরনো হবে। সামনের মেইনগেটটা খোলা। বাড়িতে কেউ আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। মূল বাড়ির বাম দিকে একটা সিঁড়ি চলে গেছে দোতলায়। এ রকম ডিজাইনের বাড়ি এখন আর খুব বেশি দেখা যায় না।

ডাক্তার মামুনকে দিয়ে ফোন করানোর পরই তারা ট্র্যাকডাউন করে এই লোকেশনটা পেয়ে যায়।

রুহিন আর কেএসকে এসে যোগ দিলো আমিনুলদের সাথে।

ডিবির দু'জন লোক সবার আগে ঢুকলো বাড়িটার ভেতরে, তাদের পেছনে থাকলো আমিনুল. রুহিন আর কেএস খান।

জাল

নীচ তলাটা একদম ফাঁকা। এমন কি দরজা-জানালাগুলোরও কোনো কপাট নেই। বাইরে থেকেও বোঝা যাচ্ছে ওখানে কেউ থাকে না। ডিবির দু'জন কনস্টেবলকে নীচে রেখেই বাম দিকের দোতলা সিঁড়িটা দিয়ে উঠে গেলো আমিনুল, কেএসকে আর রুহিন।

নীচতলার মতোই উপর তলাতেও বড় বড় তিনটি ঘর। তবে পার্থক্য হলো এখানকার দরজা জানালা সব অক্ষত আছে। ড্রইংরুমটা এখন ফাঁকা। ডাইনিংরুমটার অবস্থা বেশ খারাপ। জায়গায় জায়গায় ছাদের পলেস্তারা ঝরে পড়ছে। জানালার চৌকাঠ পর্যন্ত উধাও।

ঘরঘর শব্দ কানে গেলো তাদের। শোবারঘরের কাছে এসে দেখতে পেলো দরজাটা পুরোপুরি খোলা। পুরনো একটি সিলিংফ্যান বহু কষ্টে ঘুরছে এখনও।

ঘরটা একদম ফাঁকা।

একটা পুরনো ফ্রিজ, সিঙ্গেল খাট, কাপড় রাখার আলনা আর রিডিং টেবিল। সেই টেবিলের উপর কোনো বইপত্র নেই। আছে একটা মাইক্রো ওভেন।

তাদের তিনজনের মধ্যে চাওয়াচাওয়ি হলো। সবার চোখে হতাশা।

আসামী টের পেয়ে ভেগেছে।

কেএসকের বুক ঠেলে খুকখুক করে কাশি হলো এ সময়। তার চেহারায় ফুটে উঠলো রাগ। এই রাগ তার নিজের উপর। ডাক্তার যখন মাহবুবের সাথে কথা বলছিলো তখন এভাবেই কেশে উঠেছিলো। কোনোভাবেই সেটা আটকে রাখতে পারে নি। সঙ্গে সঙ্গে মুখ চেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেও ততোক্ষণে দেরি হয়ে যায়।

মাহবুব নিশ্চয় এটা শুনে ফেলেছে। তারপর কিছু একটা আন্দাজ করতে পেরে ভেগে গেছে অন্য কোথাও।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো আমিনুল, "পালিয়েছে, স্যার।"

অন্যদিকে মুখটা সরিয়ে নিলো কেএস খান।

তারপর সিঙ্গেল খাটটার তলায় উপুড় হয়ে দেখলো কেউ ওখানে লুকিয়ে আছে কিনা। এটাই এ ঘরের একমাত্র লুকোবার জায়গা। যদিও সে জানে কিছুই পাবে না। তাই হলো।

কেএসকের দিকে তাকালো সে। চোখেমুখে বিব্রত ভাবটা এখনও যায় নি।

"চলেন, স্যার।"

কোমরে দু'হাত দিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে সাবেক ইনভেস্টিগেটর।

রুহিন তাড়া দিলো সাবেক ইনভেস্টিগেটরকে। "চলেন।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো কেএসকে।

তারা সবাই যখন ঘর থেকে বের হতে যাবে তখনই টুং করে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ হলো।

থমকে দাঁড়ালো কেএসকে। রুহিন অবশ্য এটা খেয়াল করে নি তবে আমিনুল ঘুরে তাকালো।

ঘরের ভেতর ঢুকে শব্দটার উৎস খুঁজলো সাবেক ইনভেস্টিগেটর। রিডিং টেবিলের উপর চোখ পড়তেই বুঝতে পারলো সে।

মাইক্রোওভেনটা!

চট করে পেছন ফিরে তাকাতেই আমিনুলের সাথে চোখাচোখি হয়ে গেলো।

"স্যার?" অস্ফুটস্বরে বললো। সেও বুঝতে পেরেছে।

"এইখানেই আছে, বাড়ির বাইরে যাইতে পারে নাই," চাপাকণ্ঠে বললো কেএসকে।

বিস্ময়ে চেয়ে রইলো রুহিন মালিক। সে কিছুই বুঝতে পারছে না।

মাথা নেড়ে সায় দিলো আমিনুল। তবে সে কিছু বলার আগেই হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলো কেএসকে।

"ডাক্তারের মোবাইলফোনটা দিয়া মাহবুব সাহেবরে কল দাও," ফিসফিসিয়ে বললো সে।

ডাক্তার মামুনের কাছ থেকে সিজ করা মোবাইলফোনটা আমিনুলের পকেটেই আছে, সেটা বের করে দ্রুত ডায়াল করলো।

ডায়াল হচ্ছে।

কয়েক মুহূর্ত পরই দূর থেকে একটা রিংটোন বেজে উঠলো!

দেরি না করে আমিনুল ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেলো। তার পেছন পেছন কেএসকে আর রুহিন।

রিংটোনের আওয়াজটা বন্ধ হয়ে যেতে বেশি সময় লাগলো না কিন্তু ততোক্ষণে যা বোঝার বুঝে গেছে তারা।

দোতলার ডাইনিংরুমে ঢুকে আমিনুল ফাঁকা জানালাটার কাছে ছুটে

যেতেই ধপ করে একটা শব্দ হলো।

"লাফ দিয়েছে!" চিৎকার করে বললো আমিনুল। জানালার ভেতর দিয়ে মাথা বের করে নীচটা দেখে নিলো। মাহবুব মাটিতে পড়ে একটা পা ধরে কাতরাচ্ছে। এতোক্ষণ সে কার্নিশের উপর দাঁড়িয়েছিলো।

"তুহিন! মোবারক! পেছন দিকে যাও! পেছনে!" চিৎকার করে নীচতলায় যে দু'জন ডিবির কনস্টেবল আছে তাদেরকে বললো সে।

তারপর দেরি না করে দৌড়ে ঘর থেকে বের হয়ে নীচতলার দিকে চলে গেলো কেএসকে আর রুহিনকে রেখেই।

নীচতলায় একটা হট্টগোলের শব্দ শুনতে পেলো কেএসকে আর রুহিন। একটু পর তারাও সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলো।

আমিনুল এতোক্ষণে বাড়ির পেছন দিকটায় চলে গেছে। তার দু'জন কনস্টেবলও।

নীচের আঙিনায় দাঁড়িয়ে রইলো রুহিন মালিক আর কেএস খান। তারা জানে মাহবুব আর পালাতে পারবে না। ধরা পড়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই।

পাঁচ মিনিটের মতো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলো তারা, কোনো খবর নেই। আমিনুল আর তার দু'জন কনস্টেবলের টিকিটাও দেখা গেলো না। অস্থির হয়ে উঠলো রুহিন।

"ঘটনা কি, মি: খান?"

হাত তুলে তাকে আশ্বস্ত করলো কেএসকে। "পালায়া বেশি দূর যাইতে পারবো না। ধরা পড়তেই হইবো।"

ঠিক তখনই আমিনুল মেইনগেট দিয়ে ঢুকলো। একা। তার শরীরিভাষা বলছে অন্য কিছু।

"কি হইলো?" উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইলো কেএস খান।

মাথা দোলালো সে। "পেলাম না, স্যার।"

"কি কও?" বিস্মিত সাবেক ইনভেস্টিগেটর।

"লোকটা দোতলা থেকে লাফ দিয়ে পা মচকেছে তারপরও পেছনের দেয়াল টপকে যায়। আমি আর আমার দু'জন কনস্টেবল দেয়াল টপকে দেখি লোকটা যেনো ভ্যানিশ হয়ে গেছে।"

কেএসকে চেয়ে রইলো কিছু বললো না।

"আশেপাশে কোথাও খুঁজে পেলাম না।"

এমন সময় কনস্টেবল দু'জনও ফিরে এলো সেখানে।

“কোথাও নেই, স্যার,” দু’জনের একজন বললো আমিনুলকে।

“ওই লোকের পা যদি মচকাইয়া গিয়া থাকে তাইলে তো বেশি দূর যাইতে পারে নাই...” বিড়বিড় করে বললো কেএস খান।

“আমি দেখেছি, স্যার। দোতলা থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছিলো...কিন্তু...”

পকেট থেকে একটা মোবাইলফোন বের করলো আমিনুল। “এই ফোনটা পাওয়া গেছে দেয়ালের বাইরে। এটা মাহবুব সাহেবের ফোন।”

কেএসকে চুপ মেরে রইলো। কিছু একটা ভাবছে সে। “আশেপাশে কোনো বাড়িতে ঢুকে নাই তো?” অবশেষে বললো।

মাথা দোলালো আমিনুল। “এখানকার সব বাড়িতে দারোয়ান আছে। আমরা কয়েকটা বাড়ির দারোয়ানকেও জিজ্ঞেস করেছি...তারা কিছু দেখে নি।”

কিছুক্ষণ পর নিরাশ হয়ে তারা সবাই চলে এলো গাড়ির কাছে। আমিনুল তার কনস্টেবল দু’জনকে নিয়ে ডিবির মাইক্রোবাসে উঠে বসলে রুহিনের প্রাইভেটকারে উঠে বসলো কেএসকে।

ব্যারিস্টার স্টিয়ারিং ধরে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসে রইলো। “লোকটা ম্যাজিকের মতো উধাও হয়ে গেলো?” এখনও তার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো কেএসকে। “আমার মাথায় কিছুই ঢুকতাছে না। পাগলটা গেলো কই!”

ডিবির মাইক্রোটা চলতে শুরু করলে রুহিন ইগনিশনে চাবি ঘোরালো।

উত্তরার আবাসিক এলাকা ছেড়ে দুটো গাড়ি উঠে এলো প্রধান সড়কে। আগে থাকলো ডিবির মাইক্রোটা, তার থেকে একটু দূরে রুহিনের প্রাইভেটকার।

“আপনার স্টুডেন্ট বলছে ওই লোকটার পা নাকি মচকে গেছে,” গাড়ি চালাতে চালাতেই বললো রুহিন। “এরকম অবস্থায় দেয়াল টপকে কতো দূরে যেতে পারবে, মিঃ খান?”

“বেশি দূরে তো যাওনের কথা না,” আস্তে করে বললো সাবেক ইনভেস্টিগেটর। “আমার ধারণা আশেপাশেই ঘাপটি মাইরা আছে...”

“ঠিক বলেছেন, মিঃ খান!”

ফ্যাসফেসে কণ্ঠটা শুনে তারা দু’জনেই পেছনে তাকালো।

অধ্যায় ৪১

মাইক্রোর ভেতরে পেছনের সিটে চুপচাপ বসে আছে আমিনুল। গাড়িটা চালাচ্ছে মোবারক নামের কনস্টেবল। তার পাশে তুহিন বার বার আক্ষেপে মাথা দোলাচ্ছে। ডিবি'তে নতুন ঢুকেছে সে। প্রতিটি অপারেশনেই তার উত্তেজনা বেশি থাকে। তাই ব্যর্থতার হতাশাও তার মধ্যে একটু বেশি দেখা যাচ্ছে।

"স্যার, সবগুলো বাড়ি তল্লাশি করলে ভালো হতো না?"

তুহিনের প্রশ্নটা শুনে মাথা দোলালো আমিনুল।

তুহিন আর মোবারক বাড়ির পেছনে যেতে এক মিনিটেরও কম সময় লেগেছে। উপরতলা থেকে নেমে ওখানে যেতে তার হয়তো আরো দশ-পনেরো সেকেন্ড বেশি লেগেছে। সে যখন ওখানে পৌছালো তখন দেখতে পায় তুহিন ততোক্ষণে দেয়ালের উপর উঠে গেছে।

"তোমরা যখন বাড়ির পেছন দিকটায় গেলে তখন কি দেখেছো?" জিজ্ঞেস করলো আমিনুল। যদিও এটা সে জানে।

"ওই লোকটা দেয়াল টপকাচ্ছে," দ্বিতীয়বারের মতো বললো তুহিন।

"তাহলেই বোঝো..." একটু থেমে আবার বললো, "তোমার দেয়াল টপকাতে কতোক্ষন লেগেছে...দশ সেকেন্ড?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ছেলেটা।

"তারপর তুমি যখন দেয়ালের উপর উঠলে তখন কি দেখেছো...লোকটা আশেপাশে কোথাও নেই...এতো অল্প সময়ে সে কোথায় যাবে? আশেপাশে কোনো বাড়িতে যেতে পারে। এরকম তিন-চারটা বাড়িতে তো আমরা খোঁজ নিয়েছি, তাই না?"

তুহিন মাথা নেড়ে সায় দিলো। কথাটা সত্যি। আশেপাশে ঘাপটি মেরে থাকার মতো কোনো জায়গা ছিলো না। কিন্তু তাদেরকে এভাবে বোকা বানিয়ে লোকটা বাতাসে হাওয়া হয়ে গেলো কিভাবে!

"স্যার?" ড্রাইভার মোবারক রিয়ারভিউ মিররে তাকিয়ে আমিনুলকে

বললো।

"কি?"

"আমাদের পেছনের গাড়িটা নেই।"

আমিনুল পেছন ফিরে তাকালো। এয়ারপোর্ট রোডে আছে তারা। একটু আগেও দেখেছে ব্যারিস্টারের গাড়িটা তাদের গাড়ির পেছনে ছিলো। এখন সেটা নেই।

"তেল ভরতে গেছে হয়তো," তুহিন বললো। "পেছনে একটা পেট্রলপাম্প আছে।"

আমিনুল আবার সামনের দিকে তাকালো। হতে পারে। সিটে হেলান দিয়ে বসতেই একটা কথা মনে পড়ে গেলো। এখানে আসার পথে ব্যারিস্টারের গাড়িটা পেট্রলপাম্প থেকে তেল ভরে নিয়েছে।

চট করে আবার পেছনে ফিরে তাকালো। এয়ারপোর্ট রোডটা বেশ নিরিবিলি। ওই গাড়িটার কোনো চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না। তাদের মাইক্রোটা এমন দ্রুতগতিতে ছুটছে না যে পেছনের গাড়িটা পিছিয়ে পড়বে। তাহলে?

গাড়িটা পথে নষ্ট হয়ে গেলো না তো?

রুহিন মালিক শক্ত করে স্টিয়ারিং ধরে রাখলেও তার হাত দুটো কাঁপছে। তর পাশে বসা কেএসকেও সেটা টের পাচ্ছে হয়তো।

স্পিড-মিটারের দিকে তাকালো। গাড়ির গতি কমে এখন ঘণ্টায় পঁচিশ মাইলে নেমে এসেছে। এরকম হাইওয়ে'তে কেউ পঞ্চাশ মাইলের কমে গাড়ি চালায় না। কিন্তু তাকে চালাতে হচ্ছে, কারণ পেছনের সিটে বসে আছে মাহবুব নামের অপ্রকৃতস্থ এক খুনি। লোকটার হাতে কালো চকচকে একটি পিস্তল আছে। রুহিন বার বার রিয়ার ভিউ মিররে সেটা দেখছে। তার নির্দেশেই গাড়ির গতি কমাতে হচ্ছে।

ঘটনার আকস্মিকতায় কেএসকে চুপ মেরে আছে। রুহিন বুঝতে পারছে না সাবেক ইনভেস্টিগেটর তার মতো নার্ভাস হয়ে পড়েছে কিনা।

"শূয়োরেরবাচ্চা!" দাঁতে দাঁত পিষে বললো পেছনের সিটের একমাত্র যাত্রি।

গালিটা কাকে দিলো বুঝতে পারলো না কেএসকে। তবে এটা রুহিনকেই দিয়েছে সম্ভবত।

নিজের উপস্থিত বুদ্ধির জন্য নিজেকে বাহ্বা দিচ্ছে মাহবুব। জানালা দিয়ে যখন দেখতে পায় তার বাড়ির সমানে দুটো গাড়ি এসে থেমেছে তখন আর দোতলা থেকে আর নীচে নামার মতো সময় তার হাতে ছিলো না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলে ধরা পড়ে যেতো। সেটা না করে ডাইনিংরুমের ফাঁকা জানালাটা দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, কার্নিশের উপর দাঁড়িয়ে সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু যখনই টের পায় ধরা পড়ে যাচ্ছে তখন আর দেরি করে নি। ঝুঁকি নিয়ে দোতলা থেকে লাফ দেয়। একটা পা মচকে গেলেও ক্ষান্ত দেয় না। দেয়াল টপকে বাড়ির বাইরে এসে পড়ে।

দেয়ালের উপর ওঠার সময়ই দেখতে পেয়েছিলো দু'জন লোক তাকে ধাওয়া করছে। ভালো করেই জানতো এরকম অবস্থায় মচকানো পা নিয়ে বেশিদূর যেতে পারবে না। আর এখানেই সে দারুণ একটি চালাকি করে।

রাস্তা দিয়ে না দৌড়ে, আশেপাশে কোথাও লুকাবার চেষ্টা না করে ডান দিকে মোড় নিয়ে সোজা চলে আসে বাড়ির সামনে। তার বাড়িটা কর্নার প্লট। উত্তর-পূর্ব দিকে রাস্তা আছে। বাড়িটার সম্মুখভাগ হলো দক্ষিণ দিকে।

তার হিসেব খুব পরিস্কার ছিলো। ঐ দুজন লোক দেয়াল বেয়ে ওঠার আগেই সে তাদের দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলে যাবে। দেয়াল থেকে লাফিয়ে নামার পর মচকানো পায়ে যে তীব্র ব্যথা হয়েছিলো সেটা আমলেই নেয় নি। খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলে আসে রুহিনের গাড়ির পেছনে। তার ধারণা ছিলো লোকগুলো তাকে দেখতে না পেয়ে একটু বিভ্রান্ত হবে, রাস্তার কোন দিকে যাবে সেটা নিয়ে দ্বিধায় পড়ে যাবে। ঘুণাক্ষরেও মনে করবে না সে বাড়ির সামনে তাদের গাড়ির কাছে আসতে পারে। তারপর লোকগুলো অন্য দিকে চলে গেলে সে সটকে পড়বে গাড়ির পেছন থেকে। কিন্তু প্রাইভেটকারের পেছনের দরজার কাঁচ নামানো দেখে তার মাথায় একটা আইডিয়া চলে আসে। আস্তে করে দরজাটা খুলে ঢুকে পড়ে গাড়ির ভেতর।

সামনের সিটে বসে থাকা কেএসকে চুপ থাকলেও খুকখুক করে কেশে উঠলো।

"আচ্ছা, তাহলে তুই-ই কাশছিলি!" পেছনের সিট থেকে বলে উঠলো অস্ত্রধারী।

সাবেক ইনভেস্টিগেটর আক্ষেপে মাথা দোলালো আবার। এই খুনিটা যে গাড়িতে ঢুকতে পারছে সেটার জন্যেও সে দায়ি।

উত্তরায় আসার পথে গাড়ির এসি বন্ধ করে দিতে বলেছিলো সে। তার ঠাণ্ডা সমস্যা আজ প্রকট আকার ধারণ করেছে। নাক দিয়ে পানি পড়ছে, আর থেমে থেমে চলছে কাশি। কোনোভাবেই আটকাতে পারছে না।

রুহিন এসিটা বন্ধ করে দেবার পরই গাড়ির কাঁচগুলো নামিয়ে দেয়। মাহবুবের বাড়ির সামনে গাড়িটা থামলে কাঁচগুলো তুলে দেবার কথা মনে থাকে না ব্যারিস্টারের।

"এইবার গাড়ি থামা!" ধমকের সুরে বললো মাহবুব। "রাস্তার পাশে রাখ!"

মনে মনে প্রমাদ গুনলো কেএসকে। সে জানে এই খুনি এখন কি করতে যাচ্ছে। কিন্তু তাকে থামাবার উপায় কি সেটা তার জানা নেই।

রুহিন বাধ্য হয়ে গাড়িটা রাস্তার পাশে থামিয়ে দিলো।

"ইঞ্জিন বন্ধ কর্!"

তাই করলো ব্যারিস্টার। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেছে।

"মবার তুই–"

মাঝপথে থেমে গেলো পেছনের সিটে বসা অস্ত্রধারী। একটা ফোন রিং বাজছে।

"কার ফোন?"

"আমার," জবাব দিলো কেএসকে। তার প্যান্টের পকেটে আছে ফোনটা।

"অফ কর্!"

পকেট থেকে ফোনটা বের করে দেখতে পেলো আমিনুল কল করছে। সঙ্গে সঙ্গে কলটা কেটে দিলো সাবেক ইনভেস্টিগেটর। তার মনে একটা আশা উঁকি দিলো। এ থেকে আমিনুল হয়তো কিছু একটা ধরতে পারবে।

"কে ফোন করেছিলো?" বলে উঠলো মাহবুব।

"সামনের গাড়ি থেইকা...আমার স্টুডেন্ট।"

রিয়ারভিউ মিররে কেএসকে দেখতে পেলো সাইকোটা বাম হাতে থুতনী চুলকাচ্ছে। তার চোখ দুটো অস্থির।

"তুই যে কলটা কেটে দিলি ও সন্দেহ করবে না?"

অবশ্যই করবো! মনে মনে বললো কেএস খান। "আপনেই তো কইলেন অফ কইরা দিতে..." বললো সে।

মাহবুব অস্থির হয়ে উঠলো। সেও নিশ্চয় বুঝতে পারছে ব্যাপারটা।

রুহিন মালিকের কপালের ঘাম এখন টপ টপ করে পড়তে শুরু করেছে।

কেএসকের ফোনটা আবারো বেজে উঠলে মাহবুব পিস্তল ঠেকালো তার পেছনে।

"কলটা রিসিভ কর্! বলবি...বলবি..." ভেবে পেলো না কী বলবে।

"গাড়ির তেল শেষ হইয়া গেছে...তেল ভরতাছি?" কেএসকে বললো।

"হ্যা, হ্যা...এটাই বলবি। ও যেনো কোনোভাবে বুঝতে না পারে...কোনো রকম চালাকি করবি না। বুঝলি?"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে কলটা রিসিভ করলো সে।

"খোদাদাদ শাহ্বাজ খান বলছি!"

ব্যারিস্টার রুহিন অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকালো কেএসকের দিকে।

"তেল শেষ...পেট্রলপাম্পে আছি..." সাবেক ইনভেস্টিগেটর বলে গেলো। "তোমরা চইলা যাও...আমাগো জন্য ওয়েট কইরো না। ঠিক আছে?"

ফোনটা কান থেকে নামিয়ে রাখলো কেএসকে। রিয়ারভিউ মিররে দেখতে পেলো মাহবুব হাসছে।

আর একটু সময় দরকার! মনে মনে বললো কেএসকে।

"মাহবুব সাহেব, আপনার ওয়াইফের সাথে যা হইছে সেইটা খুবই দুঃখজনক," আস্তে করে বললো সে। রিয়ারভিউ মিররে দেখতে পেলো অস্ত্রধারী ভুরু কুচকে ফেললো।

"এর উপযুক্ত শাস্তি রফিক পাইছে।"

"কিন্তু এই শূয়োরেরবাচ্চাটার শাস্তি পাওনা আছে এখনও!" ড্রাইভিং সিটে বসা ব্যারিস্টারকে দেখিয়ে বললো।

মাথা নেড়ে সায় দিলো কেএসকে। পাগল আর মাতালের সাথে দ্বিমত প্রকাশ করার মতো বোকামি আর হয় না। "উনি যা করছেন সেইটাও খুব খারাপ...এক্কেবারে এথিক্সের বাইরে।"

ব্যারিস্টার রুহিন হতবাক হয়ে পাশে বসা সাবেক ইনভেস্টিগেটরের দিকে তাকালো আবার। কেএসকে তার এই দৃষ্টিটা আমলেই নিলো না।

"একজন আইনের লোক হইয়া এইটা করা ঠিক হয় নাই।"

"এরা বেশ্যার চেয়েও খারাপ!" ঘৃণার সাথে বললো মাহবুব। "টাকা পেলে খুনি-ধর্ষকদের হয়েও মামলা লড়ে! এদের কোনো নীতি নেই।"

"হুম," আবারো সায় দিলো কেএস খান। "আমার মনে হইতাছে উনার আইনপেশা ছাইড়া দেয়া উচিত। এই পেশায় উনার থাকনের আর কোনো অধিকার নাই।"

মাহবুবের চোখমুখ বিকৃত হয়ে গেলো। তারপর ওয়াক করে থুতু ছিটালো ব্যারিস্টারের কাঁধে। বরফের মতোই জমে আছে সে। কোনোরকম প্রতিক্রিয়া দেখালো না।

"ওকে আমি...!" কথাটা বলেই ব্যারিস্টারের মাথার পেছনে পিস্তল ঠেকালো। তার সমস্ত শরীর কাঁপছে। হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো আচরণ করছে যেনো। "ওরে আমি...খুন করবো!" দাঁতে দাঁত পিষে বললো।

"অপরাধের তুলনায় শাস্তিটা একটু বেশি হইয়া গেলো না," খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললো কেএসকে।

"না!" সমস্ত শরীর খিচে বললো মাহবুব। "এটাই ওর প্রাপ্য!"

"আপনে মনে হয় ভুইলা গেছেন," বেশ আন্তরিকভাবে বললো কেএস খান, "ওয় আপনের ওয়াইফ্‌রে খুন করে নাই। রফিক বদমাইশটা করছে। আপনে ওরে আরো টর্চার কইরা মারলে উপযুক্ত শাস্তি হইতো..."

আবারো রিয়ারভিউ মিররে তাকালো সে। অস্ত্রধারী গাল চুলকালো। এখনও চোখমুখ কুচকে রেখেছে। "আমি ওরে অনেক শাস্তি দিয়েছি!" ফ্যাসফেসে কণ্ঠে বললো মাহবুব। "অনেক!"

মাথা দোলালো কেএসকে। চকিতে সামনের রাস্তার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিলো। "আমি ডেডবডিটা দেখছি। ক্লোজ রেঞ্জ থেইকা দুইটা গুলি করছেন। ইন্সট্যান্ট ডেথ। একটুও কষ্ট পায় নাই।"

"না!" প্রতিবাদের সুরে বললো মাহবুব। "আমি ওকে অনেক কষ্ট দিয়েছি।"

"আমার মনে হয় পেটে গুলি করলে সাফারিংটা বেশি হইতো...পাকস্থলীর কথা বলতাছি...ধুইকা ধুইকা মরতো।"

হা-হা-হা করে হেসে ফেললো সাইকোটা। "আপনি কিচ্ছু জানেন না, আমি ওর সাথে কি করেছি!"

"তার মাইনে আপনে ওরে অনেক টর্চার করছেন?"

ঠিক এমন সময় তাদের গাড়ির পাশে আমিনুলদের মাইক্রোবাসটা এসে থামতেই মাহবুব চমকে উঠলো। "শূয়োরেরবাচ্চা!" একটা চিৎকার দিয়ে অন্যপাশের দরজা খুলে দৌড় দিলো সে।

জাল

আমিনুল আর তুহিন নামের ডিবির ছেলেটা গাড়ি থেকে নেমে লোকটার পিছু নিলো। তাদের দু'জনের হাতেই অস্ত্র।

কেএসকে দেখতে পেলো মানসিক রোগিটি দৌড়ে কিছু দূর গিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো।

আমিনুল আর তুহিন এরজন্য মোটেও প্রস্তত ছিলো না। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো তারা।

সঙ্গে সঙ্গে একটা গুলি। আর সেটা করলো মাহবুব।

গাড়ির ভেতর থেকে কেএসকে কিছু বুঝতে পারলো না। আমিনুল আর তুহিন, দু'জনেই মাটিতে শুয়ে পড়লো।

মাহবুব আবারো দৌড়াতে শুরু করলে আরেকটা গুলির শব্দ হলো। কে করলো সেটা বোঝা না গেলো না। হুরমুরিয়ে রাস্তার উপর ছিটকে পড়লো পলায়নরত মাহবুব।

কেএসকে শুধু শুনতে পেলো হাফ ছেড়ে বাঁচার একটি শব্দ, আর সেটা এলো তার পাশের সিট থেকে।

অধ্যায় ৪২

কফিশপের এককোণে বসে আছে ডাক্তার লুবনা। টেবিলে আর কেউ নেই। বার বার হাতঘড়ি দেখছে। আজ অনেকদিন পর শাড়ি পরেছে সে আর খোপায় গুঁজেছে বেলিফুলের মালা। সে জানে দেখতে মোটামুটি সুন্দরই কিন্তু যার জন্যে এগুলো করেছে সে কী খেয়াল করেছে?

তার স্বল্পদৈর্ঘের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে টেবিলের সামনে এসে হাজির হলো কেএসকে। তার মেজাজ বেশ ফুরফুরে তবে মুখে বিব্রত হবার হাসিটিও আছে।

তারা এখানে এসেছে প্রায় আধঘণ্টা হলো। খাবারের অর্ডার না দিয়ে গল্প করেই এতোক্ষণ কাটিয়ে দিয়েছে। কিভাবে একজন লোক হাসপাতালের অপারেশন টেবিলে থেকেও বাইরে এসে খুন করতে পারলো আর কিভাবে পুরো ব্যাপারটার সমাধান করা হলো, সে-গল্পই বলে যাচ্ছিলো কেএসকে। যদিও মাহবুব সাহেবের এই ঘটনাটি গতকাল সবগুলো পত্রিকা আর টিভি চ্যানেলে দেখিয়েছে, তারপরও ডাক্তার লুবনা নাছোরবান্দার মতো তাকে এখানে আসতে বলে। সে নাকি গল্পটা তার মুখ থেকেই শুনবে। এরকমই কথা ছিলো তাদের মধ্যে।

ডাক্তার যখন সাবেক ইনভেস্টিগেটরের মুখ থেকে গল্পটা শুনছিলো তখনই তাদের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ায় এক ভদ্রমহিলা। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিলো যেনো হাতেনাতে প্রেমিককে অন্য কোনো মেয়ের সাথে প্রেমালাপ করার সময় ধরে ফেলেছে।

কেএসকের চেহারাটাও তখন দেখার মতো হয়েছিলো। কাচুমাচু হয়ে সে ডাক্তারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেও ভদ্রমহিলা ছোট্ট একটা কৃত্রিম হাসি দিয়ে সেই পর্ব চুকিয়ে ফেলে। তারপর কী একটা ব্যক্তিগত কথা আছে বলে ডেকে নিয়ে যায় তাকে। এখন দশ মিনিট পর ফিরে এসেও মুখে সেই বিব্রত হবার হাসিটি ধরে রেখেছে সাবেক ইনভেস্টিগেটর।

"উনি কে?" প্রশ্নটা না করে পারলো না ডাক্তার লুবনা।

"ইয়ে মানে...আমার ওয়াইফ..." লজ্জিত ভঙ্গিতে বললো সে।

ডাক্তারের চোখেমুখে হতাশা না বিস্ময় বোঝা গেলো না। "আপনার ওয়াইফ!"

মাথা নেড়ে সায় দিলো কেএসকে।

নিজেকে কোনোভাবে সংবরণ করে নিলো ডাক্তার। টেবিলের উপর থেকে পানির গ্লাসটা তুলে নিয়ে এক ঢোক পান করলো। "কিন্তু..." একটু থেমে আবার বললো, "আমি তো জানতাম আপনার ডির্ভোর্স হয়ে গেছে?"

"সরি," একটু লজ্জা পেলো সে। "আমার এক্স-ওয়াইফ।"

ডাক্তার যেনো হাফ ছেড়ে বাঁচলো। "তাই বলুন।"

নিঃশব্দে হাসতে লাগলো কেএসকে।

"এখন তো আমরা খাবারের অর্ডার দিতে পারি, নাকি?" অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতে চাইলো ডাক্তার।

"আপনের পছন্দে কিছু অর্ডার দেন...আমার কোনো চয়েজ নাই।"

"শিওর?"

মাথা নেড়ে আশ্বস্ত করলো কেএস খান।

ওয়েটারকে ডেকে কিছু খাবারের অর্ডার দিয়ে দিলো ডাক্তার।

"মাহবুব সাহেবের অবস্থা এখন কেমন?" ওয়েটার চলে যাবার পর বললো লুবনা।

"জ্ঞান ফিরা আসছে...রিকভার করতে পারছে।"

"গুলিটা কোথায় লেগেছিলো?"

"ঠিক ওই জায়গাটায়..." একটা ইঙ্গিত করে বললো কেএসকে।

ওই জায়গাটায় মানে? কয়েক মুহূর্তের জন্য ডাক্তারের কাছে মনে হলো গোপনাঙ্গের কথা বলছে বুঝি!

"অ্যাপেনডিক্সের অপারেশনটা যেইখানে হইছিলো ঠিক সেইখানে," বলেই মুচকি হাসলো সে।

"ও," ডাক্তারও হেসে ফেললো। "কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না..."

"কোন্টা?" উৎসুক হয়ে বললো কেএসকে।

"আপনার স্টুডেন্ট...কী যেনো নাম...?"

"আমিনুল।"

"হ্যা। আমিনুল কিভাবে বুঝলো আপনারা বিপদে পড়ে গেছেন...মানে

আপনাদের গাড়িতে ঐ লোকটা আছে?”

গল্পটা বললেও এ বিষয়টা ব্যাখ্যা করে নি কেএসকে। আবারো বিব্রত হবার ভঙ্গিটি ফিরে এলো তার মধ্যে। “আমিনুলের সাথে ফোনে কথা বলার সময় আমি আমার পুরা নামটা বলছিলাম...”

ডাক্তার অবাক হলো। একজন মানুষ তার পুরো নামটা বললো আর এ থেকে তার ছাত্র বুঝে গেলো সে বিপদে পড়ে গেছে? আজব!

“আমি তো কখনও আমার পুরা নাম কাউরে বলি না...তাই...” যেনো ডাক্তারের মনোভাব বুঝতে পেরে ব্যাখ্যা করলো সে। “ওইটা শুইনা আমিনুল বুঝতে পারছে বিরাট কোনো ঘাপলা আছে। ছেলেটা খুব ব্রাইট।”

মনে হলো না এ ব্যাখ্যায় ডাক্তার লুবনা সন্তুষ্ট হতে পেরেছে। চোখেমুখে বিস্ময় নিয়ে সে চেয়ে আছে সাবেক ইনভেস্টিগেটরের দিকে। তারপরই হঠাৎ করে একটা কথা মনে পড়ে গেলো। তার মুখে ফুটে উঠলো হাসি।

আজ থেকে বছরখানেক আগে তার এক সিনিয়র কলিগ কেএস খান নামের এই ভদ্রলোককে তার কাছে রেফার করেছিলো নিয়মিত চেকআপের জন্য। ঐ কলিগই এই অদ্ভুত লোকটার চেকআপ করতো, কিন্তু উচ্চর ডিগ্রি নেবার জন্য বিদেশে চলে যাবার আগে নিজের এই রোগিটির দায়িত্ব তাকে দিয়ে যায়। সেইসাথে কেএসকে সম্পর্কে কিছু তথ্যও দিয়ে যায় সে।

এই লোকের হার্ট বাম দিকে নয় বুকের ডান দিকে অবস্থিত। মেডিকেল টার্মে যাকে বলে সিটাস ইনভার্সাস। বছরের বেশিরভাগ সময় অসুস্থ থাকে ভদ্রলোক। যদিও আজ পর্যন্ত কোনো ডাক্তার এর কারণ খুঁজে বের করতে পারে নি। এই অসুস্থতার সিটাস ইনভার্সাস-এর সরাসরি কোনো সম্পর্কও স্বীকার করে না মেডিকেল সায়েন্স।

বিরামহীন এই অসুস্থতার কারণেই অকালে চাকরি থেকে অবসরে নিতে হয়েছে তাকে, সম্ভবত স্ত্রীর সাথেও সম্পর্কটা চুকে যায় একই কারণে।

তারপরই অদ্ভুত সেই কথাটা বলেছিলো লুবনার সিনিয়র কলিগ। ভুলেও তাকে যেনো তার আসল নামে না ডাকে। নিজের নামটাকে সে প্রচণ্ড ঘৃণা করে। এমনিতে খুব ভালো। সহজ-সরল। উদার আর বুদ্ধিদীপ্ত। সহজে রেগে যায় না। কিন্তু আসল নামটা শুনলেই মেজাজ বিগড়ে যায়। এটা তার পরিচিত সবাই জানে। সেজন্যে তাকে কেএস খান, মিঃ খান কিংবা শুধুই কেএসকে নামে ডাকা হয়। অবশ্য পরিচয়ের পর থেকে ডাক্তার

তাকে দেখলেই মি: ডেক্সট্রো কার্ডিয়া বলে সম্বোধন করে থাকে। লুবনা খেয়াল করেছে তার মুখ থেকে এ কথাটা শুনলে কেএস খান টিনএজারদের মতো লাজুকতা প্রদর্শন করে।

"বাপরে!" কৃত্রিম বিস্ময়ে বলে উঠলো ডাক্তার। "আপনার কাছ থেকে সবটা শুনে তো মনে হচ্ছে যেকোনো মার্ডার মিস্ট্রির চেয়েও বেশি রোমাঞ্চকর।"

কেএসকে শুধু নিরবে হাসলো।

"আমি অনেক থৃলার পড়েছি, কিন্তু এরকম গল্প কখনও পড়ি নি। আর যেভাবে আপনি রহস্যটার সমাধান করলেন..."

ডাক্তারের মুখ থেকে প্রশংসা শুনে একটু লজ্জিত বোধ করলো সাবেক ইনভেস্টিগেটর। কিন্তু ভীষণ ভালোও লাগছে তার।

"আমি কখনও ভাবতে পারি নি সত্যি সত্যি কোনো ডিটেক্টিভের সাথে পরিচিত হবো...তার মুখ থেকে সত্যিকারের কোনো গল্প শুনবো। ওয়াও!"

"আরে, কী যে বলেন..." টিনএজারদের মতোই লজ্জা পাচ্ছে এখন।

"সত্যি বলছি। বিলিভ মি।"

কী করবে বুঝতে না পেরে টেবিলের উপর রাখা টিসু বক্স থেকে একটা টিসু নিয়ে ঠোঁট মুছতে শুরু করলো কেএসকে।

"পত্রিকায় পড়লাম, আপনার ক্যারিয়ারে নাকি কোনো আনসল্‌ভ কেস নেই?"

ডাক্তারের এ কথায় চুপ মেরে গেলো সে। কথাটা যে সত্যি নয় সেটা তার চেয়ে ভালো আর কে জানে। "কথাটা সত্য না।" আস্তে করে বললো কেএস খান।

"তাই নাকি?"

"আমারও একটা আনসল্‌ভ কেস আছে।"

"কী বলেন...তাহলে পত্রিকাগুলো কি ভুল লিখলো?"

"তারা আসলে এইটা জানেই না।"

আগ্রহী হয়ে উঠলো ডাক্তার লুবনা। "ঘটনাটা কি আমাকে বলা যাবে?"

ঘর থেকে মোবাইলফোন চুরির রহস্যটা ডাক্তারের কাছে খুলে বললো সে। সব শুনে হাসতে লাগলো মহিলা।

"আপনি এই কেসটাকে ব্যর্থ কেস মনে করছেন?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো কেএসকে।

“সময় তো এখনও আছে। হয়তো কেনো একদিন ঠিকই বের করতে পারবেন।”

“তা অবশ্য ঠিক,” বললো সে।

এমন সময় ওয়েটার খাবার নিয়ে হাজির হলে ডাক্তার দেখে নিলো অর্ডার মোতাবেক সবকিছু ঠিকঠাকমতো দিয়েছে কিনা।

কেএসকের কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না এখন। তার শুধু ডাক্তারের সাথে গল্প করতে ইচ্ছে করছে। এমনিতে সব সময় চশমা পরলেও আজ সম্ভবত কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করেছে।

ডাক্তার লুবনার চোখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলো তার চোখ দুটো ভীষণ সুন্দর।

তারপরই টের পেলো বুকের ডান পাশটা অস্থির হয়ে উঠেছে।

উপসংহার

আইনস্টাইন মেঝের কার্পেটে বসে একগাদা পত্রিকা পড়ছে। কোত্থেকে যেনো একদিন আগের অনেকগুলো পুরনো পত্রিকা কিনে এনেছে ছেলেটা। সে অবশ্য বলছে এগুলো বিনে পয়সায় পেয়েছে।

"একটাতেও আপনের ছবি নাই," হতাশ হয়ে বললো সে।

সিঙ্গেল খাটের উপর শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছে কেএসকে। ছেলেটার দিকে না তাকিয়েই বললো, "হুম।"

"একটা ছবি দিলে কি হইতো?"

"আমি কি ফিল্মস্টার নাকি পলিটিশিয়ান যে আমার ছবি পেপারে দিবো?"

রিডিংগ্লাসের উপর দিয়ে তাকালো সে। ছেলেটার হতাশা দেখে মুচকি হাসলো। তার লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয়েছে তার হাতেই। এখন মোটামুটি পড়তে শিখেছে, টুকটাক লিখতেও পারে। সেই বিদ্যার জোরে রিপোর্টগুলো পড়ে যাচ্ছে।

"আপনের পুরা নামও দেয় নাই," অভিযোগের সুরেই বললো সে। "খালি লেখছে কেএসকে, কেএস খান...পুরা নামটা দিলে কী হইতো?"

ছেলেটার কথা না শোনার ভান করলো সে। তার পরিচিতজনদের মধ্যে একমাত্র আইনস্টাইন এখনও জানে না পিতৃপ্রদত্ত নামের ব্যাপারে তার মারাত্মক অপছন্দের কথাটা।

সঙ্গে সঙ্গে শুধরে নিলো। *নানাপ্রদত্ত!* শব্দটা কি ঠিক হলো? নানাপ্রদত্ত হবে নাকি মাতামহ–

আইনস্টাইনের কথায় তার ভাবনায় ছেদ পড়লো। "কতো বড় আর সুন্দর একটা নাম আপনের...ওইটা না দিয়া খালি কেএস খান। ধুর!"

মুচকি হেসে ফেললো। এই ছেলেটা তার অমন বিদঘুটে নামটা পছন্দ করে!

তার কাছে মাঝেমধ্যে কিছু অফিশিয়াল চিঠিপত্র আসে, সেখানে আসল

নামটাই লেখা থাকে সব সময়। আইনস্টাইন তাই বিদ্‌ঘুটে নামটার সাথে বেশ পরিচিত।

"এই নামে আপনেরে কেউ ডাকে না ক্যান?" পত্রিকা পড়া বাদ দিয়ে তার দিকে চেয়ে বললো এবার।

"চা খাইতে ইচ্ছা করতাছে...যা, নসুর দোকান থেইকা কড়া লিকারের চা নিয়া আয়।"

ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাগুলো জড়ো করে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো। হাফ ছেড়ে বাঁচলো কেএস খান। আইনস্টাইনের বালখিল্য প্রশ্নের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেলো আপাতত।

আবারো বই পড়ায় মন দিলো সে। কঠিন একটা সাবজেক্ট–ক্রাউড বিহেবিয়ার। ভীড়, জনস্রোত, জনসমাগম, স্টেডিয়ামের দর্শক, তীর্থযাত্রির দল–একসাথে কোনো প্রয়োজনে কিংবা উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া হাজার-হাজার লোকজনের মধ্যে এক ধরণের মনস্তত্ত্ব কাজ করে। বইয়ের লেখক এই বিষয়টা নিয়ে রীতিমতো আড়াই শ' পৃষ্ঠার একটি বই লিখে ফেলেছেন। প্রথমে ভেবেছিলো তেমন ইন্টারেস্টিং হবে না, কিন্তু পড়তে গিয়ে বেশ মজা পাচ্ছে এখন। লেখক রীতিমতো গ্রাফ এঁকে দেখিয়ে দিয়েছেন কোন ধরণের ক্রাউড কোন মুহূর্তে কী রকম প্যাটার্নে মুভ করে।

মনে মনে পশ্চিমা সভ্যতাকে কুর্ণিশ করলো। তারা সব বিষয় নিয়েই গবেষণা করে, বিশ্লেষণ করে। এমনকি যেসব বিষয় বাকি দুনিয়ার মানুষের কল্পনাতেও আসবে না সে-সব নিয়েও তারা মোটা মোটা বই লিখে ফেলে। কেএসকে নিশ্চিত, এই একটা কারণেই তারা সমগ্র পৃথিবী শাসন করছে।

পৃষ্ঠা উল্টে নতুন একটা অধ্যায়ে গেলো। ক্রাউড বিহেভিয়র যে সব কালচার আর জাতির মধ্যে একরকম নয় সে-বিষয়টাই আলোচনা করা হয়েছে এখানে।

পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে পড়ায় ডুব মারতেই অদ্ভুত একটা শব্দে চমকে উঠলো সে। শব্দটা এসেছে দূরের জানালার কাছ থেকে। সেদিকে তাকাতেই কয়েক মুহূর্তের জন্য ভড়কে গেলো।

জানালা দিয়ে একজন ঢোকার চেষ্টা করছে। এরইমধ্যে মাথাটা ঢুকিয়ে ফেলেছে, শরীরের বাকিটুকুও অনায়াসে ঢুকে যাবে কিন্তু ভীত আর চঞ্চল চোখে ঘরের ভেতরটা দেখে নেবার জন্যেই বোধহয় একটু বিরতি দিয়েছে সে।

জাল

অনুপ্রবেশকারীর সতর্কতা!

তার সাথে চোখাচোখি হয়ে গেলো অযাচিত মেহমানের। সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত প্রক্রিয়া শুরু করে দিলো। যেভাবে এসেছিলো সেভাবেই জানালা দিয়ে মাথাটা বের জান্তব এক চিৎকারের সাথে দৃষ্টিসীমা থেকে উধাও হয়ে গেলো সে।

বইটা রেখে তড়িঘড়ি উঠে বসলো কেএসকে। একটু ভেবে দ্রুত জানালার সামনে গিয়ে নীচে তাকালো। দুটো অল্পবয়সি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের উৎসুক দৃষ্টি তিনতলার উপরে, জানালার বাম দিকে কার্নিশের দিকে।

কেএসকে আর দেরি করলো না, প্রায় দৌড়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো সে। উত্তেজনায় তার শরীরে নাচন ধরিয়ে দিয়েছে। নীচের রাস্তায় এসে তার বাড়ির উত্তর দিকে যে চিপা গলিটা আছে সেখানে চলে গেলো।

সম্ভবত অমীমাংসিত একটি রহস্যের সমাধান পেয়ে গেছে সে।

গলিতে এসে দেখতে পেলো ছেলে দুটো এখনও উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের মধ্যে একজন হাত তুলে ডাকছে : পিলু পিলু! আয় আয়!"

বারো-তেরো বছরের ছেলে দুটো টেরই পেলো না তাদের পেছনে একজন এসে দাঁড়িয়েছে।

যে ছেলেটা পিলু পিলু বলে ডাকছিলো তাকে খপ করে ধরতেই অন্য ছেলেটা টের পেয়ে ভো দৌড় দিলো।

ধৃত ছেলেটি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো তার দিকে।

"এইটা কি তোমার?"

কেএসকের প্রশ্নটা শুনে ঢোক গিললো অল্পবয়সি ছেলেটা।

"কি, কথা কও না কেন?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো পিচ্চি।

ছেলেটা ডান হাতে শক্ত করে মুঠ ধরে রেখেছে। সেই মুঠোতে কিছু একটা আছে।

"হাতে কি?"

"দানা।" ছোট্ট করে বললো সে। এখনও ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে আছে।

বুঝতে পারলো কেএসকে। "তুমি এইটারে পালো?"

আবারো সায় দিলো পিলুর মালিক।

এমন সময় পিলু তিনতলা থেকে নেমে আসতে শুরু করলো আর গলিতে ঢুকলো আইনস্টাইন। তার একহাতে চায়ের ফ্লাস্ক।

"কি হইছে?" প্রশ্নটা করেই জবাবের অপেক্ষা করলো না। "আরে, এইটা তো ফটকা হান্নানের পোলা!"

কেএসকে অবাক হলো। আইনস্টাইন ছেলেটাকে চেনে? চেনারই কথা। এ কয় বছরে মহল্লার সবাইকে সে চিনে ফেলেছে। তারপরও জিজ্ঞস করলো, "কিরে, পোলাটারে চিনোস নাকি?"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে এরপর হরবর করে বলতে লাগলো সে : "ফটকা হান্নান্‌রে চিনেন না?...ঐ যে, মাইনষের লগে চিটিংবাটপারি করে...কয়দিন আগে পুলিশে ধরলো...আরে, ব্যাঙ্ক থেইকা কাস্টমারগো ট্যাকা মাইরা দিতো যে...টিভিতে দেখাইছে না...ধুর আপনে কুনো খবরই রাখেন না..."

কেএসকে বুঝতে পারলো এবার। তাদের মহল্লায় ভাড়া থাকে এই হান্নান নামের লোকটা। সবাই যাকে ফটকা হান্নান বলেই ডাকে। অভিনব কায়দায় ব্যাঙ্কে টাকা তুলতে আসা লোকজনকে বোকা বানিয়ে টাকা নিয়ে সটকে পড়ে সে। এক্ষেত্রে তার সৃজনশীলতা প্রবাদপ্রতীম। বার বার পুলিশের কাছে ধরা পড়লেও নিজের সৃজনশীলতা বজায় রেখেছে।

"তাইলে তুমি হান্নানের পোলা?"

ছেলেটা মাথা নেড়ে সায় দিলো। তার পিলু এখন নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে পিটপিট করে তাকাচ্ছে। ছোটো মাথায় কিছু ঢুকছে না হয়তো।

"এই বান্দরটা কইথেকা পাইছো?" কেএসকে জানে এই বারনটা পুরনো ঢাকার পাড়া-মহল্লায় ঘুরে বেড়ানো বানরদের মতো নয়। এটা আকারে বেশ ছোটো।

"কিনছি।"

"কতো দিয়া কিনছো?"

একটু ঢোক গিললো আবার। "পাঁচ হাজার..."

বিস্মিত হলো কেএসকে। এইটুকু বাচ্চাছেলে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে পিগমি সাইজের একটা বানর কিনেছে!

কেএসকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলো সে এতো টাকা কোথায় পেলো কিন্তু ফটকা হান্নানের ছেলে বলে এটা আর জিজ্ঞেসস করলো না। আসল কথায় চলে এলো এবার।

জাল

"এই বান্দরটা দিয়া তুমি কি করো?"

কোনো জবাব নেই। কেঁদে ফেলার চেষ্টা করছে ছেলেটা কিন্তু কান্না আনতে পারছে না।

কেএসকে একটু ভেবে বললো, "বান্দরটারে ডাকো..."

হান্নানের ছেলে ডাকলো, "পিলু, আয় আয়।" তারপর হাতের মুঠ থেকে কিছু দানা সামনে ফেললে ছোটোখাটো জাতের বানরটা ছুটে এসে দানা কুড়িয়ে খেতে লাগলো।

"তুমি এরে ট্রেনিং দিছো?"

আবারো ঢোক গিললো বানরের মালিক। "না।"

"তাইলে কে ট্রেনিং দিছে?"

আইনস্টাইনের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবার। "এই বান্দরটাই মোবাইল চুরি করছে!"

সৃষ্টির রহস্য আবিষ্কার করতে পারলে স্বয়ং আইনস্টাইনও এতোটা খুশি হতো কিনা সন্দেহ।

কেএসকে মাথা নেড়ে সায় দিলো শুধু। ক্রিমিনাল বাবার ছেলে ক্রিমিনাল হবে এমন কোনো কথা নেই, তবে সম্ভাবনা তৈরি হয়। আর জেনেটিক ব্যাপারটা তো অস্বীকার করবার উপায় নেই। এতোটুকু বাচ্চা একটা ছেলে এমন বাজে কাজে জড়িয়ে পড়েছে বলে তার একটু খারাপই লাগলো কিন্তু মাথার ভেতরে শক্ত করে গিট পাকিয়ে থাকা রহস্যের জাল থেকে মুক্ত বলে এক ধরণের হালকা বোধও হচ্ছে। সে ভেবেছিলো এই রহস্যের সমাধান বুঝি কোনোদিন করতে পারবে না।

অনেকদিন পর পরিপূর্ণ তৃপ্তি পেলো খোদাদাদ শাহবাজ খান।

. . .